প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬।১৯৫৯

প্রকাশক : সেনগুপ্ত ট্রাষ্ট
২২।২৬, মনোহরপুকুর রোড
কলিকাতা-২৯

মুদ্রক : শ্রীফণিভূষণ রায়
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন প্রাইভেট লিমিটেড
৫২।৩, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

ত্রয়ী

কত পথ চলে এসেছি, আঁকাবাঁকা পথ, চড়াইয়ের পথ, মাঠের পথ, সহরের পথ। আলোয় ঝল্‌মল্‌ করছিলো তখন জীবনের বিস্তৃত প্রান্তর যখন সুরু করেছিলুম চলা। আজ জীবনের প্রান্তরের উপর সন্ধ্যার দীর্ঘ ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, শুধু তার এক প্রান্তে একটুখানি আলো চিক্‌চিক্‌ করছে। আজও চল্‌ছি, আলোটুকু নিঃশেষ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত চলতে হবে। চলবার সময় তাকাতে নেই পিছনে, তাতে চলার কবিতার ছন্দ-পতন হয়, চলার সুরের তাল কেটে যায়।

তাই তাকাইনি ফিরে পিছন পানে, শুধু চলেছি প্রাণের মধ্যে বৈশাখী ঝড় তুলে,তারি মত্ত আবেগে। চল্‌তে চল্‌তে অকস্মাৎ এক একবার বিরাট অস্তিত্বের সামনে এসে পড়ছি। অনির্বাণ আলোর শিখা বহন করে চলেছেন যে সব মানুষ তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছি। তাঁদের জীবনের শিখা অযাচিত ভাবে আমার মনের অন্ধকার দূর করেছে। সেই আলোর স্পর্শ দগ্ধ করেছে আমার দুর্বলতাকে, অসহ্য দাহ জাগিয়েছে প্রাণের মধ্যে, আবার চলতে সুরু করেছি পাগলের মতো।

যতো সমের দিকেও এগোচ্ছি ততো মনে হচ্ছে, যে-সব বিরাট অস্তিত্বের স্পর্শ পেয়েছে জীবন চল্‌তে চল্‌তে, তার একটা ছবি এঁকে রেখে গেলে মন্দ হবে না।

যেমন কথা ভুলে গেলেও গানের সুর লেগে থাকে মনে, তেমনি স্মৃতির রেখা মনকে জড়িয়ে থাকে, তার বর্ণ-বৈচিত্র্য ফিকে হয়ে এলেও। তাই কালের ধুলোয় সব রঙ একেবারে বিলীন হয়ে যাওয়ার আগে স্মৃতির মঞ্জুষা থেকে কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত্ত সযতনে বের করে এনেছি। তাদের আসল রঙটি ফুটিয়ে তুলতে পারি, কলমের এমন মুন্সিয়ানা আমার নেই, দুঃখ সেখানেই।

দার্জিলিং জেল

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭

সে দিন সন্ধ্যেবেলা আকাশ থেকে হঠাৎ নেমে এলো রাশি রাশি বরফের জুঁই ফুল। হাওয়ায় ঘূর্ণি খেতে খেতে তারা ঝরে পড়তে লাগলো আকাশ থেকে। মস্কোর রাস্তা, বাড়ীর ছাদ, বুলভার, সব ঢেকে গেলো হালকা শাদা বরফের ফুলে। ১৯২৭ সালের ৭ই নভেম্বর সন্ধ্যের কথা বলছি। সারাদিন সহরের অলিতেগলিতে, রাস্তায়, রেস্তোঁরাঁয়, রেডস্কোয়ারে বয়েছিলো আগুনের স্রোত। দশ বৎসর আগে এই দিন উপরতলার বাবুদের

মুঠো ফুটো করে রাশিয়ার মজুরচাষীরা চোরাই মাল বোঝাই করা সিন্দুকের চাবিটা ছিনিয়ে নিয়েছিলো বাবুদের কাছ থেকে। এই দিন তারা বাবুদের রাজ শেষ করে মজুরচাষীর পঞ্চায়েৎরাজ কায়েম করেছিল রাশিয়ায়। এইদিন পৃথিবীর ইতিহাসের সুরু হলো এক নতুন অধ্যায়, মোড় ঘুরে মানুষের সমাজ সুরু করলো এক নতুন যাত্রা। সেই নতুন যাত্রা সুরু করার দিনটি নীচের তলার লোকদের আদরের দিন, পরম উৎসবের দিন। তারি দশম বার্ষিক উৎসবের দিন ছিলো ১৯২৭ সালের ৭ই নভেম্বর।

সকাল থেকে মস্কোর রাস্তায় লাভার মতো বয়ে চলেছিলো জন-স্রোত। বাড়ীতে বাড়ীতে লাল নিশান আগুনের শিখার মতো উঠ্‌লো জ্বলে, নীল আকাশটাতেই আগুন ধরিয়ে দেয় আর কি! রাস্তায় চলেছে কারখানার মজুরের দল, লাল পল্টন, ছাত্রেরা, ছেলে মেয়ে বুড়ো। তাদের শরীর, মুখ, সব যেন আগুন-জ্বালা। দলে দলে মেয়ে পুরুষ চলেছে বিপ্লবের গান গেয়ে, নাচছে তারা বুল্‌ভারে বুল্‌ভারে, রাস্তায় রাস্তায়। সবাই চলেছে রেড স্কোয়ারের দিকে। রেড স্কোয়ারে লেনিনের কবরের সামনে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মজুর, ছাত্র আর লাল পল্টনেরা মার্চ করে চল্‌লো। ককেসাসের ঘোড়সোয়ারেরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলো রেড স্কোয়ারের মধ্যে দিয়ে, হাজার হাজার ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাথর-বাঁধানো রেড স্কোয়ারের বুকে বেজে উঠ্‌লো। এমন সচ্ছন্দ সুষমার সঙ্গে কোনো নটীও নিজের দেহকে বহন করতে পারে না যেমন সচ্ছন্দে কভ্‌কাশের ঘোড়সোয়াররা ঘোড়ার উপর হাল্‌কা ভাবে নিজেদের বহন করছিলো। ক্রেমলিনের চূড়োয় উড়ছে বিরাট লাল নিশান। ক্রেমলিনের ঘড়ি থেকে বেজে উঠ্‌লো ইন্‌টারন্যাশানাল।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় বয়ে চললো আগুনের জোয়ার। আকাশ বুঝি আর সহ্য করতে পারলো না। আগুন নিবোবার জন্যে নীল আকাশের বুক ফেটে ঝরে পড়লো তাই বরফের স্রোত। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাস্তা ঘাট, বাড়ীর ছাদ, কার্ণিশ, সব ঢাকা পড়ে গেলো বরফে। আমরা চল্লুম ক্রেমলিনের সন্ধ্যের উৎসবে যোগ দিতে। ক্রেমলিনের যে অংশে সম্রাটের মেয়েরা থাক্‌তেন সেই মহলে উৎসবের আয়োজন হয়েছিলো। লুনাচারস্কি এসে ঘুরে গেলেন সেখানে, কতো বল্‌শেভিকনেতারা যে এলেন গেলেন তার ইয়ত্তা নেই। কভ্‌কাসের নাচ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বৃদ্ধ শক্‌লৎওয়ালা আর বসে থাকতে পারলেন না, তিনিও উঠে নাচতে সুরু করলেন। এমন সময়ে সেখানে এসে ঢুকলেন একজন দীর্ঘকায় পুরুষ, রোগা, একটু নুয়েও পড়েছেন। মুখটি শীর্ণ, চোখদুটো যেন জ্বলন্ত কয়লা, নাক খড়্গের মতো, প্রশস্ত ললাটের কোনে লম্বা চুলের গুচ্ছ এসে পড়েছে। অদ্ভুত চেহারা, প্রাণের দীপ্তিতে মুখ আলো হয়ে রয়েছে। শক্‌লৎওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলুম, কে ইনি? শক্‌লৎওয়ালা বল্লেন ইনি হচ্ছেন আঁরি বারবুস্‌। আমাকে আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে। ইনি আঁরি বারবুস্‌? 'আগুন' আর 'শৃঙ্খল' বই দুইটির রচয়িতা ইনি?

যখন প্রথম এই দুটি বই পড়ি সেই তরুণ বয়েসের কথা মনে পড়ে গেলো। কি আশ্চর্য ভালো লেগেছিলো বইদুটি। মনের বাতায়ন খুলে হঠাৎ এক নতুন আলো ঝলকে ঝলকে এসে পড়েছিলো আমার তরুণ জীবনে। সে জগৎকে চিনতুম না সে দিন, আমার সে দিনকার জীবনের সঙ্গে তার কোনো যোগ ছিল না। বারবুস্‌ যখন হাজির করে দিলেন

আমাকে সেই অজানা জগতের সামনে তখন কেঁপে উঠেছিলো বুক ভয়ে ও বিস্ময়ে। সে জগত টানছিলো আমাকে তার দিকে অথচ তাকে স্বীকার করে নিতে পারছিলুম না। মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সুরু করিয়ে দিলেন বারবুস্, তারি পরিণতি হলো একদিন যখন পুরণো ঘাট থেকে নোঙর ছিঁড়ে ভেসে পড়লো জীবন অজানা সমুদ্রে।

ইনি সেই বারবুস্! চেহারাটা 'আগুন' আর 'শৃঙ্খল' রচয়িতার উপযুক্ত চেহারা বটে। আমার সঙ্গে দুচারিটি কথা বিনিময় করে বারবুস্ চলে গেলেন। পরদিন সন্ধ্যেবেলা মস্কোর ট্রেডইউনিয়ন হলে সভা হলো। নানা দেশ থেকে আগত মনীষীরা নভেম্বর-বিপ্লব ও সোভিয়েট রাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন সেই সভায়। ফরাসী দেশের মনীষীদের তরফ থেকে বার্‌বুস্ নভেম্বর বিপ্লবকে অভিনন্দন জানালেন। মুগ্ধ হলুম তাঁর বলবার ধরণে। সভা শেষ হলে চায়ের আসরে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর লেখা যে আমার জীবনে এক অজানা জগতের প্রথম আলো এনে দিয়েছিলো, তাঁকে সেই কথা না জানিয়ে থাকতে পারলুম না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনের ভিতরের কমিউনিষ্ট আন্দোলন গড়ে উঠ্‌ছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। জানতে চাইলেন ভারতবর্ষের সাহিত্যেকেরা কতোটা অংশ গ্রহণ করছেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে। জানালুম তাঁকে আমাদের সেই প্রথম প্রচেষ্টা 'বঙ্গীয় শ্রমিক-কৃষক দল' আর তার মুখপত্র 'লাঙল' আর 'গণবানীর' কথা, ১৯২৫ সালে গান্ধী-আন্দোলনের আওতা থেকে বেরিয়ে আসা আমদের সেই ছোট্ট দলটির কথা। গান্ধীবাদের সংকীর্ণ জাতীয়তার দিক রবীন্দ্রনাথ যে স্বীকার করেননি সেকথাও তাঁকে জানালুম। বন্ধু নজরুল ইসলাম সে সময়ে 'লাঙল' আর 'গণবাণীতে' তাঁর গান আর কবিতা বের করে যে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন বাঙলা সাহিত্যে, তার খবর তাঁকে পৌঁছে দিলুম। ঘন্টা খানেকের আলাপ হলো সেদিন চায়ের আসরে। তারপরে তাঁর সঙ্গে দেখা হোলো বার্লিনে ১৯৩০ সালে। তিনি এসেছিলেন 'মানুষের অধিকার-সংরক্ষণ লীগ' নামক সঙ্ঘের আহ্বানে বার্লিনে বক্তৃতা দিতে। মজুর-আন্দোলন তখন ক্রমশই পিছে হটে আসছিলো ফ্যাসিজমের আক্রমণে। ক্যাথলিক ব্রুনিং ডেমোক্রাসির অজুহাতে নাৎসীদের সব সুবিধে জুটিয়ে দিচ্ছিলেন মজুর-আন্দোলনকে বিধ্বস্ত করবার জন্যে। হিটলারের কালো ছায়া ক্রমশই দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে পড়ছিলো জার্ম্মানীর বুকে। সোশালিষ্ট বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখাবার জন্যে বুর্জোয়া ডেমোক্রেসি লেলিয়ে দিচ্ছিলো ফ্যাসিজমকে শ্রমিক-আন্দোলনের বিরুদ্ধে। জার্মানীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা সমাজের স্রোতে কচুরি পানার মতো ভেসে যাচ্ছিল নাৎসিজমের বেনো জলের টানে। গোয়েটে আর হায়নের জার্মানী, কান্ট, হেগেলের জার্মানী সেঁধিয়ে যাচ্ছিলো অবৈজ্ঞানিক বর্বরতার চোরাবালিতে। জার্মানীতে ফ্যাসিজ্‌ম জয়ী হলে সমস্ত ইয়োরোপে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। খাঁটি রক্তের ঔৎকর্ষ্যের মতবাদ, জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের মতবাদ, বিচার বর্জন করে হৃদয়াবেগকে প্রাধান্য দেওয়ার মতবাদ, এই সব উদ্ভট মতবাদের দ্বারা ফ্যাসিজম্ ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, কলা ও দর্শনকে ধর্ষন করবার জন্যে তখন উঠে পড়ে লেগেছে। এই ঘনায়মান বিপদ সম্বন্ধে সকলকে সজাগ করবার জন্যে বারবুস্ এসেছিলেন বার্লিনে। তাঁর প্রাণের সমস্ত ব্যথা আর জ্বালা দিয়ে সে দিন সন্ধ্যেবেলা তিনি বল্লেন। একে বক্তৃতা বলা চলে

না, এ প্রাণ-নিঙড়নো আন্তরিকতা। মানুষের সভ্যতার বিরুদ্ধে বর্বরতার অভিযান সুরু করেছে ফ্যাসিজম্। মানুষের বন্ধু বারবুস্, তিনি কি চুপ করে থাকতে পারেন? আল্‌সেমিতে ভরা মানুষের মন, মন নড়ে বসতে চায় না, জুগিয়ে দেওয়া জিনিস রোমন্থন করে দিন কাটাতে ভালোবাসে। সাধারণ মানুষের এই আল্‌সে মনটিকে জাগিয়ে তোলবার ভার তাঁদেরই যাঁরা চির-জাগ্রত, যাঁরা মানুষের সভ্যতার অনিদ্র প্রহরী। বারবুস্ তাঁদেরই একজন। পরদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার কথা ঠিক করে নিলুম। সে দিন সকালে ইয়োরোপের ইন্‌টেলেক্‌টুয়েলদের অবনতির সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলাপ করি। বল্লুম—ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশে গর্ভমেন্টের মন যুগিয়ে চলার যে প্রয়াস ইয়োরোপের সাহিত্যিকমহলে দেখা যাচ্ছে সেটা যেমন দুঃখের তেমনি বিপদের লক্ষণ।

তিনি বল্লেন—আমি তোমার সঙ্গে একমত। মানবতার যে অটল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সমস্ত অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো দরকার, ইয়োরোপের ইন্‌টেলেকটুয়েলদের মধ্যে সেই সুগভীর মানবতা-বোধের দৈন্য আমাকে গভীর ব্যথা দিচ্ছে।

বুঝলুম জোলা, রোম্যাঁ রোলাঁর আদর্শ থেকে ইয়োরোপের শিক্ষিত সমাজ ভ্রষ্ট হচ্ছিল এই ছিলো তাঁর মর্মবেদনার কারণ।

বল্লুম,—ফ্যাসিজম্‌কে নিছক একটা অর্থনৈতিক আন্দোলন, ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটি বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা মাত্র, শুধু এই হিসেবে দেখলে ভুল করা হবে নাকি? আমার মনে হচ্ছে নানা দিক থেকে এর বিচার আমরা করছি না, শুধু এক দিকেই ঝোঁক দিচ্ছি। আপনি এর পূর্ণ চেহারাটা সকলের সামনে ধরে দিন। সব দিক থেকে এই সর্বগ্রাসী বীভৎসতাকে প্রতিহত করুন। আমার মতে ফ্যাসিজম্ হচ্ছে হাজার হাজার বৎসরের কণা কণা অভিজ্ঞতা নিয়ে গঠিত মানুষের যে সংস্কৃতি তাকে ধ্বংস করে নির্জলা পশুত্বের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

বারবুস্ বল্লেন—তাতে কি আর সন্দেহ আছে? বিচার-বুদ্ধিকে লাঞ্ছিত করে অন্ধ আবেগের জয়গান, নরডিক জাতির রক্তের ভুয়ো শ্রেষ্ঠতা নিয়ে অবৈজ্ঞানিক উন্মত্ততা, যুদ্ধকে মানুষের সর্বোত্তম কর্তব্য বলে ঘোষণা, জাতীয় অভিমান মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর বিশ্বমানবের আত্মিক কুটুম্বতা পাপ এই অপপ্রচার,—এইগুলোই হলো মানুষের সভ্যতার বিরুদ্ধে ফ্যাসিজমের অভিযানের নমুনা। এই সর্বনাশী প্রতিক্রিয়া সভ্যতার তীর ভাঙ্গবার আগেই আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়্‌তে হবে। বাঁধ রক্ষা করতেই হবে বর্বরতার বন্যার আঘাত থেকে। বিপদ সামনে, সময় খুবই কম। সেদিন সকালে ঘন্টা দুয়েক আলাপের পর তাঁর কাছে থেকে বিদায় নিলুম।

তারপর বারবুসের সঙ্গে আমার দেখা ১৯৩৩ সালের মে মাসে। ম্যুনিকের নাৎসি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আমি চলে আসি প্যারিসে। জার্মানীতখন সদ্যসদ্য নাৎসিজমের কবলে পড়েছে। জেল আর বন্দীনিবাসগুলো ভর্তি সোশালিষ্ট, কমুউনিষ্ট, ডেমোক্রাট প্রভৃতি সব দলের লোকে। লক্ষ লক্ষ লোক জেলে আর হাজার হাজার লোক নিহত। বই পোড়ানোর ধুম লেগে গেছে, হায়নের বইগুলোও পুড়োতে ব্যস্ত নাৎসী বর্বরেরা। শ্রমিক আন্দোলন টুকরো টুকরো হয়ে গেলো নাৎসিজমের প্রচন্ড আঘাতে। বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক

ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হাজার হাজার লোক জার্মানী থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। প্যারিস হলো তখন ঘর-ছাড়া জার্মান সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বিপ্লবীদের প্রধান আশ্রয় ও আড্ডা। প্যারিসে এসে আমি নানা রাজনৈতিক বৈঠকে যোগ দিই। হিটলারী বর্বরতার প্রতিবাদে আহুত প্যারিসে একটি বিরাট জনসভায় নানা দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমিও বক্তৃতা দিই। প্যারিসে থাকবার সময় বার্‌বুসের সঙ্গে বার কয়েক দেখা হয়। দুএকবার দেখা হলো বৈঠকেতে। আর কয়েকবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। ফ্যাসিজম্‌ ও যুদ্ধ-বিরোধী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তিগুলিকে কেন্দ্রস্থ করবার কাজে তিনি লেগে গেছেন তখন। ভারতবর্ষও যাতে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াইতে যোগদান করে তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে সে সম্বন্ধে সজাগ ও সক্রিয় হতে অনুরোধ করলেন।। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়ে বল্লেন যে এই ফ্যাসিজম্‌ ও যুদ্ধ-বিরোধী সঙ্ঘের মারফৎ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের কথা সমস্ত পৃথিবীকে শোনাতে পারবে। বিশেষ করে অনুরোধ করলেন যে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ভারতের প্রতিবাদ যেন ধ্বনিত হয়। তাঁরই কথা মত ভারতবর্ষে ফ্যাসিজম্‌ ও যুদ্ধ-বিরোধী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার ভার নিয়ে আমি দেশে ফিরে আসি। বারবুসের সঙ্গে শেষ দেখা আমার ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিন। তার দুদিন পরে আমি ভারতবর্ষ মুখে রওনা দিই, তাই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়েছিলুম। ভগ্ন শরীর নিয়ে অক্লান্ত খেটে চলেছেন। শুধু এক চিন্তা কি করে ফ্যাসিজমের দানবতা থেকে মানুষের সভ্যতাকে বাঁচানো যায়, দেশে দেশে কি করে এই বিপদ সম্বন্ধে মানুষকে সজাগ করে তোলা যায়, কি করে তাঁদের সমস্ত শক্তি এক করে সভ্যতার শত্রু ফ্যাসিজম্‌কে প্রতিহত করা যায়। বিদায়ের মুহূর্তে দুই হাত দিয়ে আমার হাত ধরে বল্লেন, ভারতবর্ষকে আমরা চাই বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্বমানবের এই অভিযানে। মনে রেখো এস কথা আর ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিকদের আমার অভিনন্দন জানিও। সেই কথার সুর আজও আমার কানে বাজ্‌ছে। ভারতবর্ষে ফিরে আসবার পর দুবার তাঁর কাছ থেকে চিঠি পাই। তার কিছু দিন বাদেই তাঁর মৃত্যুখবর পেলুম।

১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাস। কয়েক মাস থেকে আমি কাপ্রিতে রয়েছি। আগে কতোবার পড়েছি যে লেনিন, গর্কি, লুনাচারস্কি কাপ্রিতে অনেক দিন কাটিয়েছেন, এখানে তাঁরা স্কুল চালাতেন শ্রমিকদের জন্যে। কাপ্রির সঙ্গে তাই মনের পরিচয় অনেক দিন থেকেই ছিলো, এবার চোখের মিলন ঘটলো। ফুলেফলে ভরা এই দ্বীপটি যেন পারিজাত ফুল, অলকার কানন থেকে উড়ে এসে পড়েছে ভূমধ্য সাগরের বুকে। পাহাড়ের গায়ে জিনেস্ট্রোর হল্‌দে ফুল আগুন জ্বেলে রেখেছে। আঁকাবাঁকা পথের ধার দিয়ে আঙ্গুরের ক্ষেত থাকে থাকে নেমে গেছে। কালো মুক্তোর মতো নিটোল কালো অঙ্গুর, একটু ঘা দিলেই লাল রস ফিন্‌কি দিয়ে পড়ে। জেলেরা নৌকা নিয়ে বের হয়ে যায় রাতে, দূর সমুদ্রে মাছ ধরবার জন্যে। অন্ধকার রাত্তিরে জেলেডিঙ্গির আলো দেখা যায়, কালো সমুদ্রের পল্‌তেতে কে যেন সারি সারি দীপ জ্বেলে দিয়েছে। সহর বলতে শুধু পিয়াৎসাটুকু, সেখানে দোকান, হোটেল, রেস্তোঁরা, কাফেগুলো গা ঘেঁসাঘেসি করে রয়েছে। বিলাসী বাবুদের আর

বিলাসিনীদের ভিড় লেগেই থাকে পিয়াৎসায়। যেখানে জাহাজীদের, জেলেদের আর চাষীদের ভিড়, পিয়াৎসার পেছনে সেই সব রেস্তোরাঁয় আমাদের আড্ডা। অল্‌গা, হ্যারল্ড, মারিয়ানা, মিখাইলভ্, মারিও আর আমি সন্ধ্যেবেলা জুটি একটি ছোট্ট রেস্তোরাঁয়। রেস্তোরাঁর মালিক কর্শিকান, ছোট্ট মানুষটি, ধারালো মুখে ধারালো গোঁফ, আঙ্গুর দিয়ে অম্‌লেট করে খাওয়ায়, কালামাইয়ো মাছ ভেজে দেয় অলিভের তেলে, গাছ-পাকা ফিগ্ ধরে দেয় থালায় করে। অল্‌গা রাশিয়ান গান গায়, হ্যারল্ড গল্পলেখক, তার ছোটো গল্প পড়ে শোনায়, মারিও ইটালীয়ান গান শোনায়, আমি বাঁশী বাজাই। মাঝে মাঝে এক একদিন এক একজন জেলেকে ধরে নিয়ে আসি আমাদের আসরে, শুনি তার কাছ থেকে জেলেদের গান। দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের আওয়াজ বাজে তার গানে, ঝড় গর্জে ওঠে, নৌক ডুবুডুবু হয় আবার শেষ রাতে তীরে এসে পৌঁছয়। আমার অসুস্থ শরীরটাকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে এসেছিলুম কাপ্রিতে, এসেই খোঁজ নিয়েছিলুম মাক্‌সিম গর্কির। মস্কোতে থাকবার সময় শুনেছিলুম তিনি কাপ্রিতে থাকেন। যক্ষ্মা রোগী তিনি, রাশিয়ার দারুণ শীত তাঁর সহ্য হয় না, তাই দক্ষিণ ইটালীর তপ্ত আবহাওয়ায় তিনি বাস করেন। কাপ্রিতে এসে শুনলুম অনেক দিন হলো তিনি কাপ্রি ছেড়ে সোরেন্টোতে বাস করছেন। কাপ্রির কাছেই সোরেন্টা। কাপ্রি ছাড়বার সময়ও ঘনিয়ে এলো। বার্লিনে ফিরে যাওয়ার আগে গর্কির সঙ্গে দেখা করে যেতেই হবে এটা মনে মনে সংকল্প করে নিয়েছিলুম।

একদিন ভোরে আমি আর আমার ইংরেজ বন্ধু হ্যারল্ড টুবী সোরেন্টো রওনা দিলুম। কাপ্রি থেকে সোরেন্টো ঘন্টা খানেকের পথ ষ্টীমারে। শীতের ভোর, তখনও অন্ধকার কাপ্রির মুখে, আঙ্গুরক্ষেতে আর সমুদ্রের বুকে জড়িয়ে, আছে যখন আমরা দুই বন্ধু ষ্টীমার ঘাটে গিয়ে ষ্টীমার ধরলুম। সোরেন্টোর পথে ষ্টীমার থামলো গিয়ে মাৎসালুব্রেন্‌সা নামে ছোট্ট একটি জেলেদের গাঁয়ে। অসংখ্য জেলে নৌক বন্দরে, কোনো নৌক সারারাত সমুদ্রে কাটিয়ে এস ফিরলো বন্দরে, কোনো নৌক তুললো নোঙর। বন্দরে নৌকর ভিড় যতো তার অর্দ্ধেকও ভিড় নয় লোকের। সোরেন্টোতে পৌঁছে খোঁজ নিতে নিতে পৌঁছলুম গিয়ে গর্কির বাড়ীতে। প্রকান্ড কাঠের ফটক বন্ধ ছিলো। ঘন্টা বাজালুম, একটু পরে মোটাসোটা একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ফটক খুলে দাঁড়ালেন আমাদের সামনে। আমাকে দেখেই রুশীয় ভাষায় বল্লেন, 'আপনি টাগোর, না? মস্কোয় আপনাকে দেখেছি!' গর্কির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি জানালুম তাঁকে! বল্লেন, সকালে তো গর্কি কারো সঙ্গে দেখা করেন না, লেখার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, আপনারা একটার সময় আসবেন। ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিয়ে একটু চড়াই উঠে বসলুম গিয়ে একটা রেস্তোরাঁয়। কফি নিয়ে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে দিয়ে ফিরে চল্লুম আবার পিয়াৎসার দিকে। সময় আর কাটতে চায় না। এ দোকানে ও দোকানে উঁকি মেরে আবার কাফেতে গিয়ে বসলুম দুজনে। একটার সময় হাজির হলুম গিয়ে গর্কির বাড়ীতে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবারেও ফটকের কাছে এসে আমাদের উপরে নিয়ে গেলেন। পরে জানলুম ইনি গর্কির ডাক্তার। দোতলায় গর্কির ছেলে আর পুত্রবধূ আমাদেব অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলুম এমন সময় পাশের একটা দরজা খুলে এসে দাঁড়ালেন গর্কি। দীর্ঘকায় পুরুষ, কৃশ শরীর, ছবিতে দেখা বহুদিনের

সেই চির-পরিচিত মুখ। ডাক্তার দিলেন আলাপ করিয়ে, বসলুম আমরা খেতে। গর্কির স্ত্রীও এসে যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। খেতে খেতে আলাপ সুরু হলো, জিজ্ঞেস করলুম কিছু লিখছেন কিনা। গর্কি বল্লেন হাঁ, একটা উপন্যাস লিখছি। পুত্রবধূ বল্লেন, সকাল থেকে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় পর্যন্ত গর্কি একটানা লিখে চলেন। তারপরে বিকেলের দিক থেকে আবার লেখা সুরু করেন, লিখে চলেন রাত্তিরের খাওয়ার সময় পর্যন্ত। বিরাট একটা নভেল লিখছেন এইবার। গর্কি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,—ডাক্তারের কাছে শুনলুম তুমি অনেক দিন সোভিয়েট রাশিয়ায় ছিলে, কি রকম লাগ্‌লো তোমার?

প্রায় দুবছর রাশিয়ায় থাকবার সময় যা দেখেছি ও জেনেছি সে সব আমার মনকে যে কি গভীর ভাবে আলোড়িত করেছে তা তাঁকে জানালুম। তবুও কতকগুলো জিনিস যে আমি স্বীকার করে নিতে পারি নি তাও তাঁকে জানালুম। গর্কি আমার দিকে তাকালেন, বুঝলুম যে তিনি জানতে চান ঠিক কোন জায়গাটায় আমার বেধেছে, ঠিক কোন জিনিসগুলো আমি মন থেকে গ্রহণ করতে পারি নি।

তাই বল্লুম,— লেনিনের শব-পূজা আমি আদবেই বরদাস্ত করতে পারি নি। জনসাধারণের মনকে কুসংস্কারে ডুবিয়ে রাখাবার জন্যে প্রত্যেক ধর্মের পান্ডারা যে প্রণালীতে মানুষের মনকে ভূতগ্রস্থ করে রাখে, লেনিনের শব-পূজা সেই একই জাতের জিনিস। আমার মতে লেনিনের শব-পূজা কমিউনিজ্‌মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এক বস্তু। লেনিনের মৃতদেহটিকে মমি করে রাখা আমার মনকে তাই পীড়া দিয়েছে।

গর্কি বল্লেন—তুমি যা বল্‌ছো সেটা ঠিক, তবে এটা সাময়িক আর বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যে ওর প্রয়োজন আছে বোধ হয়।

আমি বল্লুম—আপনি যে যুক্তি দেখালেন, মস্কোতে আমার অনেক কমুউনিষ্ট বন্ধুরা ঠিক এই একই যুক্তি দেখিয়েছেন। আমি কিন্তু এই যুক্তি মানতে পারি নি। সব কুসংস্কার আমরা একদিনে নির্মূল নিশ্চয়ই করতে পারবো না, কিন্তু তাই বলে জনসাধারণের মনে কুসংস্কারকে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা তো কমুউনিষ্টরা করতে পারে না। কোনো সাময়িক প্রয়োজনীয়তার খাতিরে আমরা এটা করতে পারিনে, কেন না এটা কমিউনিজমের মূল ভিত্তিকে ধ্বসিয়ে দেয়। জনসাধারণের মনে যেখানে অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকার জমে আছে সেখানে বিচারের আলো জ্বেলে দিতে হবে। এ ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই।

গর্কি চুপ করে রইলেন। পরে আস্তে আস্তে বল্লেন—আর কি তোমার ভালো লাগে নি?

বল্লুম,—মানুষের চিন্তার স্বাধীনতাকে মেরেধরে সঙ্কুচিত করে সরকারী মতবাদের ফ্রেমের মধ্যে বাঁধবার জন্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বর্তমান নেতারা লেনিনের নামের যে মর্মান্তিক অপব্যবহার করছেন, সেটা আমার মনকে খুবই পীড়া দিয়েছে। প্রত্যেকটি চিন্তার, প্রত্যেকটি মতবাদের বিচার হওয়া উচিত তার নিজস্ব মূল্যে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সেই বিচারের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যখনই কেউ কিছু বলে কিম্বা লেখে অমনি সে বিষয়ে লেনিন কি বলেছেন সেইটে খুঁজে বের করতে মরিয়া হয়ে লেগে পড়ে বড়ো ক্ষুদে মাঝারি টীকাকারের দল। যদি লেখক বা বক্তা ভাগ্যক্রমে সমর্থন পায় লেনিনের লেখা থেকে

তবেই সে বাঁচে, নইলে তার দুর্দশার সীমা থাকে না। এই রকম করেই স্বাধীন চিন্তার ভ্রূণহত্যা বহুযুগ থেকে করে এসেছে ধর্মের পদ্ধতি-পন্ডিতেরা শাস্ত্রের ও শাস্ত্রকারের দোহাই দিয়ে। সেই একই হত্যাকান্ড চলেছে সোভিয়েট রাশিয়ায় লেনিনকে শাস্ত্রকার আর লেনিনের লেখাকে শাস্ত্র বানিয়ে।

গর্কি বল্লেন—তুবও বিচার করতে গেলে একটা কিছুতো প্রামাণ্য বলে ধরে নিতে হবে, নইলে মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হবে কি করে?

আমি বল্লুম—প্রামাণ্য আমি স্বীকার করি, তবে সে প্রামাণ্য আমার চিন্তাকে, আমার মনন-শক্তিকে খর্ব করে দেওয়ার জন্যে নয়, আমার সৃজনীশক্তিকে সন্দীপিত করবার জন্যে। প্রামাণ্য মুগুর নয় মানুষকে ভয় দেখিয়ে হতবুদ্ধি করবার জন্যে, প্রামাণ্য হচ্ছে আলো পথ দেখাবার জন্যে। আপনাকে আর আপনার সৃষ্টিকে যাচিয়ে নেবে মানুষ সেই আলোতে। তা'ছাড়া এটা ভুললে চল্‌বে না যে অতীতের কতো অটল সিদ্ধান্ত টলে গেছে। যা একদা অনড় বলে মনে হয়েছে তা নড়েছে, ধুলোয় মিশেছে, মানুষ নতুন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছে। মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে, তার সৃজনীশক্তিকে আমি কোনো প্রামাণ্যের পায়ে বলি দিতে রাজী নই। প্রত্যেক চিন্তাকে বিচার করতে হবে তার নিজস্ব মূল্যে, নইলে সংস্কারবদ্ধ মানুষের মন স্বাধীন চিন্তাকে জাতিচ্যুত করে রাখবে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে।

গর্কি বল্লেন—অতীতে কোনো বাধাই মানুষের মননশক্তিকে আটকাতে পারে নি, এখনো পারবে না, কখনো পারবে না। তবে এটা ঠিক যে প্রামাণ্য স্বীকার করেও কেমন করে মানুষের সৃজনী শক্তিকে অবাধ-গতি করা যায় এই সমস্যার সমাধান আমাদের করতেই হবে।

আমি বল্লুম—মানুষের মনন-শক্তিকে আটকানো যায়নি শেষ পর্যন্ত আপনার একথা ঠিক, আর ভবিষ্যতেও যে আটকানো যাবে না সে কথা মানি। তবে সেটা হচ্ছে শেষ পর্যন্তের কথা অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তকে আটকিয়ে রাখা যাবে না, সে সব বাধা ঠেলে এগোবেই। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সোভিয়েট রাষ্ট্রেও কি তাকে প্রামাণ্যের বাঁধ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এগোতে হবে, লড়তে হবে তাকে পদে পদে প্রামাণ্যের নিষেধের সঙ্গে? এখানেও কি মানুষের সৃজনী শক্তিকে স্তূপাকার নিষেধ ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে এগোতে হবে শেষ পর্যন্ত? সোভিয়েট রাষ্ট্রেও কি এই নিষেধের আবর্জনা সরিয়ে দেওয়া হবে না, মানুষ বহু অপ্রয়োজনীয় শক্তিক্ষয়ের দুঃখ থেকে বাঁচবে না? এই সমস্যার সমাধান যে খুব তাড়াতাড়ি হবে না সেটা আমি স্বীকার করি। আমি শুধু এর আরম্ভের সন্ধান করেছিলুম সোভিয়েট রাশিয়ায়, সেইটেতো দেখতো পাইই নি, বরঞ্চ চারদিকে নিষেধের ভ্রূকুটি দেখে আতঙ্কিত ও ব্যথিত হয়েছি।

টেবিলে সবাই চুপ করে ছিলেন, গর্কিও নিস্তব্ধ। আমি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বল্লুম—সোভিয়েট রাশিয়ায় এক নতুন ধরনের পেট্রিয়টিজম্ গজিয়ে উঠেছে, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন?

গর্কি বল্লেন—কি রকম পেট্রিয়টিজম্?

বল্লুম—কবিতা, শিল্প থেকে খাবার পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার যা কিছু তৈরি হচ্ছে,

তার মতো আর দুনিয়ায় কোথাও কিছু নেই, এই উৎকট পেট্রিয়টিজমের গুটিতে সোভিয়েট নাগরিকদের দেহ ভরে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ বল্লুম, মস্কোয় এর রুশীয় বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, রুশীয় রান্না কেমন লাগছে? বল্লুম, মন্দ নয়, তবে আহামরি কিছু নয়। বন্ধু খাপ্‌পা হয়ে উঠলেন—সেকি? রুশীয় রান্নার মতো এমন রান্না দুনিয়ায় আছে? সাহিত্য আলোচনা হচ্ছিলো একদিন। বন্ধুটি জিজ্ঞেস করলেন আমাকে সোভিয়েট যুগের রুশীয় সাহিত্য কিছু পড়েছি কিনা! বল্লুম, হ্যাঁ পড়েছি কিছু কিছু, যেমন গ্লাডকফ্, ত্রিচিকফ্, ডিমিয়ান্ বিয়েদ্‌নি প্রভৃতি। ডিমিয়ান্ বিয়েদ্‌নির কবিতা পড়েছি শুনে বন্ধু খুসি হলেন, বল্লেন—চমৎকার কবিতা লেখেন বিয়েদ্‌নি, নিশ্চয়ই তোমার খুব ভালো লেগেছে তাঁর কবিতা? কতো আর মিথ্যে বলা যায়, তাই মরিয়া হয়ে বল্লুম, আদবেই ভালো লাগে নি বিয়েদ্‌নির কবিতা, ওগুলো কবিতাই নয়, ওগুলো ইস্তাহার, ওতে না আছে ভাব, না আছে রস। আর যায় কোথা! সে দিন তপ্ত বাক্যের যে লাভা স্রোত বন্ধুর ওষ্ঠ থেকে নির্গত হলো তাতে একেবারে দগ্ধ হয়ে বাড়ী ফিরলুম।

গর্কি হাসতে লাগলেন। বড়ো মিষ্টি লাগলো তাঁর হাসি, মানুষের প্রতি গভীর দরদ সেই হাসিতে মাখানো ছিলো। জীবনে তিনি কি অপরিসীম দুঃখই না পেয়েছেন! নিজের জীবনের সঙ্গে নামকে একসুরে বেঁধে নেবার জন্যে আসল নাম বদল করে নিজের নাম রাখলেন গর্কি (গর্কি মানে তিতো)। এতোটুকুও তিক্ততা কিন্তু তাঁর জীবনকে স্পর্শ করে নি, এমনি আশ্চর্য তাঁর প্রাণ-শক্তি, তাঁর মানবতা।

গর্কি বল্লেন—এসব ছেলেমানুষি কেটে যাবে বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হলে। একেবারে অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোতে এসে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। প্রথম পরিচয়ের আলো তাই অসীম বিস্ময় জাগাচ্ছে, অপূর্ব বলে বোধ হচ্ছে এদের কাছে। যখন অন্য আলোর সন্ধান পাবে তখন কাছের আলোকে যাচিয়ে নিতে পারবে। তখন এসব ছেলেমানুষি কথা আর বলবে না।

বল্লুম—আমার একটি প্রশ্ন আছে আপনার কাছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় সাহিত্যকে মজুর-সাহিত্য ও বুর্জোয়া সাহিত্য এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমি এই বিভাগটা ঠিক মেনে নিতে পারছিনে। তাই আপনার কি মত এ বিষয়ে সেটা জানতে চাই।

গর্কি বল্লেন—ঠিক কোথায় তোমার বাধছে সেটা যদি জানাও তো আমার পক্ষে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হয়।

বল্লুম—মজুর-সাহিত্য যে কি জিনিস তা আমি বুঝে উঠতে পারি নি। মজুর-সাহিত্য বলতে ঠিক কি বোঝায়-মজুরের লেখা সাহিত্য অথবা মজুরদের জীবন নিয়ে লেখা সাহিত্য? যদি মজুরের লেখা মজুর-সাহিত্য হয় তাহলে সেখানে বিচারের বিষয় হচ্ছে এই যে যেটা লেখা হয়েছে সেটা সাহিত্য হয়েছে কিনা। আর যদি মজুরের জীবনকে বিষয়-বস্তু করে লেখা সাহিত্য মজুর-সাহিত্য হয়, তাহলে বহুকাল থেকে এরকম সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, যথা এমিল জোলার জার্মিনাল। এই সাহিত্যকে হঠাৎ মজুর-সাহিত্য নাম দেওয়ায় কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই।

গর্কি বল্লেন—মজুর-সাহিত্য বলতে বোঝায় জনসাধারণের জীবনকে কেন্দ্র করে নতুন

সামাজিক জীবন গঠন করবার ইঙ্গিত যে সাহিত্য দেয় সেই সাহিত্য।

আমি বল্লুম—জনসাধারণের জীবনের হাহাকার ও লাঞ্ছনার ছবি এঁকে, নতুন সামাজিক জীবন সৃষ্টি করবার ইঙ্গিত যে সাহিত্যে আছে তাকে আমি বিপ্লবী সাহিত্য বলি। সেটা মজুর-সাহিত্য নয়। মজুরের লেখা সাহিত্য বিপ্লবমুখী সাহিত্য নাও হতে পারে, এমন কি সে সাহিত্য বুর্জোয়া-সাহিত্য অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজের সমর্থনকারী সাহিত্যও হতে পারে। তাই আমার মতে বর্তমান কালের সাহিত্যকে বূর্জোয়া-সাহিত্য অর্থাৎ বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখার সাহিত্য আর বিপ্লবী-সাহিত্য অর্থাৎ এই সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা রচনা করবার জন্যে মানুষের মনকে জ্বালিয়ে তোলার সাহিত্য—এই দুইভগে বিভক্ত করা সমীচীন। একটা হলো পিছনে-তাকানো সাহিত্য, স্থানুর সাফাই গাওয়ার সাহিত্য আর অন্যটা হলো সামনে-চলার সাহিত্য, নুতনের জয়গান। মজুর-সাহিত্য কথাটা আমার কাছে অর্থহীন, কেন না আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে মজুরের লেখা সাহিত্য যে সব সময় নবজীবনের দিকে চলার সাহিত্য হবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই, মজুরের লেখা সাহিত্য সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যও হতে পারে। তাছাড়া সাহিত্যকার কোন্ শ্রেণী-উদ্ভুত তার বিচারের দ্বারা সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ না করে, সাহিত্যকার কোন আদর্শের কথা বলছে তার বিচারের দ্বারা সাহিত্য বিচার করা যুক্তিসঙ্গত।

গর্কি বল্লেন—বুঝেছি তুমি কি বলতে চাও। তোমার কথা যুক্তিসঙ্গত। তবে সোভিয়েট রাশিয়ার মজুর শ্রেণী বিপ্লব করেছে, তারা সোভিয়েট রাষ্ট্র পত্তনও করেছে। তাই সেখানে মজুর-সাহিত্য বলতে বিপ্লবমুখী সাহিত্যই বোঝায়। তাছাড় মজুর সাহিত্য এই সংজ্ঞার প্রচারের দ্বারা মজুরদের সাহিত্য সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা হয়েছে। সেই দিক থেকে এই সংজ্ঞার একটি সামাজিক প্রয়োজনীয়তা আছে, সাহিত্য-বিচারের দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তা থাকুক, না থাকুক।

বল্লুম—আপনার কথা বুঝলুম। তবে সোভিয়েট রাষ্ট্রে মজুর-সাহিত্য নামে যা সব সৃষ্টি হয়েছে তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাহিত্য হচ্ছে না আর খুব কম ক্ষেত্রেই বিপ্লবমুখী সাহিত্য হচ্ছে। সাহিত্য সৃষ্টি করতে মজুরদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। নীচের তলার অন্ধকারে যারা গুমরে মরছিলো তাদের প্রাণের সল্তেকে উস্কে দিয়ে সৃষ্টি-শক্তির আলো জ্বেলে দিতে সোভিয়েট রাশিয়ায় যা করা হয়েছে তার তুলনা নেই। আমার প্রাণের অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা তাঁদের নিবেদন করি যাঁরা তাঁদের এই কর্মের দ্বারা সমস্ত মানুষের লজ্জা ঘুচিয়েছেন। তবু বলতেই হবে যে সৃষ্টি-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা আর সাহিত্য-বিচার এ দুটো এক জিনিষ নয়। তা ছাড়া সাহিত্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে মানুষের সৃষ্টি-শক্তিকে আমরা কখনই জাগিয়ে তুলতে পারবো না। মজুর-সাহিত্যের হুজুগ তুলে মজুর-সাহিত্যিকদের আমরা কি রকম বিভ্রান্ত করেছি তা তো আমার চেয়ে আপনি ঢের বেশী জানেন। আপনাকেই তো কলম ধরতে হয়েছিলো সেই সমালোচকের বিরুদ্ধে যে এক মজুর-কবির কবিতার সমালোচনা করে লিখেছিলো—তুমি তোমার প্রিয়ার নরম হাতের কথা লিখেছো, তোমার প্রিয়া নিশ্চয়ই বুর্জোয়া, তোমার প্রিয়া যদি মেয়ে হতো তাহলে তার হাত কি নরম হতো? তুমি যখন বুর্জোয়া মেয়ের প্রেমে পড়েছো তখন তুমিও বুর্জোয়া।

বুঝতেই পারলো না সেই হতভাগ্য সমালোচক যে প্রেমের চোখে কড়া হাতও ফুলের চেয়ে কোমল ঠেক্‌তে পারে। ভাগ্যিস আপনি সেই কবিকে বাঁচাতে কলম ধরেছিলেন নইলে তার প্রাণ বাঁচানো দায় হতো।

গর্কি খুব হাসতে লাগলেন। বল্লেন, তুমি তো অনেক খবর রাখো দেখছি। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। স্বাধীনতা-আন্দোলন ও গান্ধীজি সম্বন্ধে অনেক কিছু খরব নিলেন। বল্লেন—তোমাদের দেশের জনসাধারণ অশিক্ষিত, লিখতে পড়তে জানে না, তাই তাদের মধ্যে বিপ্লবের মতবাদ ছড়িয়ে দেওয়া বড় শক্ত হবে।

বল্লুম—রাশিয়ায় সেই একই অবস্থা ছিলো। সেখানকার লোকেরাও ভারতবর্ষের লোকের মতোই অশিক্ষিত ছিলো। তবু সেখানে বিপ্লব ঘ্‌টলো আর ঘ্‌টলো না জার্মানীতে যেখানে শিক্ষিতের সংখ্যা এতো বেশী। লিখতে পড়তে জানে না এমন জনসাধারণকে বিপ্লবের শিক্ষা দিতে খুব বেশী কষ্ট পেতে হয় না। তবে তার জন্যে চাই বলশেভিক পার্টির মতো দল আর লেনিনের মতো নেতা।

গর্কি আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে। প্রকান্ড ঘর, আসবাবের মধ্যে তাঁর বিছানা, লেখবার টেবিল, দুটো চৌকি আর একটা বইয়ের শেলফ্‌। ঘরটির পাশেই বারান্দা। ঘর আর বারান্দা দুই থেকেই সোরেন্টোর তলা দিয়ে বেঁকে যাওয়া সমুদ্র দেখা যায়। মন-ভোলানো সেই ছবি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলুম। বিদায় নেবার সময় তাঁর নিজের হাতে আমাদের নাম ও তাঁর নাম লিখে দুটি বই আমাদের উপহার দিলেন।

১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষাশেষি ম্যুনিক জেল থেকে বের হয়ে আমি প্যারিসে আসি। মে মাস থেকে আমি রোম্যাঁ রোঁলার সঙ্গে পত্রালাপে আলোচনা সুরু করি গান্ধীজির উপর লেখা তাঁর প্রসিদ্ধ বইটি সম্বন্ধে। তাঁকে জানাই যে লেখার দিক থেকে অপূর্ব হলেও তাঁর বইটি মূলত একটা রোম্যানটিক্‌ বই, কেন না ভারতবর্ষের সমস্যাগুলিকে তিনি যে ভাবে দেখিয়েছেন তাঁর বইতে ততে সমস্যাগুলিকে তিনি রঙীন করে তুলেছেন। সমস্যাগুলির প্রকৃত চেহারা ফুটে ওঠে নি। গান্ধীবাদ সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন, এমন কি গান্ধীজির বর্ণাশ্রমপ্রথার সমর্থনকে পর্যন্ত তিনি যে ভাবে সমর্থন করেছেন তাতে আধুনিক ভারতের বহু মনীষীর প্রচেষ্টাকে লঘু করা হয়েছে। তা ছাড়া 'ইয়োরোপ' মাসিক পত্রিকায় সোভিয়েট রাশিয়ার উপর তাঁর যে সব প্রবন্ধ বের হয় সে সম্বন্ধেও তাঁর সঙ্গে পত্র বিনিময় করি। ছ'সাত মাস চিঠি লেখালেখির পর একদিন স্থির করলুম রোম্যাঁ রোলাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবো। ভারতবর্ষে ফিরে যাবার সময়ও ঘনিয়ে আসছিলো, তাঁর সঙ্গে দেখা না করে ইয়োরোপ ছাড়তে মন সরছিলো না।

নভেম্বর মাস শেষ হয়ে আসছে। বোয়াদ' বলোনিয়ার সবুজ সোনালী হয়ে শেষে একেবারে দেউলে হয়ে গেলো সব পাতা খুইয়ে। লেকের জল জমে এসেছে, রাজহাঁসগুলো সরে পড়েছে। স্যাঁন্‌ নদীর জলে শীতের ছোঁয়াচ লেগেছে। এম্‌নি একদিন শীতের সন্ধেবেলা (২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৩) রওনা দিলুম প্যারিস থেকে ভিল্‌ন্যভ্‌। সকালেবেলা গিয়ে পৌঁছলুম ভিল্‌ন্যভে। ছোট গ্রাম ভিল্‌ন্যভ বরফে ঢাকা। জমাট লেকের উপর স্কেটিং চলেছে, ছিপ্‌ছিপে পানসী নৌকর মতো স্কি করে দলে দলে লোক যাচ্ছে এদিকে ওদিকে। লেকের

ধারেই হোটেল, হোটেলের মালিকের কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে একটি বাঁকা সরু পথ দিয়ে পৌঁছলুম গিয়ে ভিলা অল্গায়। বাগানের ছোট দরজাটি খুলে ঢুকতেই, বাগানে একটি লোক দাঁড়িয়েছিলো, এগিয়ে এলো। বল্লুম, রোমঁ্যা রোলাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। সামনের বাড়ীতে না নিয়ে গিয়ে নিয়ে গেল পিছনের বাড়ীতে। এক বৃদ্ধা বের হয়ে এলেন, বিকেলে যখন পরিচয় পেলুম তখন জানলুম ইনি রোমঁ্যা রোলাঁর বোন। আমার আসার উদ্দেশ্য তাঁকে জানালে, জিজ্ঞেস করলেন—আগে থেকে কি কোন কথা আছে, রোমঁ্যা কি আপনাকে আসতে বলেছেন? বল্লুম—না, সে রকম কোনো কথা নেই। তবে তাঁর সঙ্গে কয়েক মাস থেকে পত্র বিনিময় করেছি। ভারতবর্ষে ফিরে যাবো শীঘ্রি, তাই ফিরে যাবার আগে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছি। বৃদ্ধা বল্লেন—আপনি বুঝি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারিস থেকে যিনি রোমঁ্যাকে চিঠি লেখেন? বল্লেন—একটু অপেক্ষা করুন আমি রোমঁ্যার সঙ্গে কথা বলে আসছি। কয়েক মিনিট বাদে ফিরে এসে বল্লেন—আপনি বিকেলে চারটের সময় আসবেন। রোমঁ্যা তখন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। ধন্যবাদ দিয়ে ফিরে এলুম হোটেলে। হোটেলে আমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখছি সামনের জমাট-বাঁধা লেক রোদে ঝল্‌মল্ করছে যেন সোনালি বরফের মরুভূমি। লেকের ওধারে পাহাড় উঠে গেছে, তার গায়ে ছোট ছোট বাড়ী। আবার সেই বাঁকা পথ ধরে গেলুম ভিলা অল্গায়। শ্রীমতী ম্যাড্‌লেন রোঁল্যা আমাকে নিয়ে গেলেন সেই পেছনের বাড়ীতে। ঘরে ঢুকেই দেখলুম রোঁম্যা রোলাঁ বসে আছেন খোলা আগুনের চিমনীর পাশে। শীর্ণ মুখ, চোখ দুটি যেন কোথায় তলিয়ে আছে মনের মধ্যে। প্রখর চিন্তা নিপুন শিল্পীর মতো তাঁর মুখটিকে ভেঙ্গে চুরে গড়েছে। অসীম বেদনা, গভীর চিন্তা আর নিবিড় মানব-প্রেমের জোয়ার বয়ে গেছে মুখের উপর দিয়ে। মুখের মাটি ধুয়ে গেছে, মুখ হয়ে গেছে মন। এমন মুখশ্রী আমি আর কখনো দেখি নি।

আলাপ সুরু হোলো।

বল্লুম—আপনার শেষ চিঠি পেয়ে আমার মনে হোলো যে আপনার সঙ্গে দেখা করে আলাপ করলে ভালো হবে, বিশেষ করে যখন শীঘ্রিই ভারতবর্ষে ফিরে যাচ্ছি। তাছাড়া আঁদ্রে জিদ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় বন্ধুরা আপনার সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছেন। ডেমোক্রেসির নাম করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে অকথ্য অত্যাচার ভারতবর্ষে চালাচ্ছে, ডেমোক্রেসির অবগুণ্ঠন ছিন্ন করে সেই অত্যাচারের নগ্ন রূপ ইয়োরোপের লোকদের কাছে প্রকাশ করে দেবার একান্ত প্রয়োজন আছে।

রোমঁ্যা রোলাঁ—ভারতবর্ষের উত্তর-পাচিম সীমান্তে এই অত্যাচার খুব প্রবল ভাবে চলছে, তাই না?

বল্লুম—সেটা ঠিক, তবে বাঙলা দেশও এই অকল্পনীয় অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায় নি। গাঁয়ে গাঁয়ে সৈন্য মোতায়ন রেখে গাঁয়ের লোকদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হচ্ছে। আমি কিন্তু শুধু এই অত্যাচারের খবর ইয়োরেপে ছড়িয়ে দেবার কাজে আপনার সাহায্য লাভের আশায় আপনার কাছে আসি নি। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সমর্থক হচ্ছে গান্ধীবাদ। সেই গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইতে আপনার সহযোগিতা

কামনা করি।

রোমাঁ্যা রোলাঁ—গান্ধীবাদ সম্বন্ধে তোমার মত আমি একেবারেই সমর্থন করি না। গান্ধীর সঙ্গে আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছি আর সেই আলোচনার ফলে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে যে গান্ধী মানব-প্রেমের বশবর্তী হোয়ে মূলধনের মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু শ্রমিকেরা যখনই নির্যাতিত হয় তখনই তিনি তাদের পক্ষ গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত।

বল্লুম—আপনার কথা মানতে পারছিনে। কলওয়ালাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের লড়াইকে সব সময় যতদূর সম্ভব কমজোর করে দেবার চেষ্টাকে মানব-প্রেম বলা যায় কিনা সেটা ভেবে দেখা দরকার। অবিশ্যি গান্ধীজি যে কখনো মজুরদের স্বপক্ষে দুটো কথাও বলেন নি এ কথা আমি বলছিনে। আমার বলবার কথা হচ্ছে এই যে-মানব-প্রেমের দোহাই দিয়ে কলওয়ালা আর শ্রমিকদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্বন্ধে তিনি যা বলে থাকেন তা এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখবার নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। গান্ধীজির অগুনতি লেখা থেকে উদ্ধৃত করে আমি আপনাকে দেখাতে পারি যে তাঁর মতবাদ আমাদের কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গোল-টেবিলের বৈঠকে গান্ধীজি এমন পর্যন্ত বল্লেন যে সেই বৈঠকে চাষীদের নিজেদের কোনো লোককে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানোর প্রয়োজন নেই, কেন না বৈঠকে যে সব জমিদারেরা গেছেন তাঁরাই চাষীদের প্রতিনিধিত্ব করবেন! এটাকে কি ঠিক মানব-প্রেম বলা যায়?

রোমাঁ্যা রোলাঁ—তাঁর যে সব ভারতবর্ষীয় ক্যাপিটালিষ্ট বন্ধুরা আছেন তাদেরই মানদণ্ডে গান্ধী ক্যাপিটালিষ্টদের বিচার করেন। গান্ধী মনে করেন যে এই ভারতবর্ষীয় ক্যাপিটালিষ্টরা মানবতার উপাসক ও মজুরদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করতে ইচ্ছুক। গান্ধী আরো মনে করেন যে শ্রেণী-সংঘাত এড়িয়ে গিয়ে, ঐ সংঘাতের পথে না গিয়েও মূলধনের মালিকদের স্বার্থের সঙ্গে শ্রমিকদের স্বার্থের একটা সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব। এটা তাঁর অন্তরের স্বপ্ন। বাস্তব যদি প্রমাণ করে যে সেটা সম্ভব নয় তাহলে তিনি নিশ্চয়ই মজুরদের পক্ষ সমর্থন করবেন।

বল্লুম—বাস্তব কি প্রমাণ করেনি যে সেটা সম্ভব নয়? ভারতবর্ষীয় ক্যাপিটালিষ্টদের মনের চেহারাটা আর মজুরদের উপর তাদের ব্যবহার গান্ধীজির অজানা আছে কি? ক'জন লোক আছে সারা ভারতবর্ষের যারা এবিষয়ে গান্ধীজির চেয়ে বেশী খবর রাখে? তাই বাস্তবতা-বর্জিত এই স্বপ্ন দেখার অধিকার গান্ধীজির আছে কি? আসল কথা হচ্ছে এই যে গান্ধীজি ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা বদল করতে চান না, স্বপ্নটা সেই ইচ্ছারই রূপান্তর।

রোমাঁ্যা রোলাঁ—আমি এটা একেবারেই বিশ্বাস করি না। গান্ধী সর্বপ্রথমে সব শ্রেণীদের নিয়ে একটা জাতীয় ব্লক (National Bloc) সৃষ্টি করতে চান ইংরেজদের অত্যাচার থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার জন্যে। আমার মতে এটা খুবই সঙ্গত ও সমীচীন নীতি। স্বাধীনতা লাভের পর সামাজিক সমস্যা, শ্রেণী-সংঘাতের সমস্যা সমাধান করবার সময় আসবে। আমি গান্ধীর সঙ্গে একমত যে সর্বপ্রথমে সমস্ত শ্রেণীদের নিয়ে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা ব্লক তৈরী করা দরকার।

বল্লুম—জাতীয় ব্লকের ধারণা যেমন ভ্রান্ত তেমনি বিপদজনক। এই ব্লকের নমুনা আমরা আধা-উপনিবেশ চীন দেশে ইতিমধ্যেই পেয়েছি। সেখানকার বুর্জোয়াদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কুমিংটাঙ্গ যতোদিন চীনের বুর্জোয়াদের স্বার্থের কোনো ক্ষতি হবার আশঙ্কা ছিলো না ততোদিন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে মজুরকিষাণদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজে লাগিয়ে নিলো, কিন্তু যেই চাষীমজুরেরা অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করবার দাবী করলো অমনি জঘন্যতম ত্রাসের দ্বারা তাদের সমস্ত দাবী চূর্ণবিচূর্ণ করতে এতোটুকুও সঙ্কোচ করেনি চীনের বুর্জোয়ারা আর তাদের প্রতিষ্ঠান কুমিংটাঙ্গ। চীনদেশের হাজার হাজার তরুণ এই ত্রাসের যূপকাষ্ঠে বলি হোলো। পুরো-উপনিবেশ ভারতবর্ষে সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে যদি বিপ্লবের দ্বারা আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শিকল আর ভারতবর্ষের ক্যাপিটালিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থাকে একই সঙ্গে ভেঙ্গে দিতে না পারি। ভারতবর্ষের বুর্জোয়াদের একেবারে ঘুমন্ত মনে করলে ভুল করা হবে। তারা বেশ বুঝতে পারছে যে, যে-বিপ্লব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করবে সে বিপ্লব তাদেরও ধ্বংস করবে, তাই বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীর মতো তারা বুঝেছে যে একেবারে সব মুনাফা খোওয়ানোর চেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করে মুনাফার বখরা নেওয়া অনেক ভালো। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই কলওয়ালা-জমিদারের দল সব সময়ে বাধা দিয়ে এসেছে, সব সময়ে তারা ব্রিটিশের পক্ষ নিয়েছে। কংগ্রেস কিম্বা গান্ধীজি এদের বিরুদ্ধে কিন্তু কখনো কোনো অভিযান করেন নি। সব শ্রেণী মিলিয়ে জাতীয় ব্লক তৈরী করার অর্থ হচ্ছে জাতীয় সংহতির নাম করে জনগণকে কলওয়ালা আর জমিদারদের পায়ে বলি দেওয়া।

রোম্যাঁ রোলাঁ—এই লড়াইতে একটি জিনিস আছে যা গান্ধী কখনো ত্যাগ করবেন না,সেটি হচ্ছে অহিংসা। তিনি বলেন—"যদি তোমরা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে অহিংসা ছাড়া অন্য অস্ত্র ব্যবহার করতে চাও তো করো, আমি সরে যাচ্ছি। আমি কিছুতেই তাতে সাহায্য করতে পরবো না।" আমি এই 'অহিংসা' শব্দ পছন্দ করি না। এর বদলে অস্বীকৃতি শব্দটি ব্যবহার করলে ভালো হয়। শক্তির প্রয়োগ জীবনে সর্বত্র। আমরা এই বর্বর শক্তিকে আত্মার সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা দেবো। গান্ধীর তথাকথিত অহিংসা' হচ্ছে বীরত্বপূর্ণ এই অস্বীকৃতির চরম নিদর্শন। এই অস্বীকৃতির মহান প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আজ যেমন, এমন আর কখনো ছিলো কিনা সন্দেহ। এই পশুশক্তির জয়গান করছেন স্পেঙ্গলার। যা কিছু মানবতার পরিচায়ক বলে আমরা মনে করি সে সব তিনি বিদ্রূপ করছেন, তিনি নিষ্ঠুরতার স্তবগান করছেন। গান্ধী হচ্ছেন মানবতার শেষ রক্ষক। যদি এই আশা ধূলিসাৎ হয় তাহলে হিংস্র সংঘাত জীবনকে কলুষিত করবে।

বল্লুম—গান্ধীজি যাকে অহিংসা বলেন সে অহিংসা আমি স্বীকার করি না। গান্ধীজি শ্রেণী-বিভাগ ও বর্ণ-বিভাগ সমর্থন করেন। এই সমর্থনকে কি অহিংসা বলা চলে? হিংসার প্রকৃত মূল সামাজিক জীবনে কোথায় সেটা গান্ধীজি আমাদের দেখাতে পারেন নি। এমন কি ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকেও তিনি হিংসাত্মক বলে মনে করেন না। রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯৩০ সালে ইয়োরোপে আসেন তখন হিংসা অহিংসার সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আঁলোচনা করি। এ বিষয়ে তিনি লিখবেন বলেছিলেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছু লেখেননি। অহিংসা

সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত গান্ধীজির ধারণার মতই অসম্পূর্ণ, কেননা দুজনেই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথ অন্তত সমস্যাটি সম্বন্ধে সচেতন, গান্ধীজি সমস্যাটিকে দেখেনই না।

রোম্যাঁ রোলাঁ—রবীন্দ্রনাথ যেটা ধী-শক্তির আলোকে প্রত্যক্ষ করেন, জনসাধারণের অন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম গান্ধীর সহজ-বুদ্ধি (Instinct) তাঁর কাছে সেটা প্রকাশ করে। লেনিনকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার মতে গান্ধী হচ্ছেন তাঁর নিজের দেশের ও পৃথিবীর জনগণের হৃদয়বান সেবক। লালা লজপৎ রায় আমাকে বলেছিলেন যে অহিংস অসহযোগ হচ্ছে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্বোত্তম অস্ত্র। ভারতবর্ষের লোকেরা যদি অস্ত্র ব্যবহার করতো (যেটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মনে প্রাণে চায়) তাহলে সেই অছিলায় সাম্রাজ্যবাদীরা যে অত্যাচার চালাতো তার তুলনায় যে নিপীড়ন ভারতবর্ষ আজ ভোগ করছে তা কিছুই নয়। তাছাড়া একটা সমগ্র জাতির অহিংসা অসহযোগ যে শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকেই ইংলন্ডকে কাবু করবে তা নয়, ব্রিটিশ শাসকদের চিত্তবৃত্তির উপর প্রভাব বিস্তার করার এটা হলো একমাত্র পন্থা। ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা দাবী করছে সে সম্বন্ধে ব্রিটিশ শাসকদের অনুকূল মনোভাব তৈরী একমাত্র এই অহিংস অসহযোগই করতে পারে।

বল্লুম—অহিংসাকে দুদিক থেকে বিচার করা যায়—রাজনৈতিক লড়াইয়ের কৌশল হিসেবে আর তার নিজস্ব মূল্যের দিক থেকে। কৌশলের দিক থেকে বলা যেতে পারে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করবার শক্তি বর্তমানে আমাদের নেই। এই জন্যে বর্তমানে অহিংসাকে লড়াইয়ের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তাই বলে অহিংসার দ্বারা আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয় পরিবর্তন করে দিতে পারবো, তাদের হৃদয় গলিয়ে দিতে পারবো, এ অর্থহীন খেয়াল আমি পোষণ করি না। সমস্ত পৃথিবীর ঘটনার চাপে, পৃথিবীব্যাপী রাজনৈতিক শক্তিগুলির ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা মুঠো শিথিল করতে বাধ্য হবে। অহিংসার আবেদনে সাম্রাজ্যবাদের হৃদয় কখনো বদল হবে না, সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করতে হবে।

রোম্যাঁ রোলাঁ—দুটি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অন্তবর্তী এতো অল্প সময়ের মধ্যে শাসকদের ও দেশের লোকদের হৃদয় পরিবর্তন হোয়ে যাবে এটা আশা করা কি যুক্তি-সঙ্গত? তবে হৃদয় পরিবর্তনের সম্ভবনার আশা করা যেতে পারে, বিশেষ করে গ্রেট বৃটেনের দিক থেকে সমস্যাটির বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে তাকে একটি বিরাট জাতির সাধারণ ধর্মঘটের সম্মুখীন হোতে হবে। তোমার দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা আমি নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি না, কিন্তু ইয়োরোপের সামনে আজ যে সব গুরুতর সমস্যা উপস্থিত সেগুলোর বিচার করে দেখতে পারি। এখানে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার পক্ষে হিংসার ও অহিংসার সম্মিলিত শক্তিও আমি যথেষ্ট বলে মনে করি না। ১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে আমষ্টারডামে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে বারবুস্ আর আমি সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজম্ বিরোধী সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করতে চেষ্টা করেছিলুম। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে আমাদের এই যুদ্ধে যুদ্ধ-বিরোধকারীদের ও অহিংস অসহযোগীদের সহযোগিতার উপর আমি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করি। এরা তাদের নিজ নিজ দেশের

ফ্যাসিষ্ট গভর্মেন্টকে বল্‌বে—"তোমরা যা খুসি তাই করতে পারো, আমরা তোমাদের হুকুম মানবো না।" ইয়োরোপের বেশীর ভাগ দেশে মজুরদের শক্তির চেয়ে ফ্যাসিষ্টদের শক্তি অনেক বেশী। ফ্যাসিজম্ বিরোধী শক্তিকে আমরা যেন ভাগ করে না ফেলি। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একটা অংশ হচ্ছে অহিংসা, আর ইয়োরোপের মজুরদের জন্যে এতে যথেষ্ট আশার কথা আছে।

বল্লুম—ঠিক সময়ে তাদের সমস্ত শক্তি বিপ্লবের কাজে না লাগিয়ে ইয়োরোপের মজুর শ্রেণী খুব ভুল করেছে।

রোমাঁ্যা রোলাঁ—১৯১৪-১৯১৮ সালের বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ফলে যে অপরিসীম ক্লান্তি ও অবসাদ এসেছে সেটা ভুলে যেও না। ইয়োরোপের সমস্ত দেশের লোকেরা দৈহিক ও নৈতিক রক্তপাত করে নির্বীর্য হোয়ে পড়েছে। তারা যে শক্তি প্রয়োগ করেনি তার কারণ এই নয় যে আদর্শের উপর তাদের নিষ্ঠা ছিলো না, নিছক ক্লান্তি বশত তারা লড়াই করতে পারেনি।

বল্লুম—হিংসাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে যে শ্রমিকেরা ঠিক সময়ে শক্তি ব্যবহার করেনি তাতো আদবেই নয়, কারণটি বরং ঠিক তার বিপরীত। সোশালিষ্ট নেতাদের মধ্যে আদর্শগত নিষ্ঠার অভাবের জন্যেই এটা ঘটেছে। এরই অভাবের দরুণ ইয়োরোপে ফ্যাসিজম্ প্রসার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তা ছাড়া যা সমষ্টির ন্যায্য অধিকার তা ফিরে নেবার জন্যে সমষ্টি যখন শক্তি প্রয়োগ করে তখন সে শক্তিপ্রয়োগকে হিংসা বলতে আমি রাজী নই, শক্তির সেটা নৈতিক প্রয়োগ। যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমষ্টিকে বঞ্চিত করে তার অধিকার থেকে সেই ক্ষেত্রেই শক্তি হিংসার রূপ গ্রহণ করে।

শ্রীমতি রোলাঁ—অস্পৃশ্যতা-সমস্যার সমাধানে গান্ধীজির মহান প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আপনার মত কি?

বল্লুম—অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নতীকরণে গান্ধীজির প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, তবু বলতেই হবে যে বর্ণাশ্রম প্রথাকে স্বীকার করে নিয়ে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করার খুব বেশী সার্থকতা নেই। বর্ণাশ্রম প্রথাই অস্পৃশ্যতার নামান্তর। গান্ধীজি হিন্দুসমাজের এই চতুবর্ণ বিভাগকে চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়ম বলে মনে করেন।

শ্রীমতী রোলাঁ—অস্পৃশ্যতার অবস্থা অন্য সব বর্ণের অবস্থার থেকে খারাপ নয় কি?

বল্লুম—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু সে অবস্থার যথার্থ পরিবর্তন বিপ্লবের পরেই করা সম্ভব। হাজার হাজার মন্দিরের মধ্যে মাত্র কয়েকটি মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে হরিজনদের প্রবেশের জন্যে। এই মতো ঢিমে তেতালা ভাবে চললে শতাব্দী কেটে যাবে এই সমস্যার সমাধান করতে। তা ছাড়া মন্দিরে প্রবেশ করতে পারলেই যে অস্পৃশ্যরা সামাজিক অধিকার লাভ করবে তা' আদবেই নয়। তাই বলেছিলুম যে এ সমস্যার সমাধান বিপ্লবের পরেই হওয়া সম্ভব, আগে নয়। রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখছি যে এমন কি বিপ্লবের পরেও জনসাধারণের মন থেকে কুসংস্কার দূর করা কতো শক্ত।

শ্রীমতী রোলাঁ—আপনার কথা থেকে তো বুঝলুম যে ভারতবর্ষে বিপ্লব আসতে এখনো অনেক দেরী।

বল্লুম—আমার ধারণা তাই। শুধু ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার

উপর নয়, পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভারতবর্ষের বিপ্লব নির্ভর করে। তার জন্যে বহুদিনের প্রস্তুতিও প্রয়োজন। কিন্তু যত শীঘ্রি সম্ভব এই প্রস্তুতির আরম্ভ করা দরকার।

সে দিন বিকেলে আমাদের আলোচনা এই পর্যন্ত হলো। রোমাঁ রোলাঁ পেছনের বাড়ী থেকে আমাকে নিয়ে এলেন সামনের বাড়ীতে। এই সামনের বাড়ীতেই তিনি থাকেন। আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। ছোট্ট বসবার ঘরটি, পিয়ানো আর দুচারটি আসবাবে ঘরটি খুবই সাধাসিধে ভাবে সাজানো। গান্ধীজি যখন ভিল্ন্যভে গিয়েছিলেন তখন এই ঘরে বসেই তাঁদের আলোচনা হয়। সেই সময়কার তোলা একটি ছবি টেবিলে রাখা রয়েছে। পিয়ানোর ধারে একটি চৌকিতে রোমাঁ রোলাঁ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসেছিলেন। রোলাঁর স্ত্রী রুশীয় মহিলা তাঁর সঙ্গে আলাপ করছিলুম রাশিয়া সম্বন্ধে। রোমাঁ রোলাঁও মধ্যে মধ্যে আমাদের আলাপে যোগদান করছিলেন। সন্ধ্যে হোয়ে এলো, আমি বিদায় নিলুম।

পরদিন প্যারিসে ফিরে যাবো তাই সকালে রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। সামনের বাড়ীতে রোলাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো, তিনি আমাকে দোতালায় রোমাঁ রোলাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। কাঁচের সার্সি দেওয়া বড়ো বড়ো জানালা দিয়ে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ঘরে তিনটি ছবি টাঙ্গানো রয়েছে—গান্ধীজির রবীন্দ্রনাথের আর গর্কির। বিছানার ধারে হেলান-চৌকিতে রোমাঁ রোলাঁ বসে ছিলেন। রোলাঁ-পত্নী বল্লেন, সকাল থেকে রোমাঁ বসে আছেন আপনার অপেক্ষায় চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে, এতো দেরী যে আপনার?

লজ্জিত হলুম, তিনি যে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবেন এটা মনে করিনি। চা পানের পর রোল্যাঁ-পত্নী চলে গেলেন। আমাদের কথাবার্তা সুরু হোলো।

বল্লুম—আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। আমি আপনাকে বলে যেতে চাই যে আমাদের লড়াই কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয়। দুটি ভিন্নমুখীন আদর্শের মধ্যে লড়াই বেধেছে—শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ ও সেই সমাজের ভিত্তিতে রচিত সভ্যতা থাকবে না, শ্রেণীভেদলুপ্ত মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা হবে, নতুন সভ্যতা বিকশিত হবে, এই হোলো প্রশ্ন, এই হোলো এই যুগের সমস্যা। এই সমস্যার দিক থেকে বিচার করে দেখলে আমরা দেখতে পাবো যে গান্ধীবাদ আর কমিউনিজম পরস্পর-বিরোধী। কমিউনিজমের পথ ছাড়া এই সমস্যা সমাধানের আর অন্য কোনো পথ নেই। আমাদের এই কাজে আপনার সহযোগিতা কামনা করি।

রোমাঁ রোলাঁ—আমি মনে করি না যে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় গান্ধীবাদ আর কমিউনিজম্ স্বভাবতই পরস্পর-বিরোধী। আমার মতে এই দুই মতবাদ মিলতে পারে ও তাদের মেলা উচিত। অবিশ্যি সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন শ্রম ও মূলধনের সম্বন্ধের পারস্পরিক সমস্যার সমাধানে গান্ধীকে বাধ্য হোতে হবে পরিষ্কার করে জানাতে যে তিনি কলওয়ালাদের পক্ষে না শ্রমিকদের পক্ষে। তখন আমাদের সময় আসবে গান্ধীবাদ অথবা কমিউনিজম্ এই দুয়ের মধ্যে কোনটাকে গ্রহণ করবো, কোনটাকে বর্জন করবো সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করবার।

বল্লুম—আমরা সে বাছাই অনেকদিন আগেই করে নিয়েছি। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে নতুন সম্বন্ধ রচনা করবার স্বপ্ন আমরা দেখি, যে স্বপ্ন বাস্তব করে তোলবার জন্যে আমরা কাজ করি, সেটা কমিউনিজমের পথ ছাড়া অন্য পথে পাওয়া অসম্ভব বলে মনে করি।

রোম্যাঁ রোলাঁ—গান্ধী সংস্কারের আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসবান কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি অতীত আঁকড়িয়ে বসে নেই। তিনি সর্বদাই চলেছেন আর তাঁর চিন্তা কথা ও কাজের মধ্যে বিন্দুমাত্র অসামঞ্জস্য নেই।

বল্লুম—সে তো ইয়োরোপের অনেক রাজনৈতিক নেতা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, এমন কি মুসোলিনী সম্বন্ধেও।

রোম্যাঁ রোলাঁ—(আবেগের সঙ্গে) মুসোলিনীর আর গান্ধীর নাম একসঙ্গে উচ্চারণ কোরো না। মুসোলিনী নিজেকে ছাড়া আর কিছু জানে না। তার প্রত্যেকটি কাজ শুধু তার উচ্চাকাঙ্খা ও দম্ভের পরিচয় দেয়। এমন কি হিটলার যে মুসোলিনীর চেয়ে বুদ্ধিতে অনেক খাটো, সেও মুসোলিনীর চেয়ে এ বিষয়ে অনেক বেশী খাঁটি।

বল্লুম—আপনি বোধ হয় জানেন না যে বর্তমানে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র গুলি বিশেষ করে বাঙ্গলাদেশের কাগজগুলি হিটলারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই কাগজগুলি হিটলারকে জার্মানীর ত্রাণকর্তা বলে অভিনন্দন জানিয়েছে।

রোম্যাঁ রোলাঁ—হাঁ, আমি জানি যে তরুণ ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে, বিশেষ করে বাঙ্গলা দেশের তরুণদের মধ্যে মুসোলিনীর খুব খাতির। আমি অনেকবার এই অনুরাগের প্রতিবাদ করেছি।

বল্লুম—ভারতবর্ষীয় জাতীয়তাবাদও একদিন এই ফ্যাসিজমের রূপ গ্রহণ করবে যদি না যথাসময়ে সফল বিপ্লব তাকে বাধা দেয়।

রোম্যাঁ রোলাঁ—গান্ধীবাদ আর কমিউনিজম্ দুয়েরই ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো দরকার। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের তরুণদের আবেদন জানিয়ে একটা লেখা তোমার হাতে দেবো, সেটা তুমি তোমার দেশের তরুণদের হাতে পৌঁছে দিও। গান্ধী সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলতে পারি যে আমি তাঁর অনুরক্ত। এই যুগের কোন মানুষকে আমি এতো শ্রদ্ধা করি না যেমন করি তাঁকে। কিন্তু তবুও যদি তিনি ভবিষ্যতে মূলধনের মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের লড়াইয়ে খোলাখুলি ভাবে শ্রমিকদের পক্ষ না নেন, আর আমার বিশ্বাস যে তিনি সেটা করবেন, তাহোলে তখন আমার সময় আসবে তাঁর কাছ থেকে সরে যাবার। কেন না যাই ঘটুক না কেন, শ্রমিকদের পক্ষে আমি এখনও আছি আর ভবিষ্যতেও থাকবো।

বল্লুম—আপনার এই কথা আমার মনে আশা জাগাচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতেই আমরা আপনার পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করবো আমাদের কাজে।

বিদায়ের সময় হোলো। সিঁড়ি পর্যন্ত এলেন। এখনো চোখে ভাসছে হল্‌দে রঙের দীর্ঘ ড্রেসিং গাউনে পা পর্যন্ত ঢাকা, দীর্ঘ ঋজু শরীর, হাত তুলে আমাকে বিদায় দিচ্ছেন, মুখ প্রশান্ত হাসিতে উজ্জ্বল।

মুক্তি-সাধক সত্যেন বসু

পলাশীর যুদ্ধের পনেরো বছর বাদে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এমন একটি পুরুষ জন্মালেন এই বাঙলা দেশে যিনি শুধু বাংলার জীবনে নয়, ভারতবর্ষের জীবনে নবজাগরণের, নব বসন্তের সব সম্ভাবনা বহন করে নিয়ে এলেন তিনি হচ্ছেন রামমোহন রায়। অন্য সব আন্দোলনের মতো রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত তিনিই করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ভারতীয়দের জুরি নিযুক্ত করার দাবী, নুনের একচেটিয়া ব্যবসা রদ করবার আন্দোলন, হাটে হাট্‌রেদের কাছ থেকে তোলা নেওয়ার প্রথা বন্ধ করবার দাবী, বিলাসসামগ্রীর উপর ট্যাক্‌স্ বসাবাব দাবী, জমিদার কর্তৃক চাষী-নিপীড়নের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ—এ সব তাঁর বিরাট কর্ম-ধারার সামান্য অংশ। তিনি চলে গেলেন। তখন সেই নবযুগের ধারাকে মুক্তধারা করে রাখবার জন্যে এলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথমে দেশহিতার্থী সভা, পরে ভারতবর্ষীয় সভা British Indian Association স্থাপন করে ভারতবাসীদের অবস্থার উন্নতিসাধন, চৌকিদারী ট্যাক্‌স্ যাতে গ্রামবাসীদের না দিতে হয় তার দাবীকরণ, নুন তৈরী করার অপরাধে দণ্ডিত গ্রামবাসীদের যে কঠোর দণ্ড দেওয়া হোতো তার পরিবর্তন, স্বায়ত্তশাসন—এই সব দাবী জানালেন ভারতবর্ষীয় সভার সেক্রেটারী রূপে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম জানানো হোলো স্বায়ত্তশাসনের দাবী বিদেশী শাসকদের কাছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোশিয়েসনের শাখা ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলো। আমাদের দেশে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মেলা প্রবর্তন করে দেশে-তৈরী জিনিসের ব্যবহার ও মাতৃভাষার উন্নতি সাধন করার জন্যে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষের তখনকার অবস্থায় এই ধরণের রাজনৈতিক আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে বিপ্লবপন্থী আন্দোলন বলা যেতে পারে।

এর অল্প দিন পরেই এলেন রাজনারায়ণ বসু। বলপ্রয়োগের দ্বারা বিদেশী শাসকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করবার মতবাদ প্রচারের জন্যে তিনি গুপ্তসমিতি স্থাপন করলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বালক রবীন্দ্রনাথ, এঁরা সবাই তখন রাজনারায়ণের চেলা। তারপরে সুরু হোলো কংগ্রেসের যুগ। বছরের পর বছর আটপৌরে প্রস্তাব পাশ করা ছাড়া আর কোনো কাজ তখন ছিলো না কংগ্রেসের। মহারানী ভিক্টোরিয়ার দৈহিক ও মানসিক অসুখের জন্যে ব্যাকুলতা, গভীর অস্বোয়াস্তি বোধ, সমবেদনা ও ভগবানের কাছে প্রার্থনা তখন

কংগ্রেসের প্রস্তাব হিসেবে মহারানীর কাছে পাঠানো হোতো। আগের যুগের স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের আন্দোলনও তখন অনুনয় বিনয় ও ভিক্ষার রাশিরাশি প্রস্তাবের তলায় চাপা পড়ে গেছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাগিচায় তখন দরখাস্ত-রাজনীতিজ্ঞদের মৌসুম। সেদিন শুধু বাংলায় ও মহারাষ্ট্রে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী সাধকদের দুঃসাধ্য সাধনা চলছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এতো কাপুরুষতা এতো জমাট ভয় জাতির প্রাণকে চেপে ধরে ছিলো, আত্মঅবিশ্বাস সেদিন কর্মশক্তিকে এমন করে টুঁটি চেপে পঙ্গু করে রেখেছিলো যে সাহস সঞ্চার করা, আত্ম-বিশ্বাস ও পৌরুষ ফিরিয়ে আনাই ছিলো সে দিন ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনার সব চেয়ে বড়ো কাজ। এই বৈপ্লবিক ব্রত সাধন করবার জন্যে এগিয়ে এলেন একদল তরুণ। বিদেশী শাসকদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করতে হবে ও সেই বলপ্রয়োগ নৈতিক, যিনি এই ধারণার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই প্রথম বলপ্রয়োগ সমর্থক বিপ্লবী রাজনারায়ণ বসুর পরিবার থেকেই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্রষ্টারা এলেন—অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও সত্যেন বসু। প্রথম দু জন হলেন রাজনারায়ণের দৌহিত্র ও শেষ দু জন হলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও সত্যেন বসু হোলেন রাজনারায়ণ বসুর ছোটো ভাই অভয়চরণ বসুর পুত্র। ১২৮৯ সালের ১৫ই শ্রাবণ (ইংরিজী মতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই) মেদিনীপুর সহরে সত্যেন বসুর জন্ম। পনেরো বছর বয়েসে জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রেন্স পাশ করেন ও মেদিনীপুর কলেজ থেকে এফ্-এ পাশ করে কলকাতায় সিটি কলেজে বি-এ ক্লাসে ভর্তি হন। এই সময়ে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, থাইসিস্ হয়েছে সন্দেহ হয়। তাই কলেজে পড়া ইস্তফা দিয়ে শরীর সারাতে ওয়াল্‌টেয়ারে চলে যান। রাজনারায়ণ, অরবিন্দ ও ওঁর দাদা জ্ঞানেন্দ্রনাথ, এঁরা তিনজনই ছিলেন সত্যেন্দ্রের রাজনৈতিক প্রেরণার উৎস।

কিছু দিন পরেই ব্রিটিশ শাসনকে বলপ্রোয়োগের দ্বারা উচ্ছেদ করবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে কানাই দত্ত ও সত্যেন বসু আসেন প্রেসিডেন্সী জেলে। বন্দী অবস্থাতেই রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে নিহত করলেন তাঁরা প্রেসিডেন্সী জেলের ভিতরে। ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে তাঁদের ফাঁসি হয়ে গেলো।

তারপরে প্রাণ-নিবেদনের রক্তরাঙা পথ ধরে বহু মুক্তিকামী সাধকেরা এলেন। জাতি আত্ম-বিশ্বাস ফিরে পেলো, ফিরে পেলো সাহস ও আত্মত্যাগের উদ্দীপনা। তার পরের ইতিহাস হচ্ছে যে আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে জাতিকে যেতে হয়েছে মুক্তির সন্ধানে, তার ইতিহাস। সে ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে স্বাধীনতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে। ইতিমধ্যে দেশ ভুলেও গেছে সেই সাধকদের যাঁরা সমস্ত জীবন দিয়ে জাতির প্রাণের অন্ধকার দূর করে দিয়ে সেখানে আলো জ্বেলেছিলেন। এমনিই হয়ে থাকে। কাল বড়ো নির্মম, অতীতকে ভুলিয়ে দেওয়ার লীলাতেই কালের হৃদয়হীন কৌতুকপ্রিয়তার প্রকাশ। বর্তমান হচ্ছে এই ব্যথাহীন কালের সন্তান। তাই বেদনা পেলেও এই বিস্মরণকে কালের দান হিসাবে স্বীকার করে নিতেই হবে। কিন্তু মানুষ যখন ইতিহাসকে বিকৃত করে নিজের মনের বিকার দিয়ে, তখন সেই ইতর বিকৃতি মনকে পীড়া দেয়। তখন বীরের বীরত্ব, ত্যাগীর ত্যাগের মর্যাদা রক্ষা

করবার জন্যে সেই মিথ্যার প্রতিবাদ করা দরকার হয়ে পড়ে।

সত্যেন বসু সম্বন্ধে অনেক কাল থেকে একটি প্রচার চলে আস্‌ছে যে তিনি ফাঁসির কিছু দিন আগে থেকে বড়ো কাতর ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কে যে একথা রটনা করেছিলো, কি উদ্দেশ্য নিয়ে রটনা করেছিলো তা জানি না। বিপ্লবপন্থী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রেষারেষি থাকায় উপদলীয় শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করবার জন্যে এ ধরণের ইতর প্রচার কোনো সময়েই দুর্লভ ছিলো না। পরবর্তী যুগে বিরুদ্ধ দলের লোকদের সম্বন্ধে এই ধরণের প্রচার দলগুলির রাজনৈতিক কর্মের অন্যতম কাজ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই প্রথম যুগে? তখনও কি এই ধরণের নীচতার বেসাতি ছিলো?

কয়েক মাস আগে রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতি-বার্ষিকী-উৎসব উপলক্ষে আমি মেদিনীপুরে গিয়েছিলুম। অনেক কাল থেকে শুনে আসছিলুম যে রাজনারায়ণ বসুর এক ভাইয়ের দুই মেয়ে মেদিনীপুরে বাস করেন। এবারে তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দুই বোনের একজনের বয়েস আশি পেরিয়েছে, আর এক জনের বয়েস আশির উপকূলে। সেদিন বিকেলে তাঁদের বাড়িতে বসে আলাপ করবার সময়ে জানলুম যে এঁরা হচ্ছেন সত্যেন বসুর নিজের দুই দিদি। ঘরের দেয়াল থেকে একটি ফ্রেমে-বাঁধানো আব্‌ছা হয়ে যাওয়া একটি চিঠি নামিয়ে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বৃদ্ধা বল্লেন—"এটি সত্যেনের শেষ চিঠি, ফাঁসির তিন দিন আগে লেখা। দেখুন পড়ে, একটুও কাতর হয় নি সে।" মৃত্যুর হাত থেকে বরমাল্য নেবার জন্যে প্রতীক্ষা-রত সাধকের শেষ চিঠিখানি পড়লুম। চিঠির তারিখ ১৭ই নভেম্বর, ১৯০৭ সাল। প্রেসিডেন্সী জেলের ফাঁসি-কুঠরি থেকে চিঠিটি লেখা। পঞ্চাশ বৎসর বয়ে গেছে চিঠিটির উপর দিয়ে। এতো কাল চিঠিটি গৃহ-কোণে পড়েছিলো। আত্মীয়দের ভালোবাসাই এতোদিন একে রক্ষা করেছে। লেখা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কাগজটি জরাগ্রস্থ। পড়লুম চিঠিটি। এতোটুকু উদ্বেগ বা ভয়ের চিহ্ন নেই চিঠিটিতে। পঞ্চাশ বৎসরের উজান ঠেলে মন চলে গেলো ১৯০৭ সালে। দেখলুম মানসচক্ষে, বসে আছেন দেশের মুক্তি-সাধক তরুণ বীর আধো-আলো অন্ধকার ছোট্ট ফাঁসি-কুঠরিতে। ভয়হীন মন আনন্দোচ্ছল প্রশান্তিতে ভরা, বসে আছেন তিনি মৃত্যুর হাত থেকে দেশপ্রেমের বরমাল্য নেবার প্রতীক্ষায়। বল্লুম মনে মনে—হায় রে, তোমাকে ভীরু বলে জাহির করবার লোকও এ দেশে জুট্‌লো! তা না হোলে এতো দুর্দশাই বা হবে কেন বাঙলার ও বাঙালীর!

সেই দিনই বিকেলে সত্যেন বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে গিয়েছিলুম। বীরেন বাবুর দিদি সত্যেন বসুর লেখা আর একটি চিঠি আমাকে দেখালেন।

পূজনীয় দাদাবাবু,

গত শনিবার আপনি আসিবেন বলিয়াছিলেন—কিন্তু আসিলেন না কেন? সেদিন হইতে আপনার জন্য আশা করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি আজ পর্যন্ত আসিলেন না। যাই হউক—আজ এখুনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বলিলেন যে আপিল অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং ২১শে

তারিখ, শনিবার—সকালে দিন স্থির হইয়াছে। অতএব মধ্যে আর মাত্র তিন দিন সময়। পত্র-পাঠ আপনি অবশ্য একবার শেষ দেখা করিয়া যাইবেন। যেদিন আসিবেন সেদিনই দেখা হইবে। অন্য কেহ যদি দেখা করিতে চান সঙ্গে লইয়া অসিবেন—মিঃ রায়কে দেখিতে ইচ্ছা করে যদি তিনি আসেন তবে সুখী হইব। তৎপরে দাদা! আপনার নিকট একটী অনুরোধ আছে—জানিবেন আপনার নিকট এটি আমার এই প্রথম ও শেষ অনুরোধ—সেটী এই যে আপনি যে রকমই ভাবুন আমার অনুরোধ ভাবিয়া দেখিবেন যেন শেষ জীবনে এই বৃদ্ধ বয়সে মা কোন বিশেষ কষ্ট না পান। আর আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। শনিবার সকালে আসিয়া দেহ লইয়া যাইবেন। নদিদি প্রভৃতি আসেন ভালই। প্রার্থনাদি করিয়া যেন সংকার করা হয়। আশা করি পত্র-পাঠ একবার দেখা করিয়া যাইবেন। ইতি

আপনার
স্নেহের ভাই সত্যেন

একই দিনে দুটি চিঠি তিনি লিখেছিলেন, একটি দিদিকে, অন্যটি দাদাকে। এই চিঠিদুটি থেকে সত্যেন বসুর মনের যে ছবি আমরা পাই তা যেমন বীরত্বপূর্ণ তেমনি কোমল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রকৃত কোমলতা সে তো বীরত্বের নিত্য উপাদান, চির সহচরী। আর কোমলতার যথার্থ প্রকাশ সে তো শুধু বীরত্বেই।

রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন বাস্তববাদী

মনন ও ভাব—এই দুইয়ের সমন্বয়ে যাকে আমরা জীবনের আদর্শ বলে থাকি সেটি রচিত হয়। এই রোজ আনি রোজ খাই'য়ের যুগে শুধু অন্ন নয়, মানুষের খোরাকও এই দিনের প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটা সাধারণ মানুষের কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয়, তারা দিনের চাহিদা মেটাতে পারলেই খুসি থাকে। তাদের দোষ দেওয়াও যায় না। প্রতিটি দিনের জৈবিক দাবী মেটাতে তারা এতোই হয়রাণ যে তার সীমা অতিক্রম করে চিন্তাকে ও ভাবকে রোজকার এলাকার বাইরে অভিসারে পাঠানো ইতিহাসের পরিণতির খোঁজ নেওয়ার জন্যে ও তার হদিশ পাওয়ার জন্যে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। রোজকার জীবনের চাহিদা মেটাতে মানুষ ক্লান্ত ও অবসন্ন। সেই বাড়তি শক্তিটুকু কোথায় যে তা দিয়ে তারা তাদের মানসকে ও ভাবকে চালিত করবে ঐতিহাসিক পরিণতির সন্ধানে!

অথচ এই পরিণতির ধারণা ও ভাবনা না থাকলে জীবন নিরর্থক হয়ে যায়, প্রাতিদিনের জীবন-ধারণেরও অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। মন রস পায়না জীবনের মৃত্তিকা থেকে, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে বুকের ভিতরটা।

গোড়াতেই বলেছি মনন ও ভাব—এ দু'য়ের মিলন ঘটাতে না পারলে আদর্শের নাগাল পাওয়া যায় না। শুধু চিন্তা দিয়ে হয় না, শুধু ভাব দিয়েও হয় না! মগজের চিন্তাটাকে ভাবের রসে জারিয়ে নিতে হয় তবে চিন্তা গতি লাভ করে।

কিন্তু এই যে আদর্শ, যাতে স্পর্শ করে মানুষের সত্তা শত হতাশা, লাঞ্ছনা ও বাইরের পরাজয়কে তুচ্ছ করে জীবন পথে চলে, চিন্তায় ও ভাবে দৈন্য ছিলো না, ফাঁকি ছিলো না, এই কারণেই একজন মানুষ তার প্রাণের বহু-বাঞ্ছিত, দীর্ঘ-প্রত্যাশিত, সারা জীবনের আহুতির দ্বারা একান্তভাবে পূজিত সেই আদর্শ সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এইটে সে দেখে যাবেই এটা কি বলা যায় নিশ্চয়তার সঙ্গে? আদপেই সেটা বলা যায় না। কেন না এক ব্যক্তির চিন্তার ও ভাবের সঙ্গে যেমন অনেকের মননের ও ভাবের মিল আছে, তেমনি বহু লোকের চিন্তার ও ভাবের গরমিলও আছে। তাই এই বহু বিভিন্ন চিন্তার ও ভাবের ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘাতের ফলে যে আদর্শকে একজন মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেছে ও সেবা করেছে তার সামাজিক প্রতিফলন সেই ব্যক্তির জীবনে সম্ভব নাও হোতে পারে।

তবুও মানুষ সমস্ত অন্তর দিয়ে সেই আদর্শকে ধরে থাকে কেন ও কি করে? এই জন্যেই সে পারে যে তার জীবনের অতি সীমিতকালের পরিধির মধ্যে সে তার আদর্শকে

বন্দী করে রাখেনি বলে। খন্ডকালের দেনা-পাওনার হিসেবে যেটি অ-বাস্তব, মানব-ইতিহাসের সুদীর্ঘ বহু দূরবিস্তৃত বিরাট কালের গতি-সন্ধানী মর্মগ্রাহী মনের কাছে সেটি বাস্তব।

স্বীকার করতেই হবে যে আদর্শবাদীর এই বাস্তবের মধ্যে মনন ও ভাবের সঙ্গে কল্পনারও মিশ্রণ যথেষ্ট আছে। তবুও কতোটুকুই বা সত্যি করে পাওয়া যায় জীবনে, আর কতো বিরাট থেকে যায় জীবনে না পাওয়ার অংশ। মানুষ তার অন্তরের সেই না পাওয়ার শূণ্যতাকে কল্পনা দিয়ে ভরাট করে নেয়, আর তার হৃদয়ে আদর্শ মানসীকে না পাওয়ার জন্যে যে বিরহ আছে, কল্পনা সেই বিরহের কাণে কাণে মিলনের আভাস দেয়। কল্পনা তাই সেই শক্তি যা না-পাওয়াকে পাইয়ে দেয়, আদর্শ-মানসীর সঙ্গে বার বার হৃদয়ের মিলন ঘটায়, ও মানুষকে সেই অন্তর্মিলনের শক্তিতে দুঃখজয়ী করে তোলে।

এ না হলে সংবেদনশীল আদর্শবাদী মানুষ ঘটনার নির্মম আঘাতে একেবারে ধুলায় মিশিয়ে যেতো। তাই শুধু বিশ্লেষণ, বিচার ও ইতিহাসের গতির স্বচ্ছ ধারণাই যথেষ্ট নয় মানব-যাত্রীর পক্ষে, মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্যে অন্তরের গভীর ব্যাকুলতা, প্রবল ভাব-পিপাসাও একান্ত প্রয়োজনীয় শক্তি যুগিয়ে দেয় তাকে পথ চলার কালে।

এই ভাব বাস্তবকে অস্বীকার করে, যা নিত্য ঘটছে তার চারপাশে তার অনিত্যতা সম্বন্ধে কোনই সংশয় পোষণ করে না সে অন্তরে। মাটিতে ফুটে সূর্যমুখী যেমন দূর আকাশের সূর্য্যের সঙ্গে মিতালি পাতায়, ঠিক তেমনি করে অন্তরের ভাব-জগৎ সমকালীন ঘটনার প্রবল আঘাতকে ক্ষণিকের বীভৎসতা বলে ঘোষণা করে, তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিহত করে, প্রাণও দেয় তাকে বাধা দিতে গিয়ে। ভাবের এই পরম শক্তি—কিন্তু শুধু বুদ্ধি বিচার ও বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। আত্মিক বোধ, কল্পনার উপাদান—সব কিছু এই ভাবের অন্তরে বিরাজমান।

একেই আমি রোম্যান্‌টিসিজম্ বলি—সুদূরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে মানুষের পথ-চলা। এই রোম্যান্‌টিসিজমের অন্তরে আছে প্রচন্ড বিদ্রোহের শক্তি, অবিশ্রাম গতি প্রবণতা, স্থানুত্বের প্রতি ঘৃণা, কাঠামো সর্বস্বতার বিরুদ্ধতা, সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার ইঙ্গিত, মানুষকে সৃষ্টিশীল করবার সাধনা, মানুষের যেটা স্বরূপ, তার যাত্রীর স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করা।

প্রতিটি বিপ্লবী, প্রতিটি সৃজনধর্মী মানুষের অন্তরে তাই আছে রোম্যান্‌টিসিজম্ অর্থাৎ আঘাতের পর আঘাত সহ্য করে, পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করে, আনন্দিত মনে পথচলার অপরাজেয় শক্তি অর্জন করে।

মানব-ইতিহাসের প্রতিটি বিপ্লবের যুগে অগুণ্তি সৃষ্টিশীল মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। খাঁটি রোম্যান্‌টিসজমের সঙ্গে তাই সৃজনশীলতার নিবিড় সম্বন্ধ আছে। এই সৃজনশীল মন সত্য করে রঙ ও রসের আস্বাদন পেয়েছে বলে ক্রুরতা, ছন্দোহীনতা সহ্য করতে পারে না ব্যক্তিগত কিম্বা সামাজিক জীবনে। তাই বিদ্রোহ হচ্ছে রোম্যান্‌টিক মনের স্বাভাবিক প্রকাশ। এই রোম্যান্‌টিসিজমের সঙ্গে তাই ঝুটো রেম্যানটিসিজমের কোনো সম্পর্ক নেই। ঝুটো রোম্যান্‌টিসিজিম্ বিদ্রোহ করে না অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সে সরে পড়ে, গৃহকোণে লুকিয়ে থাকে ও দিবাস্বপ্নে মসগুল হয়ে দিন কাটায়। এই মনোবৃত্তিকে রোম্যান্‌টিসিজম্ আখ্যা

দেওয়া একেবারেই সঙ্গত নয়—এর যথার্থ নাম হচ্ছে ক্লীবত্ব, আত্ম-বিলাসী, ব্যক্তি-সত্ত্বা-বিরোধী ও সামাজ-বিরোধী মনোভাব।

এই রোম্যান্টিক মনোভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব কবিতা আছে, তাঁর 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থে। কবিতাটির নাম—' রোম্যান্টিক্'। কবি বলছেন—

"আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক।
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ-পথের পথিক।"

কবি অকপটে পরম গর্বের সঙ্গে স্বীকার করছেন যে তিনি রোম্যান্টিক, রসতীর্থের পথে তিনি যাত্রী। তিনি স্রষ্টা, বিধাতার কারুশালা থেকে রঙ ও রস চুরি করে তিনি রচনা করেন কবিতা, তিনি বাধেঁন গান। তাঁর সৃষ্টি বাস্তবের ফোটোগ্রাফ নয়, বাস্তবের নকল নবিশিয়ানা নয়। স্রষ্টার বাস্তব, কবির বাস্তব সেই ভবিষ্যৎ, যে ভবিষ্যতে কুশ্রীতা নেই, দৈনা নেই,পাশবিকতা নেই। যা ঘটছে, যা জীবনকে পীড়া দিচ্ছে ও কলুষিত করছে সেই ঘটনাগুলিকে দূর করবাব জন্যে 'বাস্তব' সাজ্বার প্রয়োজন নেই। সৌখিন বাস্তববাদী সেজে জীবনের এই কুশ্রীতা দূর করবার অভিনয় করবার দরকার নেই। যে রোম্যান্টিক সে-ই এই কুশ্রীতা দূর করবে, কেন না রোম্যান্টিক তার অন্তরে সুন্দরের স্পর্শ পেয়েছে। সে জানে ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে মানুষের জীবন ঘিরে যে অন্ধকার তাকে দূর করাই হচ্ছে মানুষের মহোত্তম ব্রত।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ—

যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি—সে নহে কথায় তাহা জানি,
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা,
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম,
সেথায় নির্মম কর্ম;
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ,সেথা ভেরী বাজুক মাভৈ
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে,
চলে হাতে হাতে।"

রঙীন উত্তরী ফেলে বর্ম পরে সুন্দরের সাথে ভৈরবের মিলন ঘটিয়ে যে কর্মের জগতে চলতে পারে, সেই প্রকৃত রোম্যান্টিক, একমাত্র সেই পারে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুশ্রীতা দূর করে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করতে।

'রোম্যান্টিক' রবীন্দ্রনাথের সমকালীন জগতের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কি ধারণা ছিলো সেটি জানলে 'শৌখিন বাস্তব' যাঁরা তাঁদের যে বিশেষ কোনো উপকার হবে সে আশা করি না, কিন্তু এই ঝুটো বাস্তববাদী ছাড়া যে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন তাতে সন্দেহ নেই।

১৩৪২ সালে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন তাতে বল্লেন—"মানুষ শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকের চিত্তবৃত্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে।" যে কবি ভারতবর্ষের রূপবর্ণনা করেছেন অপরূপ ভাষায়—'ঐ ভুবনমনমোহিনী' গানে তিনিই আবার ছাত্রদের সম্ভাষণ করে বলছেন—"ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপর শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন একথা ধ্যান করা নেশামাত্র, কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহা রোগীকে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভান্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।"

অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞানকে ধিক্কার দিয়ে 'রোম্যান্টিক' রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"কেবলমাত্র অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোনো কাজের জিনিষ নয়। কোনো উদ্দেশ্যের মধ্যে দিয়ে জ্ঞানকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে সে জ্ঞান যথার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। আমি সেই রাস্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।"

'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয়, নিজের নিষ্কর্ম থেকে।" ১৩১৩ সালে ৪ঠা কার্তিক তারিখে নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"তোমরা বাঁচাও এই দেশকে। অন্ন দাও, শিক্ষা দাও, ধর্ম দাও। ...দেশে যখন ফিরে আসবে তখন দেখতে পাবে এখানে করবার জিনিষ অনেক আছে কিন্তু করবার পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। শুধু তাই নয়, এখানকার হাওয়া আলস্য জড়তার বীজে পূর্ণ। চারিদিকের লোক কেবলই ছোট চিন্তা, ছোট কথা, ছোট কাজ নিয়ে আছে—সেই দেশব্যাপী ক্ষুদ্রতার ভারাকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল, এখানে সমাজের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চয় নেই—নিজের ভিতর থেকে কল্যাণের উৎসকে উৎসারিত করতে হবে। এই ক্ষুদ্রতার সপ্তরথী বেষ্টনের মধ্যে পড়ে হতাশ হোয়ো না। প্রতিদিনের কর্মের মধ্যে যখন আশু সফলতার লক্ষণ দেখতে পাবে না, তখন যেন নিজের বা দেশের বা বিধাতার উপর রাগ করে হাল ছেড়ে দিও না। মনে একথা স্থির রেখো যে সিদ্ধিই যে একমাত্র লাভ তা নয়, সাধনাও মস্ত লাভ।"

১৩১৫ সালে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় যখন কিছুদিনের জন্যে শিলাইদা'য় স্থানান্তরিত হয় তখন শিক্ষক ভূপেশচন্দ্র রায়কে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"প্রজাদের বাস্তুবাড়ি ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস কলা খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে মজবুত সূতা বাহির হয়। ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমূল, আঙুর প্রভৃতি গাছ বেড়ার কাজে লাগাইয়া তাহার মূল হইতে কিরূপ খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভ হইবে। কৃষি-বিজ্ঞানের উপদেশ মতো চেষ্টা করিবে।"

কথাগুলি কি স্বপ্ন বিলাসীর কথা কিম্বা সমকালীন রাজনৈতিক পাটোয়ারীদের লোক-ঠকানো শ্লোগানধর্মী কথা বলে মনে হচ্ছে?

জমিদারী প্রথা সম্বন্ধে কতো কথাই না আমরা বলেছি কতো জন-সভায়। প্রাণ-সত্তা বাণীর প্রসাদ-বঞ্চিত আমরা বেশী কথা গেঁথে প্রকাশের দৈন্য ঢাকবার কতো না চেষ্টা করেছি। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'রায়তের কথা' বইটির ভূমিকা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"জমিদার জমির জোঁক। সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব; যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতের মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন যোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই।"

জমিদারীগুলিকে কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে পরিবর্তিত করবার কল্পনাও রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে জমিদারের পেশা তাঁকে লজ্জা দেয়। জমিদারীটাকে রথীন্দ্রনাথ যদি কো-অপারেটিভে পরিণত করেন তো তিনি খুব খুশি হন।

১৯৩০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা একটি চিঠিতে সমবায় নীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিলো আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে—জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর, দ্বিতীয়ত, সমবায় নীতি-অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আল-বাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।"

১৯২৯ সালের উনিশে অক্টোবর তারিখে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"চাষীদের মধ্যে ফসল-উৎপাদনের সমবায় প্রণালী প্রবর্তন করতে হবে, জমির প্রকৃতি পরীক্ষার ও উপযুক্ত সার জোগাবার প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে। ...সমবায় প্রণালীতে কৃষির উন্নতি চেষ্টা যদি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রবর্তিত করা হয় তবে যতটুকু পরিমানেই সেই চেষ্টা সফল হবে ততটুকু পরিমাণে সেই সফলতা স্থায়ী হবে এবং ক্রমশ ব্যাপ্ত হতে থাকবে, কেননা এইটেই বর্তমান কালের সঙ্গে সঙ্গত।"

ফসল বাড়ানোর জন্যে রবীন্দ্রনাথ সমবায় প্রণালীতে কৃষি-ব্যবস্থার প্রবর্তনের উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়েছিলেন, আর কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট ও তথা-কথিত বামপন্থীদের যুক্তফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট চাষীদের ভোট নিজেদের কোঁচড়ে কুড়োবার জন্যে আল-বাঁধা টুকরো জমিগুলোকে আরো টুকরো করে চাষীদের মধ্যে বন্টন করবার নীতি গ্রহণ করেছিলো। তার ফলে বাঙলার কৃষি-ব্যবস্থার সর্বনাশ সাধিত হয়েছে। উৎপাদন বাড়া তো দূরের কথা, উৎপাদন ক্রমশই কমে যেতে বাধ্য অর্থনীতি-বিরুদ্ধ এই নীতি অবলম্বন করার ফলে।

এইতো গেলো অতি সংক্ষেপে ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা। এখন এই সমকালীন জগৎ ও তার সমস্যাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন সেটা দেখা যাক। সাচ্চা দেখনেওয়ালাদের দৃষ্টিতে সমকালীন সমাজ হচ্ছে সেই বীভৎস ব্যবস্থা

যেখানে মানুষের বলি অবাধে করে চলে ধর্ম-ব্যবসায়ীরা, যেখানে জাতীয়তাবাদের অপদেবতার পূজো, যেখানে ক্ষমতাদানবের পায়ে মাথা লুটোয় মানুষ। ধনতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ সমস্ত পৃথিবীকে দখল করতে উদ্যত, তার রাক্ষসীলোলুপতার জন্যে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে রক্ত-বন্যায়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে দেখা এই বর্তমান জগতের, এই সমকালীন মানব-সমাজের রূপ কি? রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"আজকাল চলছে যা কিছু সব ধনপতির হাতেই চলছে।" (কালের যাত্রা)

বলছেন মহাকবি—এযুগের পুষ্পধনুর ছিলেটাও বেনের টানেই দেয় মিঠে সুরে টংকার। তার তীরগুলোর ফলা বেনের ঘরে শানিয়ে না আনলে ঠিক জায়গায় বাজে না বুকে। একালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে রাজেশ্বর মূর্তি।" (কালের যাত্রা)। শুধু কি তাই? সমকালীন জগতে প্রাকৃতিক কারণে একটি মানুষেরও মরবার কোনো হেতু নেই। একটি দেশে যদি অকাল আসে, বন্যায় সব ফসল নষ্ট হয়ে যায় কিম্বা বৃষ্টির অভাবে ফসল না ফলে, তাহলেও সেই দেশের লোকেদের অন্নাভাবে মরবার কোনই কারণ নেই। সারা পৃথিবীতে এতো অপর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য তৈরী হচ্ছে আর এতো তাড়াতাড়ি সেইসব খাদ্যদ্রব্য পৌঁছিয়ে দেওয়া যায় দেশ থেকে দেশান্তরে যে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাকে জয় করেছে বল্লেই চলে এই বর্তমান যুগ। তবুও মানুষ অনাহারে মরছে কি কারণে? মরছে প্রাকৃতিক কারণে নয়—রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে। ধনতান্ত্রিক সমাজের যারা মোড়ল তারা সব উৎপন্ন ফসলের একচেটিয়া অধিকার নিজেদের হাতে রেখে মুনাফা লোটবার উন্মত্ত লালসায় খাদ্যদ্রব্যগুলি আটক করে রাখছে, বুভুক্ষু মানুষের কাছে পৌঁছতে দিচ্ছে না। কোনো জিনিষ বেশী উৎপন্ন হলে তাকে নষ্ট করে এই সর্বনেশে কৃত্রিম উপায়ে তার দাম বাড়াচ্ছে—এক কথায় বিশ্বের অপরিমিত খাদ্য-উৎপাদন মুনাফাখোর নর-রাক্ষসদের পৈশাচিক ব্যবহারে বিশ্বমানবের কল্যাণে লাগছে না। এই সামাজিক কারণেই মানুষ আজ অনাহারে মরছে—মুনাফা-লোলুপ নর-রাক্ষসরাই মানুষের অনাহারে তিল তিল করে মরার কারণ।

এই নির্মম ধনতান্ত্রিক মুনাফাধর্মী সমাজ-ব্যবস্থার মুখ থেকে মেকী সভ্যতার চিকণ ঘোমটাটিকে টেনে খুলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গভীর সমাজ-চেতনার পরিচায়ক কয়েকটি কথায় মানুষের উপবাসের কারণ দর্শিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—"ভরা ফসলের ক্ষেতে বাসা বেঁধে আছে উপবাস।"

ফসলহীন ক্ষেতের দরুণ মানুষ মরছে না উপবাসে এ যুগে। এ যুগে ভরা ফসলের ক্ষেতে উপবাসের আস্তানা—অর্থাৎ পর্যাপ্ত ফসল থাকা সত্ত্বেও মানুষ আজ অন্নহীন, উপবাসী। এর অর্থ অতি সুস্পষ্ট। টীকা নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"মুনাফার লোভে, ক্ষমতার আকাঙ্খায় মানুষের সত্য আজ সর্বত্র যেমন আচ্ছন্ন হয়েছে এমন আর কখনো হয়নি।" (যাত্রী)

বলছেন মহাকবি—"যে দুঃখের কথাটা বলছি তা এই জগৎ জুড়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে। আজ মুনাফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ময় সত্য রাহুগ্রস্থ। এই জন্যেই মানুষের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা, তাকে বঞ্চনা করা, এতো সহজ হলো। ...মানুষের ফুলে-ওঠা পকেটের

তলায় মানুষের চুপসে যাওয়া হৃদয় পড়েছে চাপা। সর্বভুক পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনদিন এমন কুৎসিত আকারে দেখা দেয়নি।" (পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী)

পরশ্রমভোগী ধনিকদের এই নির্মম লুণ্ঠনকে রবীন্দ্রনাথ 'সর্বভুক পেটুকতা'র বীভৎস প্রকাশ ও চূড়ান্ত অমানুষিকতা বলে নিন্দা করেছেন।

শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবে গ্রামবাসীদের সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"লক্ষপতি ক্রোড়পতি টাকার থলি নিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে থাকতে পারে। বড়ো বড়ো হিসাবের খাতা ছাড়া তার আর কিছু নেই, তার সঙ্গে কারো সম্বন্ধ নেই। আপনার টাকার গড়খাই করে তার মধ্যে সে বসে আছে, সর্বসাধারণের সঙ্গে তার সম্বন্ধে কোথায়?

...দরদ যখন চলে যায়, মানুষ অধিকাংশ মানুষকে যখন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো দেখতে অভ্যস্থ হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে যখন দেখে 'তারা আমার কলের চাকা চালিয়ে আমার কাপড় সস্তা করবে, আমার খাবার জুগিয়ে দেবে, আমার ভোগের উপকরণ সুগম করবে'—এইভাবে যখন মানুষকে দেখতে অভ্যস্থ হয় তখন তারা মানুষকে দেখে না, মানুষের মধ্যে কলকে দেখে। ...এখানে চালের কল আছে। সেই কল-দানবের চাকা সাঁলতাল ছেলেমেয়েরা। ধনী তাদের কি মানুষ মনে করে? তাদের সুখ দুঃখের কি হিসাব আছে? প্রতিদিনের পাওনা গুণে দিয়ে তার কাছে বসে রক্ত শুষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। এতে টাকা হয়, সুখও হয়, অনেক হয়, কিন্তু বিকিয়ে যায় মানুষের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবত্ব। দয়া-মায়া পরস্পরের সহজ আনুকূল্য, দরদ—কিছু থাকে না।"

সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কতো সচেতন ছিলেন ও কি কঠোর ভাবে যে তার সমালোচনা করেছেন তা তাঁর উক্তিগুলি থেকেই সুস্পষ্ট।

বর্তমান সময়ে সভ্যতার নাম দিয়ে যে অপরূপ বস্তুটি ধনতান্ত্রিক সমাজের মোড়লরা ফিরি করে ফিরছেন সেই সভ্যতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"বর্তমান সভ্যতায় দেখি একজায়গায় একদল মানুষ উৎপাদন-চেষ্টায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর এক জায়গায় আর একদল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে। চাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে আলো, এ সেই রকম। একদিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করেছে, অন্য দিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ সেখানেই কেন্দ্রীভূত। স্বভাবত সেখানেই আরাম, আরোগ্য, আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্য দান করে। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা কিছু পৌঁছয় তা যৎকিঞ্চিত। এই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সভ্যতা বাসা বেঁধে আছে তার বাসা বেশীদিন টিকতেই পারে না।"

এই কথাই নানাভাবে বার বার বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। বলছেন মহাকবি—

> ক্ষুধাতুর আর ভূরি-ভোজীদের
> নিদারুণ সংঘাতে,
> ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,

সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।

বলছেন— প্রতাপের ভোজে আপনারে
যারা বলি করেছিল দান,
সে দুর্বলের দলিত পিষ্ট পাণ,
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণদংশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে,
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।

একদিকে যখন ক্ষুধাতুর অন্ন-বিনা মরছে, ভুরিভোজীরা সভ্যনামিক পাতালে লুটের ধন জমাচ্ছে, নরমাংসাশীরা দুর্বলের মাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে ও সমস্ত পৃথিবী রক্তের পাঁকে ভরে দিচ্ছে, তখন যারা লোহার সিন্দুক ভরে নিয়েছে লুটের মালে, তারা শান্তির বুলি আওড়ে নিজেদের লুট বাঁচাবার চেষ্টা করছে। এই নকল ধার্মিকদের অগ্নিজালা কঠোর বিদ্রূপ করে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গীর্জায়
চাটু বাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়!
দীনাত্মাদের বিশ্বাস, ওরা ভীত প্রার্থনা-রবে
শান্তি আনিবে ভবে।
কৃপণ পূজায় দিবে নাকো কড়িকড়া
থলিতে ঝুলিতে কষিয়া আঁটিবে
শত শত দড়ি দড়া;
স্তূপাকার লোভ বক্ষে রাখিয়া জমা,
কেবল শাস্ত্র মন্ত্র পড়িয়া লবে বিধাতার ক্ষমা
সবেনা দেবতা হেন অপমান এই ফাঁকি ভক্তির.
যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ কল্যাণশক্তির,
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ করিয়া শেষে,
নূতন জীবন নূতন আলোকে জাগিবে নূতন দেশে।

কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত তার জন্যে অপেক্ষমান যুগের প্রান্তে। এই লোভী ভীরু ও কৃপণ নকল-ধার্মিককে তার ইসারা দিয়ে কবি তাঁর অন্তর-দেবতার কাছে প্রার্থণা জানিয়েছেন—

"মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও,
শক্তি দাও মোরে, কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী।
শিশুঘাতী, নরঘাতী কুৎসিত বীভৎসা পরে
ধিকার হানিতে পারি যেন,
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের হৃৎস্পন্দনে।"

এইতো বর্তমান বিশ্বের অবস্থা, সমকালীন মানবসমাজের চেহারা, এই অবস্থাই কি চিরন্তন হবে? ক্ষেত ফসলে ভরা থাকতেও কি কোটি কোটি লোক উপবাসে মরবে, যেহেতু লোভী, কৃপণ, শিশুঘাতী ও নরঘাতী নকল-ধার্মিকের দল সমাজ ও রাষ্ট্র দখল করে বসে আছে? মানুষের মনুষ্যত্বে অশেষ আস্থাবান, মানুষের স্বর্গজয়ী অপরাজেয় শক্তিতে অসীম বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ কি কখনো এই নারকীয় অবস্থাকে অপরিবর্তনীয় বলে মানতে পারেন? কবি বলছেন— "এ প্রহসনের

মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।"

এই যুগের অবসান যে রক্তমাখা পঞ্চম অঙ্কে হবে, ঝড় যে আসছে যুগ-দিগন্তে, সে ঝড় যে কঠিন ভাবে যাচাই করবে আমাদের, সে কথা কাল-বৈশাখীর মতো আমাদের প্রবল ভাবে নাড়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"দামামা ঐ বাজে,
দিন বদলের পালা এলো
ঝোড়া যুগের মাঝে।
...শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে—
জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে কি যাবে কি রইবে।
পালিশ করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি,
দামামা তাই উঠেছে বাজি।"

সেই অনাগত ভবিষ্যৎ কি ব্রতসাধন করবার জন্যে আমাদের ডাকছে তার ইঙ্গিত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"কী হবে মন্তরে! কালের পথ হয়েছে দুর্গম। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত। করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।" (কালের যাত্রা)

কালের পথটি প্রতিটি মানব-যাত্রীর জন্যে সমান করতে হবে, তবেই মানুষে মানুষে বিদ্বেষ দূর হবে, এই আত্মঘাতী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে।

কালের পথটি সকল মানুষের জন্য সমান করবার কথা রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লেখা দুটি চিঠিতে বলেছেন। ১৮৯৩ সালের লেখা একটি চিঠিতে লিখছেন—"যারা বলে কোনো কালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবন-ধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যক জিনিসও বন্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব, অমূলক কল্পনা মাত্র, কখনোই সকল মানুষ খেতে পরতে পারবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথনেই, তারা ভারি কঠিন কথা বলে।"

১৮৯৬ সালে লেখা চিঠিতে বলছেন—"এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলিকে দেখলে আমার ভারি মায়া করে। এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরূপায়। সোসালিষ্টরা যে সমস্ত পৃথিবীর ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব জানি নে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগ্য।"

রবীন্দ্রনাথের প্রাণের দরদ যে কোন সমাজ ব্যবস্থার উপর তা কি এর থেকে সুস্পষ্ট

নয়? তাঁর যে নির্দেশ সেটি কি প্রতিক্রিয়াশীল নির্দেশ? এই দরদী মনোভাব প্রকাশ করেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি। বিপ্লব কেন আসে ও কি ব্রত সে সম্পন্ন করে সে কথাও তিনি বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"জগতে যতো কিছু বিপ্লব সে এমনি করেই হয়েছে। যখন প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে—যখনই বর্ণের, কুলের, ধনের ক্ষমতার ভাগ-বিভাগ ভেদ-বিভেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য করে তুলেছে তখন সমাজে ঝড় এসেছে। যিনি অদ্বৈতম্ তিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্রকে একের সীমা লঙঘন করতে দেন না।" (চিরনবীনতা)

সমস্ত বৈচিত্র্যকে ঐক্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতেই হবে মানব সমাজে। মানুষে মানুষে যে মূলগত ঐক্য আছে; সেই ঐক্য যেখানে আঘাত পায়, খন্ডিত হয় ধনের ও ক্ষমতার ভাগ-বিভাগ ও ভেদ-বিভেদের দ্বারা সেখানে বিপ্লব দেখা দেয়। বিপ্লব তাই পুঞ্জিত প্রতাপ, ধন ও ক্ষমতার শত্রু, ঐক্য সাধক শক্তি।

এই ঐক্য-সাধক শক্তির অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইতিহাসগতি-চেতন দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন ও স্বীকার করেছেন।

এই হোলো রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-বোধ ও সেই বোধের আলোকে প্রদীপ্ত সমাজ-চেতনা।

সমকালীন পশ্চিমবাংলার বাস্তববাদী বিপ্লবীরা কি জ্ঞানে ও অনুভূতিতে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চেতনার কাছাকাছিও পৌঁছতে পেরেছেন? —অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার কথা না হয় বাদই দিলুম। তাকিয়ে দেখুন তাঁরা পূর্ববাংলার বিপ্লবীদের দিকে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবাদী ধারণাকে মশাল করে পূর্ববাংলার জনসাধারণ এগিয়ে চলেছেন মুক্তির দিকে। আর পশ্চিম বাংলা? মানবতাবোধহীন লোকদের নেতৃত্বে ক্রমশই বিপ্লবের পথ থেকে সরে যাচ্ছে।

শরৎচন্দ্র ও সাহিত্যতত্ত্ব

সৃজনী-শক্তি আর তত্ত্ব-বিচারের বুদ্ধি এ দুটি আলাদা জাতের জিনিস। কোনো কোনো রসস্রষ্টার মনের শিখর থেকে এই দুই শক্তির ঝরনা-ধারা নেমে এসে মিলে যায় তাঁদের বহুমুখী সৃষ্টিতে। এই দুর্লভ সৌভাগ্য কিন্তু সব রসস্রষ্টাদের নয়। তত্ত্ব আর রস এ দুয়ের মধ্যে অ-বনিবনা আর কোঁদল লেগে আছে চিরটা কাল। তত্ত্ব যাঁদের মগজে টগবগ করে ফোটে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের বুকের ভিতরটা হয় রক্তশূন্য। তাঁদের অন্তরের রস শুকিয়ে যায় তত্ত্বের আগুনের হল্‌কায়। আবার যাঁরা রসের সাধক তাঁরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বে-সামাল হয়ে পড়েন রসের উচ্ছৃঙ্খলতায়। তাঁদের বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণক্ষমতা ও মূল্য যাচাইয়ের সামর্থ্য— অন্তরের সব শিখা নিবে যায় বুকের ভিতর বেনো রসের ছিটেতে।

ক্বচিৎ আসেন গোয়েটে, বালজাক্, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মতো দুর্জয় বীর্যশালী স্রষ্টারা, যাঁরা রসকে শাসন করেন জ্ঞানের দ্বারা আর তত্ত্বকে বুদ্ধির দাম্ভিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে তাকে জীবন্ত করেন প্রাণের রস-সিঞ্চনে। কিন্তু বেশীর ভাগ রস-স্রষ্টারা তো শক্তির বহরে এতো বড় নন। তাঁরা রসসৃষ্টি করেন শুধু ভাবের মূলধন নিয়ে। সে ভাবের পাত্র শীঘ্রি শূন্য হয়ে যায়। অধিকাংশ স্রষ্টারই রসের সঞ্চয় বড়ো কম, শীঘ্রিই তলানিতে পৌঁছে যায়। এদের রস-সৃষ্টির পক্ষে ভাবই যথেষ্ট, তত্ত্বের দৈন্য থাকলে কিছুই যায় আসে না। আর এটাও তো ঠিক যে, রস-সৃষ্টির কাজে প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বের প্রয়োজন নেই। এইজন্যেই সাহিত্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কিংবা অতি ভাসাভাসা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। সাহিত্যের আসরে আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্যতত্ত্বের অমৃতবালভাষিত আলোচনা শোনবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরা নিশ্চয়ই আমার মতে সায় দেবেন।

শরৎচন্দ্র ছিলেন জীবনদ্রষ্টা ও রস-স্রষ্টা, তিনি তত্ত্ববিদ ও তত্ত্ব-ব্যাখ্যানী ছিলেন না। তবুও সাহিত্যের মূল-তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো কিছু না বলে একেবারে পাশ কাটিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর উপন্যাসগুলির বিভিন্ন চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে সাহিত্য সম্বন্ধে যে দু-চার কথা তিনি মাঝে মাঝে বলেছেন সেগুলি ছাড়াও নানা সাহিত্য-সভায় ও বৈঠকে তাঁর চিঠিপত্রে সাহিত্য কি, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ সংস্কার নীতির সম্বন্ধ ; বাস্তবপন্থী সাহিত্য প্রভৃতি সাহিত্য-সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে নানা কথা বলেছেন।

কিন্তু কোথাও তিনি আলোচ্য বিষয়টির তাত্ত্বিক গভীরতায় প্রবেশ করেন নি। সব জায়গাতেই তিনি সমস্যাটির কথা উত্থাপন করে দু' চারটি কথা সেই সম্বন্ধে বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন। সৃষ্টির রঙে ও রসে ভরপূর তাঁর মন তত্ত্বের বহ্নিময় রুদ্রপথে বেশীক্ষণ থাকে নি। একটু এগিয়ে গিয়েই তাঁর শিল্পীর মন রসের উজান টানে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, তিষ্টতে পারে নি তত্ত্বের শুকনো ডাঙায়। তাই সাহিত্যের স্বরূপ ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় নানা সমস্যার একটা সুসম্বন্ধ বিশ্লেষণ শরৎচন্দ্রের কোনো লেখাতে নেই। নানা জায়গায় ছড়ানো নানা টুকরো কথা সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে থেকে তাঁর সাহিত্য-সম্বন্ধীয় মতামত গেঁথে তোলা ছাড়া গতি নেই।

সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শরৎচন্দ্র উপনিষদের ঋষিদের ব্রহ্মবর্ণনার পন্থা গ্রহণ করেছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে উপনিষদের ঋষিরা ব্রহ্ম এ বস্তু নন, ব্রহ্ম ও বস্তু নন, এই নেতির পথ অবলম্বন করেছেন। সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে শরৎচন্দ্রও সেই নেতির পথ ধরেছেন। সাহিত্য কি তা তিনি কোথাও ব্যাখ্যা করেন নি। সাহিত্য কি নয় কিম্বা কোন কোন বস্তুর সঙ্গে সাহিত্যের কোন মূলগত সম্বন্ধ নেই সেইগুলি তিনি আমাদের কাছে ধরে দিয়েছেন। আমাদের দেখতে হবে যে, এই না-এর একরাশ ফেনা সরিয়ে সরিয়ে রস-তরঙ্গের অর্থাৎ সাহিত্যের স্বরূপের মুখোমুখি হতে পারি কিনা।

যখন স্রষ্টার মন জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে প্রতিটি বস্তুর ও প্রতিটি ঘটনার প্রাণের অবিমিশ্রিত স্বাদ পায় তখন অন্তরে আনন্দ উথলে ওঠে আর সেই আনন্দ অর্থাৎ বস্তুর ও ঘটনার সত্তার অবিমিশ্রিত স্বাদজনিত তীব্র অনুভূতি, তার থেকে সৃষ্টি হয় সাহিত্য ও শিল্প। সাহিত্য তাই জীবনের গভীরতম অনুভূতির ফল। ওটা শুধু চোখের দেখা নয়, ওটা মনের দেখা, ওটা সুখের ফল নয়, ওটা আনন্দের ফল। ওটা আবার যেমন তেমন করে যা-তা দেখা নয়, ওটা বস্তুর সত্তাকে দেখা। বস্তুর প্রাণের রূপ, তার সত্তাকে না দেখলে আনন্দ জন্মাতো না মনে।

বস্তুর সত্তাকে, জীবনের একটি টুকরোকে দেখার সময় যে রসস্রষ্টা, শিল্পী কিম্বা সাহিত্যিক তার মনে কোনো উদ্দেশ্য বা মতলব আসে না। একটি বস্তুর সত্তাকে তার প্রাণ স্পর্শ করেছে, তারই আনন্দে ও বিস্ময়ে মন কূলহারা। নিজের মনের রঙ কিম্বা মস্তিষ্কের বুদ্ধির পালিশ দিয়ে একটি বস্তুকে ছুপিয়ে নিলে কিম্বা মেজে ঘষে নিলে সেই বস্তুর নিজস্ব রূপ ও রঙ দেখা যায় না। তখন যা দেখা যায় সেটি সেই বস্তুর রূপ নয়, সেটি একজন ব্যক্তির মনের রঙে রাঙানো একটি বস্তু। তাই শিল্পীর দেখা হচ্ছে নিজের মতবাদ অনুরাগ ভালো লাগা, ভালো না-লাগা বর্জিত দৃষ্টি। এই মতলবশূন্য দৃষ্টি হচ্ছে শিল্পীর দৃষ্টি, সাহিত্যিকের দৃষ্টি। এই রসের দেখা যখন রূপের বাঁধনে ধরা দেয় আপনাকে, ফুটিয়ে তোলে আপনাকে রেখা দিয়ে কিম্বা ভাষা দিয়ে, তখনই সৃষ্টি হয় শিল্প কিম্বা সাহিত্য। কিন্তু এই যে একটি বস্তুর সত্তার আনন্দ পরিচয় ধরে দেওয়া ভাষায়, সে তো সহজ ব্যাপার নয়। কি করে বর্ণনা করলে, ভাষার কতটুকু রঙ ব্যবহার করলে বস্তুর রূপকে তার সব রঙ ও রস নিয়ে সকলের কাছে ধরে দেওয়া যায় সেটা ঠিকমত জানা ও করা তো কম নিপুণতার কাজ নয়। সেটা করতে গেলে যেগুলি

বস্তুর আসল রূপকে আবৃত করে ফেলে রূপের প্রাণকেন্দ্র থেকে দৃষ্টিকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় রূপের বহির্সীমানার প্রান্তে, এমন অনেক চোখ-ভোলানো জিনিস বাদ দিয়ে দিতে হয়। এই বাহুল্য বর্জনের জন্যে সংযমের কঠিন সাধনা করতে হয় শিল্পীকে। সব কিছু সৃষ্টির জন্যেই সংযমের প্রয়োজন। এই সংযমের অর্থ হচ্ছে নিষ্প্রয়োজনের বহু কিছু বাদ দিয়ে আসলকে ধরা অর্থাৎ বস্তুর সত্তাকে ধরা। যদি এগুলো বাদ না দেওয়া যায় তা হলে চারিদিকে ছড়ানো বহু রঙীন জিনিসে মন আটকা পড়ে, বস্তুর কেন্দ্রের রূপটিকে উপলব্ধি করবার সময় মন পায় না। অবান্তরকে বাদ না দিলে বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করা যায় না। এইজন্যেই বাহুল্য বর্জন করে সহজ হওয়ার সাধনা শিল্পীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সাধনা ও সবচেয়ে কঠিন সাধনা। এই সাধনায় উৎরোতে পারলে তবেই শিল্পী বস্তুর ও ঘটনার প্রাণের রঙ ফুটিয়ে তুলতে পারেন তাঁর সৃষ্টিতে।

দিলীপ রায়কে লেখা একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখছেন— "তুমি লিখছো সাহিত্য ব্যাপারে আমার কাছে তুমি ঋণী, অন্তত এর সংযম সম্বন্ধে। ভেতরের উচ্ছ্বাস বা আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়।

.....জলধরদা তাঁর কি একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপমায়ের হয়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলেন যে, পাঠকরা শুধু চেয়েই রইল, কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুতঃ লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্যাদা নষ্ট করে দেয়।" এই বাহুল্যগুলিকে বর্জন করতে না পারলে রূপ সৃষ্টি তার সরলতা পায় না। এইটে করতে গেলে অথাৎ একটি বস্তুর রূপের বিশেষত্ব তার রূপের অনুপমত্ব ফুটিয়ে তুলতে গেলে যে সাজে প্রকৃতি তাকে আমাদের সামনে সাজিয়ে গুজিয়ে ধরে দিয়েছে, তার অনেকটা বাদ দিয়ে দিতে হয়। প্রকৃতির খেলাঘরে বস্তুটি যেরূপে প্রকাশমান তার হুবহু নকল করলে বস্তুটির বাইরের রেখা ও রঙ ধরা পড়ে বটে, কিন্তু তার প্রাণের রঙ ও রেখা আদপেই ধরা পড়ে না। প্রকৃতি-মায়াবিনী এমনি করে বস্তুর বাইরের মহলে আমাদের চোখকে আর আমাদের মনকে বন্দী করে রাখতে চায়। প্রকৃতির এই সর্বনাশী ফন্দির ফাঁদে ধরা না পড়ে যে শিল্পী বস্তুতঃ সত্তার অন্তর মহলে প্রবেশ করে সে দেখে যে প্রকৃতি কি ফাঁকিই না দিচ্ছিল তাকে, কতো অল্প দিয়ে ভোলাচ্ছিল। বস্তুর সত্তাকে স্পর্শ না করতে পারলে তার বিশেষ রূপটির নাগাল পায় না মন আর বস্তুর বিশেষ রূপটি একান্তভাবে, যে রূপটি তার নিজস্ব রূপ সেটিকে ধরে দেওয়া, সকলের কাছে প্রকাশ করে দেওয়াই হচ্ছে আর্ট— সেইটেই হচ্ছে শিল্পের ও সাহিত্যের ধর্ম। শিল্প ও সাহিত্য তাই হচ্ছে বিশেষের রাজ্য, নির্বিশেষের রাজ্য, এটা বহুর মধ্যে এককে বিলীন করে দেওয়ার বারোয়ারি ব্যাপার নয়, এটা প্রকৃতির সেই বহুর এলাকা থেকে প্রত্যেকটি বস্তুকে এক এক করে রূপলোকে প্রবেশ করানো। সেখানে মিছিলের প্রবেশ নিষেধ, সেখানে শুধু এক প্রবেশ করতে পারে। শিল্প ও সাহিত্য তাই প্রকৃতির হুবহু নকল নয়। প্রকৃতি যেভাবে যা ধরে দিয়েছে চোখ তাকে দেখে, তাকে উপেক্ষা করে না। শিল্পীর চোখে রূপদ্রোহী নয় আধ্যাত্মিক সাধনার সাধকদের চোখের মতো। শিল্পীর চোখ বলে— এই বস্তুটির সাধারণ রূপ প্রকৃতি তুমি দেখিয়েছ আমাকে, কিন্তু যেখানে আমি স্রষ্টা, শিল্পী, সেখানে

আমাকে বস্তুটির বিশেষ রূপ দেখতে হবে ও দেখাতে হবে। একটি ঘোড়া দৌড়াচ্ছে, ফটোগ্রাফার তার ছবি তুললেন আর শিল্পী তাকে আঁকলেন। তফাৎটা হলো কোথায়? তফাৎটা হলো এইখানেই যে, ফটোগ্রাফারের ফটোর ঘোড়ায় সেই ঘোড়াটির বিশেষত্ব, তার ব্যক্তিত্ব, তার অস্তিত্বের অনুপমত্ব ফুটে উঠল না। সে দশ হাজারের একজন হয়ে প্রকাশ পেলো। আর শিল্পীর ঘোড়া? সে তার স্বকীয়ত্ব, তার অনন্য সাধারণত্ব দশ হাজারের থেকে সে পৃথক এক এই ঘোষণা করলো। এইটে করতে গেলে, একটি বস্তুর এই বিশেষ প্রকাশকে রূপে সার্থক করে ফুটিয়ে তুলতে গেলে ফটোগ্রাফির মতো বস্তুটির বহির্রূপের প্রতিটি খুঁটিনাটি ধরে দেওয়া যে শুধু নিষ্প্রয়োজন তা নয়, এটি রূপ-সৃষ্টির ঘোর অন্তরায় ও প্রবল ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। সেখানে সকলের সঙ্গে তার ঐক্য সেগুলিকে যতটা সম্ভব বাদ দিয়ে যেখানে সকলের থেকে সে আলাদা সেইটে প্রকাশ করার দিকেই শিল্পীর নজর যায়। তাই শরৎচন্দ্র বলেছেন— Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে Nature নয়। ..... প্রকৃতি বা স্বভাব হুবহু নকল করা ফটোগ্রাফি হতে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষক ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য?....." (শরৎচন্দ্র — স্বদেশ ও সাহিত্য)। বলছেন— "সাহিত্য সৃষ্টি অনুকরণের মধ্যে নেই। ভালরও না, মন্দেরও না। হৃদয়ের সত্যকার অনুভূতি আনন্দ ও আলোড়নে অলঙ্কৃত বাক্যে বিকশিত হইয়া না উঠিলে সে সাহিত্য পচবাদ্য হয় না।।" (সাহিত্যের রীতি ও নীতি)। শিল্প ও সাহিত্য তাই প্রকৃতির অনুকরণের পথ ধরে চলে না। তারা চলে প্রকৃতির সব চাতুরী উপেক্ষা করে বিশেষের সন্ধানে।

তখন কথা উঠবে— শিল্প ও সাহিত্য কি তা হলে বাস্তবের রাজপথ ছেড়ে অ-বাস্তবের পায়ে চলা পথ দিয়ে আনাগোনা করবে? প্রকৃতিই তো বাস্তবের খনি, বাস্তবের স্বরূপপ্রকাশিনী। প্রকৃতিকে উপেক্ষা করলে তো বাস্তবকে উপেক্ষা করা হবে আর বাস্তবকে উপেক্ষা করলে সাহিত্য কি তবে শুধু কল্পনার উপাদান দিয়ে রচিত হবে? সাহিত্যে যাঁরা বাস্তবপন্থী তাঁরা এই প্রশ্ন তুলবেন। আসল কথা হচ্ছে, এ যুগে সহজকে জটিল করে তোলার অসাধ্য সাধনা আধুনিকেরা করে থাকেন। এইতেই নাকি ইন্‌টেলেকটুয়ালিজমের প্রমাণ দেয়। আমরা কিছুক্ষণের জন্যে যদি সেই ইন্‌টেলেক্‌টুয়ালিজমের বোঝা একপাশে নামিয়ে রেখে সমস্যাটিকে বুঝতে চেষ্টা করি, তা হলে দেখবো যে সমস্যাটি আদবেই ততো জটিল নয়।

প্রথম কথা হচ্ছে যে, কোনো কিছুকে বাদ দেবার কথাই ওঠে না সাহিত্যে কিম্বা শিল্পে। যা কিছু অন্তরে রস সঞ্চার করে আনন্দ জাগায়, তাই বাস্তব শিল্পীর কাছে সাহিত্যিকের কাছে। সাহিত্যের বাস্তব এ ছাড়া আর কিছুতেই হতে পারে না। তাই যেখানে বাস্তবপন্থীরা সাহিত্যের উপাদানকে সীমিত করেছেন, বলছেন— শুধু ডাস্টবিন, ধনীদের মাতলামির আড্ডা কিম্বা গরীবদের বস্তি, মধ্যবিত্তদের কফি-হাউসের জমায়েত কিম্বা বেকারদের ও বাস্তুহারাদের জীবন সাহিত্যের উপাদান হবে। আমরা বলি—হ্যাঁ এগুলোও হবে আরো হাজার জিনিস হবে, কেননা এরাই একমাত্র বাস্তব নয়, ডাষ্টবিনও যেমন বাস্তব, ফুল ও চাঁদ তেমনি বাস্তব, ধনীর প্রাসাদ ও গরীবের কুটীর যেমন বাস্তব,

রূপকথার রাজকন্যার দৈত্যপুরী, ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমীর বাসা তেমনি বাস্তব।

যা কিছু মানুষ চোখে দেখে, মন দিয়ে দেখে, জেগে দেখে, স্বপ্নে দেখে, বুদ্ধি দিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে, হৃদয় দিয়ে খুব পেলব করে দেখে, বুদ্ধির পৌরুষ আলোতে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে দেখে আর কল্পনার সীমাহারা ব্যাপ্তির মধ্যে দেখে— এ সবই রূপ সৃষ্টির উপাদান, সাহিত্যের উপাদান। এ সবই অত্যন্ত বাস্তব শিল্পীর কাছে, সাহিত্যের কাছে। এরা যদি অবাস্তব হতো শিল্পীর মনের কাছে, সাহিত্যিকের মনের কাছে তা হলে শিল্প ও সাহিত্য কখনো সম্ভব হতো না। মনের কাছে যা অবাস্তব ঠেকে তাকে নিয়ে মন কি কখনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে? আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, আর্টের রিয়ালিজম বা শিল্পের বাস্তবতার একমাত্র অর্থ হচ্ছে, যে বস্তুটিকে শিল্পী সকলের কাছে ধরে দিতে চান সেই বস্তুটির রূপ ফুটিয়ে তুলতে যা কিছু উপাদান প্রয়োজন সে সবই হচ্ছে বাস্তব। সে রূপ ফুটিয়ে তুলতে ভৌতিক উপাদান, কল্পনার উপাদান, বুদ্ধির উপাদান, হৃদয়ের আবেগের উপাদান এ সবেরই প্রয়োজন, আর রূপ সৃষ্টির পক্ষে এরা প্রয়োজনীয় বলেই এরা বাস্তব। শিল্পের বাস্তবতা শিল্প-সৃষ্টির নিয়ম মেনে চলে, সে আর কোন নিয়ম মেনে চলতে পারে না। বাস্তবপন্থীরা শিল্পে ও সাহিত্যে বাস্তবতার আমদানী করবার জন্যে যে কোলাহল সৃষ্টি করেছেন, সেই কোলাহলের ধূলো একটু থিতিয়ে গেলেই দেখা যায় যে, রাজনৈতিক কারণই এঁদের এই তথাকথিত বাস্তবতার দাবীর মূলে। আধুনিক বাস্তবপন্থীরা হচ্ছেন আসলে রাজনৈতিক মতবাদের নিয়মের দ্বারা জীবনের সবকিছু নিয়ন্ত্রণপন্থী অর্থাৎ টোটালিটেরিয়ানিজমের পাণ্ডার দল। এঁদের সাহিত্যিক বিচার সাহিত্যের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত ও প্ররোচিত।

এই টোটালিটেরিয়ান বাস্তব পন্থীদের কথা বাদ দিলেও এটি কিন্তু অস্বীকার করা যায় না অতীতের সাহিত্যে বাস্তবতার দাবী বার বার ধ্বনিত হয়েছে সব দেশে। এর কারণ কি? আমার মতে এর কারণ হচ্ছে এই যে, সাহিত্যের উপাদান এ জীবনের প্রতিটি বস্তু হতে পারে একথা নীতি হিসেবে স্বীকার করে নিলেও সাহিত্যিকেরা তাঁদের জীবনের শ্রেণীগত ও সংস্কারগত পরিধির সংকীর্ণতার দরুণ সাহিত্যের উপাদান হিসাবে যা কিছু বাছাই করতেন ও ব্যবহার করতেন সবকিছু তাঁদের এই শ্রেণী ও সংস্কারের আলবাঁধা জীবনের ভূমি থেকে। তার ফলে এই সংকীর্ণ ক্ষেত্রের বাহিরে অসংখ্য মানুষের যে বিরাট জীবন দিগন্তপ্রসারী ছিল তার কোন সত্য পরিচয় তাঁদের সাহিত্যে পাওয়া যেত না। এই বিরাট মানবসমাজ এই সাহিত্যিকদের কাছে বাস্তব ছিল না বলেই তাঁদের সৃষ্টির আয়নার তার রূপ প্রতিবিম্বিত হয় নি। এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এর কারণ যে শুধু অজ্ঞতা তা নয়, অবজ্ঞাও এর অন্যতম কারণ। এঁদের শ্রেণী এলাকার বাইরের মানুষ বলে বোধ হয় নি। আর সেই সামাজিক অবস্থায় বেশীর ভাগ সাহিত্যিক তো এই শ্রেণী থেকেই আসতেন। এঁরা শ্রেণী সচেতনতার সঙ্গে কিম্বা সংস্কারের (যেটি শ্রেণীচেতনারই আর এক রূপ) বশবর্তী হয়ে সাহিত্যের উপাদান তাঁদের শ্রেণীর চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই বাছাই করতেন। তারপরে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভাগের ফলে সমাজের উপরতলায় যারা বাসা বেঁধে জমকে বসেছিলো তারা যখন রাজনৈতিক ঝড়ের ঝাপটায়

উপরতলা থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়লো নীচে, আর মাঝের তলার লোকেরা সমাজের ও রাষ্ট্রের উপরতলা দখল করে বসলো, তখন তারা দেখলো যে তাদের কথা, তাদের জীবনের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনার কথা চলতি সাহিত্যে একেবারে নেই। তখন তাদের জীবনকেও সাহিত্যের উপাদান করবার দাবী জানাতে শুরু করলো আর যে সাহিত্য এতোদিন চলে আসছিল তাকে তারা বাস্তবতা-বিবর্জিত সাহিত্য বলে ঘোষণা করল। এটা স্বাভাবিক, আর ঐতিহাসিক যথার্থতা মানতে কোন বাধা নেই। সাহিত্যের বিচারে কিন্তু এর সত্যিকার কোন মূল্য নেই। সকল সৃষ্টির জন্যে যেমন দরকারী, সাহিত্য-সৃষ্টির জন্যেও উপাদান তেমনি প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু সাহিত্যের মূল্যবিচারে উপাদানের বিচারের কোন স্থান নেই। কি উপাদান দিয়ে তৈরী হয়েছে সেটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে আদপেই বড় কথা নয়, আসল দেখবার কথাটা হচ্ছে কি তৈরী হলো, সৃষ্ট বস্তুটি কি রূপ নিলো, সে রূপ সার্থক হলো কিনা। মূর্তিটি কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরী কিম্বা হীরের টুকরো দিয়ে তৈরী এর দাম বেনের কাছে আছে, রসিকের কাছে আদবেই নেই। তাই সাহিত্যে বাস্তবতার দাবীর সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণগুলির হদিশ পেলেও সাহিত্যের মূল্যবিচারের ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশ নিষেধ। সেখানে সাহিত্যের নীতি, জীবন-উপলব্ধির নীতি, রস ও রূপ সৃষ্টির নীতি অতন্দ্র প্রহরীরূপে পাহারা দিচ্ছে মানুষের মনে। যারা রূপলোকের বাসিন্দে নয় তাদের এই প্রহরী সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করতে দেয় না। তবে আশঙ্কা হচ্ছে যে এই মিছিল ও শ্লোগানের যুগে সেই প্রহরীও যেন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছে ; নয় তাকে ঠেলে-ঠুলে, নয় তার দিশেহারা অবস্থার সুযোগ নিয়ে তার অজানিতে বেড়া টপ্‌কে এই রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে হরেক রকমের পাটোয়ারীর দল—রাজনৈতিক, সমাজসংস্কারপন্থী ঢুকে পড়েছে। তাই আজকাল রসের সঙ্গে গাদের মিশল এত বেশী।

সাহিত্যে বাস্তবতার দাবী সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র লিখেছেন রবীন্দ্রনাথকে—"আজকাল প্রখর বাস্তব সাহিত্যের চলন শুরু হয়েছে। তাতে দলে দলে লোক আসে—সবাই ছোট, সবাই সত্য, সবাই হীন, কারও কোন বিশেষত্ব নেই, অর্থাৎ যেমন সংসারে দেখা যায়। অথচ সমস্ত বইখানা পড়ে মনে হয় এতে লাভ কি? কেউ হয়তো বলবে লাভ নেই এম্‌নি। মাঝে মাঝে হয়তো অত্যন্ত সাধারণ মামুলি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও নিপুণ বর্ণনা থাকে— তার ভাষাও যেমন আড়ম্বরও তেমনি, কিন্তু তবু মন খুশী হয় না, অথচ এরা বলে এই তো সাহিত্য।" (১৩৩৪ সালের ২৬শে ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি থেকে)

এখানে বাস্তব সাহিত্যের দাবী করনেওয়ালাদের দাবীর আসল মর্মটি শরৎচন্দ্র ঠিক ধরতে পারেন নি। আধুনিক বাস্তবপন্থী সাহিত্যিকেরা যেমন বিশেষ শ্রেণীর লোকদের জীবনকে সাহিত্যের উপাদান করবার জন্যে জবরদস্তি করে তেমনি তারা দাবী করে যে, যা যা ঘটেছে তার ফর্দ ধরে দেওয়াই সাহিত্যের কাজ। বাস্তব ঘটনার রেশমাত্র বাদ দেওয়া চলবে না, তার প্রতিটি কণা প্রতিটি রেশ সাহিত্যে প্রকাশ করতে হবে। এখানে বাস্তবপন্থীরা হুবহু নকলের নীতি, ঘটনার ফটোগ্রাফির রীতিকে সাহিত্যের নীতি

বলে চালাতে চেষ্টা করেছেন। একটি ঘটনাকে তার চরম উজ্জ্বলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে গেলে তার অস্তিত্বের বহু অপ্রয়োজনীয় অংশকে যে বাদ দিতে হয়, তবেই যে ঘটনাটি উদ্ভাসিতরূপে প্রকাশিত হয়, এই জ্ঞানটি বাস্তবপন্থীদের নেই। সৃষ্টির নিয়ম সম্বন্ধে বাস্তবপন্থীদের এই অজ্ঞানতা শরৎচন্দ্র ধরতে পেরেছিলেন।

১৩৩৪ সালের ২৬শে ফাল্গুন তারিখের সেই চিঠিতেই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—"জগতে দৈবাৎ যা সত্য ঘটছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না।"

১৩৩৭ সালে লাহোর-প্রবাসী বাঙালীদের অভিভাষণের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছেন—"সত্য আর সাহিত্য আলাদা। সত্য সাহিত্যের বনেদ, কিন্তু সেইটাই সব নয়। সাহিত্য একটি শিল্প— যেমন করে সাজালে মানুষের মনে সেটা একটা দাগ ফেলতে পারে, যা অনেক দিন থাকে। সত্যের দিক দিয়ে গেলে আর যাই হউক ভাল সাহিত্য হয় না।"

আর এক জায়গায় তিনি বলছেন— "সত্যি জিনিসটাই সাহিত্য নয়। সংসারে অনেক ব্যাপার আছে যা সত্যি কিন্তু সাহিত্য নয়। আমার বলবার কথা এই যে, সত্যিটা যেন বনেদের মত মাটির নীচে থাকে এবং তা হলে তার উপরে যে সৌধটা গড়ে তুলবো কল্পনা দিয়ে সেটা সহজে ডুবে যাবে না।" (শরৎচন্দ্র—সাহিত্যিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য, ১৩৪১)। গভীর অনুভূতির সঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন— "বাস্তব অবস্থাকে আমি উপেক্ষা করছি নে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবেব সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে আমি তো জানি।" (শরৎচন্দ্র— সাহিত্য ও নীতি)।

কিন্তু বাস্তব-পন্থীদের গলদ কোথায় সেটি ধরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিছক কল্পনাবাদীদেরও গলদ কোথায় তাও দেখিয়ে দিতে কসুর করেন নি শরৎচন্দ্র। যেটির সঙ্গে সমাজের জীবনের আদৌ কোন সম্বন্ধ নেই, যেটি শুধু কল্পনাবাদীর বেবাক কল্পনার বস্তু কিংবা অন্য দেশের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা পড়ে যেটি তার বর্ণনা পড়ে যেটি তার বাসনা কিম্বা কামনার বস্তু হয়েছে, এমন বস্তুকে নানা রঙ ফলিয়ে এঁকে যাওয়াও তেমনি নিরর্থক সৃষ্টি। বাস্তববাদীরা কল্পনাকে বাদ দিয়ে, শুধু বাস্তব ঘটনার বিবরণ দিয়ে বস সৃষ্টিকে বিফল করে দেয়, আর নিছক কল্পনাবাদীরা জীবনের সঙ্গে সমাজের জীবনের সঙ্গে সব সম্বন্ধহারা উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার মত্ততার ঘোরে যা সৃষ্টি করে তাও এমনি নিষ্ফল সৃষ্টি হয়ে পড়ে।

জীবনের সঙ্গে যোগ রাখতেই হবে তবে সাহিত্য সৃষ্টি হবে। জীবনের সেই বিচিত্র বাস্তবকে বিচিত্র বাস্তবকে কিন্তু কল্পনার আগুনে পুড়িয়ে তার খাদ বাদ দিয়ে নিতে হবে, নইলে ফিরিস্তি, ইস্তাহার কিংবা প্রচার পুস্তিকা তৈরী হবে— সাহিত্য নয়।

শরৎচন্দ্র বলেছেন— "যা কিছু ঘটে তাঁর নিখুঁত ছবিকেও যেমন সাহিত্য বস্তু বলি নে, তেমনি যা ঘটে না, অথচ সমাজ বা প্রচলিত নীতির দিক দিয়ে ঘটলে ভাল হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের ঢের বেশী বিড়ম্বনা ঘটে।"

(শরৎচন্দ্র—সাহিত্য ও নীতি)। বাস্তববাদীরা আর নিছক কল্পনাবাদীরা— এই দু-জাতের লোকই সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঘোর অবাস্তববাদী। বাস্তববাদীরাও একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘোর অবাস্তববাদী। বাস্তববাদীরাও একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের ছাঁচে মানুষকে ঢালাই করে একটা নক্‌সা বানায়। এই নক্‌সার মানুষ শুধু তাদের কল্পনায় আছে, কিম্বা অন্য দেশের সাহিত্য পড়ে তারা এর খবর পায়, কিন্তু তাদের জীবনের অভিজ্ঞতায় নেই। তাই শরৎচন্দ্র এদের লেখা সম্বন্ধে বলেছেন — "এ সমস্ত লেখার অধিকাংশ বাহির থেকে আমদানি করা। নিজেদের অভিজ্ঞতা নেই— তাই পরের ধার করা জিনিস চালাতে গিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে তুলছে। ..... বাড়ীতে বসে আর্মচেয়ারে বসে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না : অনুকরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সত্যিকার মানুষ না দেখলে সাহিত্য হয় না।" (১৩৩৭ সালে চন্দননগরের আলাপ সভায়)।

এই তো গেল তথাকথিত বাস্তববাদীদের অত্যাচার, রাজনৈতিক মতলববাজী— সাহিত্যের পক্ষীরাজকে রাজনৈতিক লাগাম দিয়ে চালাবার চেষ্টা, অর্থাৎ কিনা টোটালিটেরিয়ান দৃষ্টিভঙ্গী আমদানী করবার অপচেষ্টা সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

আর এক ধরনের জুলুমের সম্মুখীন হতে হয় সাহিত্যিকদের নীতিবাগীশ সমাজপতিদের দৌলতে। এই নীতিবাগীশেরা তাঁদের সামাজিক সংস্কারের বাঁধনে সাহিত্যিক, শিল্পকে বাঁধতে চান। সমাজের প্রচলিত সংস্কারে যেটি নৈতিক বলে ধার্য এদের মতে সাহিত্যের কাজ হচ্ছে তারই প্রচার করা। যা সমাজের নৈতিক ধারণার বাইরের জিনিস তাকে সাহিত্যেও বর্জন করে চলবে। সে সব বস্তু জীবনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকলেও তাঁদের এড়িয়ে চলাই সাহিত্যের কর্তব্য। এই হলো এইসব মোড়লদের মত। সাহিত্য ও শিল্পের ধারাকে এমনি করে সমাজের অনুশাসনের খালে বইয়ে দেবার চেষ্টা অনেক কাল থেকেই সমাজের মোড়লরা করে আসছেন। ব্রাহ্মণ যে সমাজে সমাজপতি সেখানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের বিরুদ্ধে যারা বলেছে কিম্বা সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, তাদের তারা দণ্ড দিয়েছে, তাদের সাহিত্য ধ্বংস করেছে, ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ বৌদ্ধ বিহার হাজারে হাজারে ধ্বংস করেছে, অগণিত বৌদ্ধ পুঁথি নষ্ট করেছে, জ্বালিয়ে দিয়েছে। রোমান ক্যাথলিক অনুশাসনের অযৌক্তিকতা যাঁরা দেখাতে গেছেন রোমান ক্যাথলিকশাসিত ইয়োরোপীয় সমাজ তাদের ও তাঁদের রচিত সাহিত্যকে আগুনে দগ্ধ করেছে। সমাজের প্রচলিত নৈতিক ধারণাগুলি অভ্রান্ত ও শাশ্বত, আর বাদবাকী সব ধারণা অ-নৈতিক এই একান্ত অজ্ঞ ধারণার দ্বারা চালিত সমাজপতিরা সর্বদেশে ও সর্বকালে মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে ও সৃষ্টির স্বাধীনতাকে খর্ব করার চেষ্টা করেছে। সমকালীন রাশিয়ায় স্টালিন ঠিক এইভাবেই সাহিত্য ও কলাকে তার সামাজিক নীতির গোলাম বানিয়েছিল আর তার মতাবলম্বীরা আজও সেই পথ ধরেই চলছে। এই প্রচেষ্টার আড়ালে কিন্তু স্বার্থের উস্‌কানি আত্মগোপন করে থাকে। বাইরে থাকে নীতিবাগীশদের নৈতিক ঠাট, পেছনে থাকে এই নীতির দোহাই দিয়ে তাদের নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখবার চেষ্টা। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থকে ঢাকবার পক্ষে নৈতিক ঠাটের আবরণের চেয়ে কার্যকরী আবরণ আর কিছুই নেই।

সাহিত্য কিন্তু সমাজের প্রচলিত নীতির গণ্ডির মধ্যে আপনাকে কিছুতেই বন্দী রাখতে

পারে না। সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক নীতির কোন সম্বন্ধই নেই। সাহিত্যের কাজ হচ্ছে ব্যক্তির জীবনে ও সমাজের জীবনে যা কিছু ঘটছে তাকে রসের বস্তুতে পরিণত করা, জীবনের সীমাহীন বিচিত্র অভিব্যক্তিকে সকলের সামনে ধরে দেওয়া। সাহিত্যিক নীতির বিচারক নয়, জীবনের অসংখ্য অভিব্যক্তির কোন্‌টি সমাজপতিদের নীতির সার্টিফিকেট পেয়েছে, কোন্‌টি তাদের ছাড়পত্র পায় নি তা দেখবার একেবারেই প্রয়োজন নেই সাহিত্যিকের। সে কাজের জন্যে আছে সমাজপতির বরকন্দাজেরা। অধিকাংশ লোকের ক্ষমতাই নেই জীবনকে সত্য করে দেখার মতো করে দেখার। জীবনকে দেখার মত করে দেখার জন্যে রসের সাধনা করতে হয়। সে কঠিন সাধনা শিল্পীর সাধনা, সাহিত্যিকের সাধনা। কত অসংখ্য ঘটনা আমাদের চোখের সামনে প্রত্যহ ঘটছে, কত অফুরন্ত বস্তু তাদের অস্তিত্বের রঙীন পাল তুলে ভুবনের স্রোতে জীবনের ঘাট ছুঁয়ে প্রতিনিয়ত ভেসে চলেছে। আমরা কিছুই দেখতে পাই না, মন দিয়ে ছুঁতে পারি না, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারি না। রসস্রষ্টা যাঁরা তাঁরা সব দেখেন। যত বেশী বীর্যবান রসস্রষ্টা যিনি, তিনি তত বেশী দেখেন, অনুভব করেন ও উপলব্ধি করেন। আর তত বেশী নিবিড় করে, গভীর করে জীবনের বিস্ময়কর বিচিত্র প্রকাশকে তিনি আমাদের সকলের সামনে উদঘাটিত করেন। রস-স্রষ্টা যদি সামাজিক নীতির অনুশাসনকে তাঁর সাহিত্যের ব্যাপ্তির সীমা বলে স্বীকার করেন তা হলে অনন্তপ্রসারী জীবনের বৃহত্তম-অংশটা তাঁর সাহিত্যের এলাকার বাইরে থাকতে বাধ্য। শুধু যেটুকু সামাজিক নীতির গণ্ডিভুক্ত, জীবনের সেই অতি ক্ষুদ্র অংশটুকু তাঁর সাহিত্যের উপাদান হতে পারে। জীবনের অসীমত্বকে উপেক্ষা করে তার বিশেষ একটা সামাজিক নীতিগত রূপকে স্বীকার করতে সাহিত্যিক কখনও পারে না। সাহিত্য হচ্ছে সমগ্র জীবনের ছবি, জীবনে যেখানে আলো জ্বলছে তারও ছবি, যেখানে অন্ধকার তারও ছবি, যেখানে হাসির ও আনন্দের ঝরনা বইছে তারও ছবি, যেখানে চোখের জলের আগুন জ্বলছে, দুঃখের হোমশিখা প্রজ্বলিত তারও ছবি, যেখানে মানুষ স্বর্গ জয় করছে তারও ছবি, আবার যেখানে মানুষ নরকের আলো-জ্বলা অন্ধকারে ঢুকছে তারও ছবি। এইসব ছবিই শিল্পের ও সাহিত্যের অঙ্গীভূত, কেননা এই সবই জীবনের অঙ্গ। শিল্পীর ও সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে এই সমগ্র জীবনকে রঙে, রেখায় ও বাক্যে এঁকে ধরা। এই অধিকারকে রসস্রষ্টা কখনো বলি দিতে পারে না সমাজের নৈতিক অনুশাসনের কাছে। মানুষকে কোন এক বিশেষ নীতির রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, কোন এক দুর্নীতি থেকে তাকে রক্ষা করা এ কাজ সমাজসংস্কারকের। তারই কাজ হচ্ছে মদ্য-নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করে মানুষ যাতে মদ না খায় তার জন্যে মানুষকে উপদেশ দেওয়া ও যত উপায়ে সম্ভব তাকে মদ খেয়ে নিবৃত্ত করা। সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে সেই মদ্যপায়ী লোকটির জীবনে সকলের সামনে এঁকে ধরা। সেই লোকটির চরিত্রের সংশোধন করবার জন্যে কিম্বা তার চরিত্রের উন্নতি সাধন করবার জন্যে তার জীবনের চিত্র এঁকে ধরা নয়। এঁকে ধরা শুধু এই জন্যে যে এটি জীবনের অংশ, এটি বাস্তব বলে।

সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক সুনীতি ও দুর্নীতির সম্বন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র

বলছেন— "শিল্পের ঔচিত্য ও সমাজের ঔচিত্য এক নয়। একে এক বলে মনে করলেই গোলমাল বাধে, ধিক্কার ওঠে। এ ধিক্কার আর্টের নয়, এ ধিক্কার সমাজের, এ ধিক্কার নীতির অনুশাসন। এদের মানদণ্ড এক নয়, বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে এক করার প্রয়াসের মধ্যেই যত গলদ, যত বিরোধের উৎপত্তি।"

বলছেন—"সমাজ সংস্কারকের কোন দুরভিসন্ধি আমার নেই, তাই বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখবেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও আছে, কিন্তু সমাধান নেই। ও কাজ অপরের। আমি শুধু গল্পলেখক, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

বলছেন শরৎচন্দ্র— "সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর (অর্থাৎ সাহিত্যের— লেখক) মধ্যে আছে কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই- - এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে। এদের গণ্ডগোল করত দিলে যে গোলযোগ বাঁধে কাল তাকে ক্ষমা করে না। নীতি পুস্তক হবে কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে, কিন্তু কাব্য সৃষ্টি হবে না।" (সাহিত্য ও নীতি)।

আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন— "লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়।" (সাহিত্য আর্ট ও দুর্নীতি)

এরপরেও অতি দামী একটি কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, "উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখ রাঙানিতে তার মরা চলে না।" (সাহিত্য ও নীতি)।

এই কথাগুলিই হলো যিনি যথার্থ রস-স্রষ্টা তাঁর কথা, শিল্পীর কথা, সাহিত্যিকের কথা। শিল্পের নিজের আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী সে চলে। রাজনীতিজ্ঞদের রাজনীতির আইন, সমাজ সংস্কারক দের পতিতোদ্ধারের আইন, নীতিবাগীশদের নৈতিক বাঁধুনির আইন— কিছুই মানে না শিল্প। শিল্প মানে শুধু রসের আইন, রস-সৃষ্টির আইন, জীবনকে রসে উপলব্ধি করে রূপে ফুটিয়ে তোলার আইন।

টোটালিটেরিয়ান বাস্তববাদী ও প্রগতিবাদীর দল, আর টোটালিটেরিয়ান নীতিবাগীশ সমাজপতির দল শরৎচন্দ্রের এই দীপ্তিময় কথাগুলি পারেন তো উপলব্ধি করুন।

রামমোহন—ব্রাহ্মসমাজ না ব্রহ্মসভা

রামমোহন সম্বন্ধে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন—"রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় অনেক গল্প আমার পিতার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিই। এই সকল গল্পের সহিত একটি গল্প এইরূপ ছিল যে রামমোহন রায় নিজের প্রচারিত ধর্মকে 'ইউনিভার্সাল রিলিজন' অর্থাৎ বিশ্বজনীন ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, আর যখনই এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন তখনই তাঁহার অশ্রুপাত হইত। আমার পিতাঠাকুরও যখন ঐরূপ বলিতেন, তখন গদগদ হইতেন।"

নন্দকিশোর বসুর মৃত্যু হয় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে। রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিত-এ তাঁর পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে লিখেছেন—তখনকার ব্রাহ্মধর্মে অর্থাৎ বৈদান্তিক ধর্মে প্রাণত্যাগ করিতেছেন।" রাজনারায়ণ বসু লিখছেন তাঁর পিতার সম্বন্ধে যে তিনি "শঙ্কর ভাষ্য আনাইয়া পড়িতে বলেন।" এর থেকে প্রমাণ হয় যে রামমোহনের বিদেশ-গমনের পরে ব্রহ্মসভায় বৈদান্তিক ধারার যে প্রাধান্য দেখা গিয়েছিলো নন্দকিশোর বসু তারই অনুসরণকারী ছিলেন।

রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহনের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন ও কিছুদিন রামমোহনের সেক্রেটারী হিসাবেও কাজ করেছিলেন। তাই তাঁর বয়ান নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারি। রাজনারায়ণ বসুর উল্লিখিত কথাগুলি রামমোহনের চিন্তধারার যথার্থ পরিচায়ক হিসেবে যেমন মূল্যবান তেমনি মূল্যবান ব্রাহ্মসমাজের গোড়পত্তনের ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ে। সৃষ্টির বহুমুখী ধারা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলো রামমোহনের সত্তার শিখর-ভূমি থেকে। ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি—মানুষের জীবনের এমন কোনো দিক ছিলো না যা তাঁর সৃজনীশক্তির প্রাণদায়িনী ধারায় অভিসিক্ত করেন নি রামমোহন। কিন্তু শুধু সৃষ্টির বহুমুখী ধারাগুলির তথ্য সংগ্রহ করলেই তো আর রামমোহনকে জানা শেষ হয়ে যায় না। এগুলি শুধু তাঁর অসাধারণ মনীষার সাক্ষীস্বরূপ। তাই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের এই তথ্যগুলি একটি বিশেষ জীবন-তত্ত্বের রঙে অনুরঞ্জিত কি না সেইটেই আমাদের জানা দরকার। সেই জীবন-তত্ত্বের নির্দ্ধারণেই ব্যক্তি-সত্তার যথার্থ পরিচয় লাভ ঘটে। তাই রামমোহনকে বুঝতে হলে রামমোহনের সত্তার উপাদান, গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা একান্ত দরকার। শুধু কর্মের ধারাগুলি জান্‌লে আসল জানার অনেকটা বাকি থেকে যায়।

রামমোহন ছিলেন বিশ্বাত্মবাদী। কোনো বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের চৌহদ্দির মধ্যে তিনি আপনাকে নির্বাসিত করেন নি। পৃথিবীর প্রধান ধর্ম-সাধনাগুলির সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিলো অসাধারণ। তিনিই এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ধর্মগুলির তুলনামূলক অনুসন্ধিৎসার সূত্রপাত করেন। বিভিন্ন ধর্মের মূল সত্যগুলি নিরূপণ করে সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের সমন্বয়সাধনের প্রথম প্রচেষ্টা, সে তাঁরই। কিন্তু এই সমন্বয় সাধন ধর্মগুলির ছেঁড়া টুক্‌রো জুড়ে ধর্মের পাঁচমিশলি কাঁথা সেলাই করার নামান্তর নয়। একে সমন্বয়সাধন বলে না, এ হচ্ছে জোড়া-তালি দেওয়া সমুচ্চয়-সাধন eclecticism। প্রত্যেক ধর্মের মূল সত্যগুলির সঙ্গে অন্যধর্মের মূল সত্যের ঐক্য স্থাপনেতেই সমন্বয়-সাধনের পরিচয়। এইটেই রামমোহন করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ভাষায় ঃ—

"It is only necessary to add that not only did he include Hindu, Moslem and Christian theists in one theistic fraternity as brothers in faith; he extended this fellowship and co-operation to those, who by whatever name, would acknowledge some Principle of the Universe, the need of meditation on that Principle as good, and the love and service of Man as the guiding principle of the conduct of life. Buddhists and Jains and believers in a Law of Natures, he would therefore, acknowledge as not against the theistic fraternity, but with it............ It is not, therefore, necessary to assume that the great historic religions, these national embodiments of universalism, will cease or be merged one in another, apart from the question of the historic fusions of the nations themselves. From the Raja's point of view, therefore, the evolution of internationality, super-nationality, or even the Universal State, does not necessarily mean that differences or variations of nationality will cease to exist, and it is not at all necessary that any of the historic religions will merge in another, But each of the great national or historic religions will grow fuller by mutual contact and assimilation, as well as by ideal convergence ; they will grow, however, along their own lines of historic continuity as specific embodiments of a common Universal Regulation, even as the different ethnic types or nationalities will go on evolving as specific embodiments of Universal Humanity in specific natural and historical environments". (Rammohun Roy : The Universal Man).

'বিশ্বাত্মবাদী শব্দটিকে অনেকেই নানা ধর্মের কিম্বা ভাবের খিচুড়িপন্থীর প্রতিশব্দ বলে ধরে নিয়ে তাঁদের এই ভ্রান্তধারণার ফণা তুলে গর্জাতে থাকেন। পৌরাণিক প্রতীক পূজার জায়গায় ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছিলেন রামমোহন। তিনি বুঝেছিলেন যে নিরাকার ব্রহ্ম-উপাসনার ভিত্তিতেই একেশ্বরবাদী ইসলামপন্থী ও খৃষ্টপন্থীদের সঙ্গে একেশ্বরবাদী ব্রহ্মবাদী হিন্দুদের একটি মিলন-ক্ষেত্র রচিত হতে পারে। প্রতীক-পূজার

ভিত্তিতে সেটি কখনো সম্ভব হতে পারে না। নিরাকার ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যে পৃথিবীর মূল ধর্মগুলির একমাত্র উপাস্য বস্তু—সেটি প্রধান বিশ্ব-ধর্মগুলি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করে রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন ও বারবার এই সত্য-উপলব্ধি সকলের কাছে ধরে দেন।

রামমোহনের ধর্মীয় আদর্শ সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলছেন—"একমাত্র সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া ঈশ্বরকে লোকের নিকট প্রতিপন্ন করিবার তাঁহার ভরসা ছিল না। যদিও তিনি জানিতেন, ধর্মপ্রচার ও রক্ষার জন্য এক এক আপ্ত পুস্তকের অবলম্বন চাই কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসের ভূমি সহজ-জ্ঞান ছিল তাহা না হইলে সকল ধর্মের মধ্য হইতে তিনি সার সত্য কেমন করিয়া সংকলন করিলেন? যদিও তিনি ভরসা করিয়া আত্মপ্রত্যয়ের উপর লোকদিগকে নির্ভর করিতে বলিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি নিজে আত্মপ্রত্যয় দ্বারা চালিত হইতেন; তিনি বেদ, কোরাণ, বাইবেল, পুরাণ, তন্ত্র, মন্ত্র, সকল হইতেই সহজ জ্ঞানের আলোতে, আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া, এক ঈশ্বরের উপাসনা বাহির করিলেন।" (ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসর)

বিশ্বাত্মবাদ ও সমন্বয়-সাধন একেই বলে।

রামমোহনের এই সমন্বয়-সাধন যেমন একদিকে এর-থেকে নেওয়া-ওর-থেকে-নেওয়া তালিদেওয়া কাঁথা নয়, তেম্‌নি অন্যদিকে একটি ধর্মের সমস্ত আচার, সংস্কার ও রীতি নির্বিচারে গ্রহণ করে নেওয়াও নয়। এই নির্বিচার-গ্রহণের পথ ছিলো রামকৃষ্ণ পরমহংসের পথ। এই বিভিন্ন পথ দুটির নাম আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ভাষায় Syntheticism and Syncretism রামমোহনের পথ হচ্ছে Syntheticism-এর পথ, আর রামকৃষ্ণ পরমহংসের পথ হচ্ছে Syncretism-এর পথ।

রামমোহন প্রতিটি ধর্মের মূল সত্যটিকে ছাঁট-কাট করে নেন নি, কিন্তু তাই বলে যে সব আচার ও সংস্কার সেই মূল সত্যটিকে আচ্ছাদিত করেছে সেগুলিকে তিনি স্বীকার করেন নি কিম্বা গ্রহণ করেন নি। যুগযুগসঞ্চিত আচার ও সংস্কারগুলিকে তিনি বর্জন করেছেন। তিনি সাময়িককে বাদ দিয়ে প্রতিটি ধর্মের শাশ্বতকে নিয়েছেন। শাশ্বতের ক্ষেত্রে মিলনই হচ্ছে সমন্বয়-সাধন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর একমাত্র সমন্বয়-সাধক হচ্ছেন রামমোহন। রামকৃষ্ণ পরমহংস পরম উদার, ধর্মব্যাকুল মহান ব্যক্তি কিন্তু তাঁর সেই ভগবৎ-পিপাসাকে কিম্বা যে উপায়ে তিনি খৃষ্টধর্মসাধনা ও ইস্‌লামধর্মসাধনা করেছিলেন তাকে সমন্বয়সাধনা বল্‌লে ভুল বলা হবে।

মূলগত সত্যের ক্ষেত্রে সমস্ত ধর্মের মধ্যে ঐক্য আছে আর সেই ঐক্যকে সকলের সামনে উদঘাটিত করে ধরলে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে সেই বিরোধ দূর হবে এই নিঃসংশয় প্রত্যয় রামমোহনের ছিলো আর এই ঐক্যসাধনাই তিনি তাঁর জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। কোনো এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় গঠন করা ও সেই সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রয়োজন-সাধনের জন্যে সমাজ স্থাপন করার বাসনা রামমোহনের ধর্ম-সাধনার ধারণায় কোনো দিনও স্থান পায় নি।

১৭৭৬ শকের এগারোই মাঘ ব্রহ্মসমাজের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক অধিবেশনে অক্ষয়কুমার দত্ত যে ভাষণ দেন তাতে বলেন :—"শুনা গিয়াছে, তিনি জীবদ্দশায় বন্ধুবিশেষকে কহিয়াছিলেন, আমার মৃত্যুর পরে হিন্দু, মোসলমান ও খৃষ্টীয় তিন সম্প্রদায়েই আমাকে

স্ব স্ব শাস্ত্রাবলম্বী বলিয়া প্রত্যয় যাইবে, কিন্তু আমি কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি।"
(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক)

মহর্ষির জীবনচরিতকার অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন,—"শঙ্কর শাস্ত্রীর সহিত বিচারে রামমোহন স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, তিনি নূতন ধর্মমতের স্থাপনকর্তা, একথা কোনো মতেই তিনি স্বীকার করিতে চান না। তিনি প্রকৃত শাস্ত্রার্থই বাহির করিয়া দেশের লোকের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র।"

ঐ ভাষণেই অক্ষয়কুমার দত্ত রামমোহন সম্বন্ধে বলেন ঃ—"তিনি যে সর্বশাস্ত্রের সারগ্রহী, নিরবচ্ছিন্ন যুক্তিপথাবলম্বী একেশ্বরবাদী ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডীড্ নামক লেখ্য পত্র তাহার সাক্ষী দিয়াছে........তিনি ঐ লেখ্যপত্রে এইরূপ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সকল দেশীয় সকল জাতীয় সকল প্রকার লোকেই এই সমাজে অধিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বস্রষ্টা, নিত্য নির্বিকার অপরিজ্ঞেয়স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন।"

ব্রাহ্মসমাজের যে সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে অক্ষয়কুমার দত্ত এই ভাষণ দেন সেই অনুষ্ঠানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও আচার্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ উপস্থিত ছিলেন ও উভয়েই ভাষণ দেন। অক্ষয়কুমার অবিশ্যি তাঁর ভাষণে এই ট্রাষ্ট ডিড্‌টিকে ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডিড্ বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু সেটি শুদ্ধ এই কারণে যে তিনি যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এসে যোগ দেন তখন ব্রহ্মসভার স্থান দখল করেছে ব্রাহ্ম সমাজ। তাই রামমোহনের ব্রহ্মসভার ট্রাষ্ট ডিড্‌টিকে ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডিড্ বলেছেন তিনি। ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে বিচার করলে এই ট্রাষ্ট্ ডিড্‌কে ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডিড্ বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কেন নয়, তা যথাস্থানে আলোচনা করবো। আপাতত শুধু এইটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে রামমোহন নিজেকে কোনো একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করতেন না, আর অক্ষয়কুমার দত্তের মতে রামমোহন যে প্রতিষ্ঠান গড়ে ছিলেন, যার ট্রাষ্ট ডিড্‌কে অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডিড্ বলেছেন, আসলে কিন্তু যেটি ব্রহ্মসভার ট্রাষ্ট ডিড্ ছিলো, সেই প্রতিষ্ঠানে রামমোহনের নির্দেশ অনুসারে "সকল দেশীয় সকল জাতীয় সকল প্রকার লোকেই এই সমাজে অধিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপিতা নিত্য নির্বিকার অপরিজ্ঞেয় স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন।" যে প্রতিষ্ঠানে সকল দেশের ও সকল জাতির লোকেরা এসে নির্বিকার অপরিজ্ঞেয় স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করতে পারবেন বলে প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা করেন, সেই প্রতিষ্ঠান কি একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য হতে পারে?

তাছাড়া এটা যে শুধু প্রতিষ্ঠাতার অভিপ্রায় ও নির্দেশ হয়েই থেকে গিয়েছিল, বাস্তবে কার্যকরী হয় নি তাও নয়। ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে অক্ষয়কুমার দত্ত যে ভাষণ দেন, সেই ভাষণেই তিনি বলেছেন ঃ—"তাঁহার (অর্থাৎ রামমোহনের—লেখক) সময়ে যেমন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য মহাশয়েরা উপনিষদাদি সংস্কৃত শাস্ত্রের আবৃত্তি ও অর্থাদি করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন, সেইরূপ আবার হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতিয়েরাও কখন কখন ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া, স্বীয় ভাষায় স্তুতিপাঠ করিয়া জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিতেন।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক)

এটা যদি ব্রাহ্ম নামধেয় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হোতো তাহলে

সেই প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয় লোকেরা এসে নিশ্চয়ই তাঁদের ধর্মমতানুযায়ী ভগবৎ উপাসনা করতে পারতেন না। অক্ষয়কুমার দত্তের এই ভাষণই আমাদের একমাত্র নজির নয়। এই ভাষণের সাত বৎসর আগে ১৭৬৯ শকের আশ্বিন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নিয়ে একটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধ বের হয়। সেই প্রবন্ধটিতে প্রবন্ধকার এই তথ্যটি পরিবেশন করেছেন ঃ—"১৭৫০ শকে ভাদ্রমাসে জোড়াসাঁকোস্থিত শ্রীযুক্ত কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। তৎকালে প্রতি শনিবার সায়ংকালে সমাজ হইত তাহাতে প্রথমত দুইজন তৈলাঙ্গ ব্রাহ্মণ বেদ উচ্চারণ করিতেন, তদনন্তর শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের মূল পাঠ করিতেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্যাখ্যান করিতেন, পরিশেষে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সমাজের কাজ সম্পন্ন হইত। কলিকাতাস্থ অনেকেই আগমন করিতেন। তৎকালে তারাচাঁদ চক্রবর্তী সমাজের নির্বাহিক ছিলেন। পরন্ত সমাজের আয় বৃদ্ধি হইলে কলিকাতাস্থ বর্তমান ব্রাহ্মসমাজের গৃহ প্রস্তুত হইলে ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ দিবসে তথায় উপাসনা আরম্ভ হইল। এই স্থানে মধ্যে মধ্যে দিবাবসান কালে মোছলমান্ ও ফিরিঙ্গী বালকেরা পারসীক ও ইংরাজী ভাষাতে পরমেশ্বরের স্তবগান করিত।"(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আশ্বিন, ১৩৬৯ শক, প্রথম ভাগ, পঞ্চম সংখ্যা) দেখা যাচ্ছে যে ১৭৫০ শকে কমল বসুর বাড়িতে যে ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত হোলো, ১৭৬৯ শকে এই প্রবন্ধকার তাকেই ব্রাহ্মসমাজ বলে অভিহিত করেছেন, যেহেতু ১৭৫০ শকে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভা ১৭৬৯ শকে ব্রাহ্মসমাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে নামে ও কাজে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৭৫১ শকে যখন এই ব্রহ্মসভা তার নিজের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হল তখন মুসলমান ও ফিরিঙ্গীরা মধ্যে মধ্যে তাঁদের নিজেদের ভাষায় পরমেশ্বরের স্তবগান করেছেন সেই সভা-গৃহে। এর থেকেই সুস্পষ্ট হচ্ছে যে যখন রামমোহন এই ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাকে শুধু হিন্দু একেশ্বরবাদীদের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনি আদবেই কল্পনা করেন নি। তিনি যতোদিন ভারতবর্ষে ছিলেন ততোদিন এই ব্রহ্মসভা নামে ও কাজে সব ধর্মের একেশ্বরবাদীদের মহামিলন-ক্ষেত্র ছিলো। তাঁর এই উদ্দেশ্য ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখে ব্রাহ্মসভার যে ট্রাষ্ট ডিড্ তাতে সুস্পষ্ট করে তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন যে ট্রাষ্টীরা—"shall at all times, permit the same building, land, tenements, hereditaments, and premises, with their appurtenances, to be used, occupied, enjoyed, applied, and appropriated, as, and for a place of Public Meeting, of *all sorts and descriptions of people without distinction,* as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober, religious, and devout manner, for the worship and adoration of the Eternal, Unsearchable, and Immutable Being, who is the Author and Preserver of the Universe, but not under, or by any other name, designation, or title peculiarly used for and applied to any particular Being or Beings, by any man or set of men whatsoever ; and that no graven image, statue, or sculpture carving, painting, picture, portrait or the likeness or anything, shall be admitted within the messuage, building

etc, and that no sacrifice, offering, or oblation of any kind or thing shall ever be permitted therein.........and that in conducting the same worship and adoration, no object animate or inanimate that has been or is, or shall hereafter become, or be recognised as an object of worship by any man, or set of men, shall be reviled, or slightingly or contemptuously spoken of, or alluded to, either in preaching, praying, or in the hymns or other mode in such worship that may be delivered made or used in such worship, but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe, to the promotion of charity, morality, piety, benevolence, virtue, and *strengthening the bonds of union between men of all religious persuasion and creeds* etc,"

ট্রাষ্ট্ ডিডের উদ্ধৃত অংশ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে চিৎপুর রোডের ব্রহ্মসভার নব-নির্মিত ভবন রামমোহনের ধারণা অনুযায়ী "to be used, ocupied, enjoyed, applied, and appropriated, as and for a place of Public Meeting, of all sorts and descriptions of people without distinction এবং এই ভবনে যে আরাধনা করা হবে সেটার উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য "promotion of charity, morality, piety, benevolence, virtue, and strengthening of the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds."

ট্রাষ্ট ডিডের নির্দেশ যে কোন রকম বাছবিচার করা চলবে না, সকল ধর্মের একেশ্বরবাদীরা এই ভবনটিকে তাদের মিলনস্থান রূপে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই ভবনে যে আরাধনা হবে সেটির উদ্দেশ্য হবে উদারতা, নৈতিক উৎকর্য সাধন করা ধার্মিকতা ও মানবপ্রেম উদ্‌বুদ্ধ করা এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মিলনকে সুদৃঢ় করা। এগুলিকে কি একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় সৃষ্টির প্রয়াস বলে ধরে নেওয়া সম্ভব? একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্যে এই ভবনটিকে ব্যবহার করা রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিলো, এ কথা কি এর পরেও বলা যায়? রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে আদি ব্রাহ্ম সমাজের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"আদি ব্রাহ্ম সমাজ কেবল মাত্র উপাসনার স্থান, যে খুসি এসো উপাসনা করিয়া চলিয়া যাও। রামমোহন রায়ের ট্রাষ্ট ডিড অনুসারে উহা কোন দস্তুর মোতাবেক সভায় পরিণত হইতে পারে না।" (রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত)

রাজনারায়ণ বসু ঠিক কথাই বলেছেন। রামমোহনের মত অনুসারে ও এই ট্রাষ্ট ডিড্ অনুসারে যে ভবনটিকে রাজনারায়ণ আদি ব্রাহ্ম সমাজ বলেছেন সেখানে যে খুসি (তাকে অবিশ্যি একেশ্বরবাদী হতে হবে) এসে উপাসনা করতে পারবে। এটা একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে পারবে না। এই ট্রাষ্ট ডিডের কোনো জায়গায় হিন্দু একেশ্বরবাদী ভাবধারার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা যায় না।

এতোক্ষণ পর্যন্ত আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলুম সেটি হচ্ছে রামমোহনের জীবনের মূল সুর সম্বন্ধে আলোচনা। সেই সুর ছিলো সমন্বয়-সাধনের সুর, বিশ্বাত্মবাদের সুর। একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় সৃষ্টি করবার কোনো উদ্দেশ্য রামমোহনের কখনো ছিলো

না। সব ধর্মের মূল সত্যগুলির মধ্যে সমন্বয়-সাধন করা সম্ভব ও সেই সমন্বয়-সাধন করতে হবে। অবিশ্যি প্রজ্ঞার দ্বারা সেই ঐক্য স্থাপন করতে হবে, সব কিছু নির্বিচারে গ্রহণের দ্বারা নয়। বিশ্বমানবের মধ্যে সব বিরোধ দূর করে বিশ্বমানবের মহামিলন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে—এই ছিলো রামমোহনের জীবনের মূল আদর্শ। এতো বড়ো আদর্শ নিয়ে কোনো মানুষ অষ্টাদশ কিম্বা ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবীতে দেখা দেন নি। তবুও কি আমরা আমাদের অজ্ঞানতার দরুণ কিম্বা সাম্প্রদায়িক মনের সংকীর্ণতার দাবীতে মহা-সমুদ্রের মতো বিশাল এই মানুষটিকে খিড়কির পুকুর বলে জাহির করবো, হিমাদ্রি-শিখরের মতো মহান এই পুরুষকে উইয়ের ঢিপি বলে প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে লেগে থাকবো?

তিনি ব্রহ্মসভা স্থাপন করলেন সবধর্মের একেশ্বরবাদীদের মিলন-ক্ষেত্র স্বরূপ আর আমরা কি তাঁকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের স্রষ্টা, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মসাধনের জন্যে একটি সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলে জাহির করে তাঁকে খর্ব করবো? এর চেয়ে পরিতাপের কথা আর কিছু হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"তিনি সমাজ-প্রচলিত বিশ্বাস ও পূজার্চনা ছাড়িয়াছেন, কোরাণ পড়িতেছেন, বাইবেল হইতে সত্যধর্মের সার সংগ্রহ করিতেছেন, আড্যাম সাহেবকে দলে টানিয়া ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়াছেন। (আত্মপরিচয়—পরিচয়)

বিপিনচন্দ্র পাল লিখছেন—"হিন্দুমুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের চিন্তানায়ক এবং উদার সাধকেরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাহাতে একে অন্যের ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের ও কল্যাণের সন্ধান পাইতে পারেন এবং এই সন্ধান পাইয়া একে অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন, ইহাই রাজার 'ব্রহ্মসভা' প্রতিষ্ঠার নিগূঢ় উদ্দেশ্য বলিয়াই মনে হয়।"

(যুগপ্রবর্তক রামমোহন)

বিপিনচন্দ্র আবার বলছেন—" সেই মহামিলন ক্ষেত্রের পথ গড়িয়া তুলিবার আশাতেই রাজা 'ব্রহ্মসভার' প্রতিষ্ঠা করেন।" (যুগপ্রবর্তন রামমোহন)

সেই একই প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র বলেছেন—"রাজা ব্রাহ্মধর্ম নামে কোনও নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, ব্রাহ্মসমাজ নামে কোনও সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহেন নাই।" (যুগপ্রবর্তক রামমোহন)

রবীন্দ্রনাথের ও বিপিনচন্দ্রের যে মতামতগুলি উদ্ধৃত করেছি সেগুলিকে আমি রামমোহন যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন নি, ব্রহ্মসভা স্থাপন করেছিলেন, তার নজির স্বরূপ পেশ করি নি, যদিও এঁদের দুজনের মন্তব্য থেকে সেটিও পরিস্ফুট হচ্ছে। রামমোহনের অন্তর্লোকের বিস্তৃতি, গভীরতা ও রূপ যাঁরা খুব ভালো ভাবে দেখেছেন, এমন দুটি দক্ষ মানস-জরীপদারদের রামমোহনের জীবন-আদর্শ সম্বন্ধে কি অভিমত সেইটি দেখাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের ও বিপিনচন্দ্রের মত উদ্ধৃত করেছি। অর্থাৎ কিনা ঐতিহাসিক তথ্যের প্রমাণ হিসেবে নয়, মানস-তত্ত্বের নজির হিসেবে তাদের হাজির করেছি।

কিন্তু মানস-তত্ত্ববিদদের মনের জরিপের খবর দিয়ে তো আর ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যাসত্য বিচার করা যায় না। আর একটি ব্যক্তির মানসের সঙ্গে তার কর্মের সম্বন্ধ

স্থাপন করা অর্থাৎ কিনা তার মানস পরীক্ষা করে বলা যে এ কর্ম তার পক্ষে সম্ভব, আর এই কর্ম তার পক্ষে সম্ভব নয়—এটা মনোবিজ্ঞানসম্মত হলেও নিছক্ তথ্যবাদীদের কাছে এর কোনো কদর নেই। তাঁরা বলবেন রামমোহনের মানস সম্বন্ধে যিনি যাই বলুন না কেন তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন এটা ঐতিহাসিক তথ্য। আর তার প্রমাণ স্বরূপ এক, দুই, তিন করে গুণে তাঁরা যুক্তি দিয়েছেন। এখন সেই যুক্তিগুলো একটি একটি করে বিচার করে দেখা যাক।

প্রথম যুক্তি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর তারিখে লর্ড বেন্‌টিংককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবার জন্যে যে জনসভা আহ্বান করা হয় তার বিজ্ঞপ্তি ১৮৩২ খ্রষ্টাব্দের ৬ই ও ১০ই নভেম্বরের 'সমাচার দর্পণ'-এ ছাপা হয়। সেই বিজ্ঞপ্তিতে **ব্রাহ্মসমাজ গৃহে** কথাটির উল্লেখ আছে। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় এই সভার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। সেই বিবরণটি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ ছাপা হয়। তাতে ব্রাহ্মসমাজ কথাটির উল্লেখ আছে। 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকায় উক্ত সভার যে বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হয়, 'সংবাদ কৌমুদী' থেকে নেওয়া সেই বিবরণটি ১৮৩২ খৃঃ ২৪শে নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ ছাপা হয়। তাতেও **ব্রাহ্মসমাজ গৃহের** কথার উল্লেখ আছে।

এই তথ্যগুলি নির্ভুল ; শুধু ৬ই নভেম্বর 'সমাচার দর্পণ' নেই, কেন না 'সমাচার দর্পণ' সপ্তাহে দুদিন ছাপা হতো ; বুধবার আর শনিবার। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৬ই
ছিলো মঙ্গলবার। তাই ৭ই নভেম্বর, বুধবারে 'সমাচার দর্পণ' দস্তুর মোতাবেক বার ঃ
৬ই নভেম্বরে নয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয় ঃ—"স্ত্রীদাহনিষেধবিষয়ক বিজ্ঞাপন।

শ্রীল শ্রীযুত ইংলণ্ডাধিপতি গত জুলাই মাসের একাদশ দিবস বুধবারে প্রিবিকৌন্সলে হিন্দুদের স্ত্রীদাহবিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বরের আজ্ঞা গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং এদেশের কয়েক জন হিন্দু যে পুনরায় স্ত্রীদাহ হয় এজন্য আবেদন লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা গ্রাহ্য করেন নাই এ জন্য স্ত্রীদাহ নিবারণের অনুরাগীরা শ্রীল শ্রীযুতের উপকার স্বীকারের কির্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার জন্য ভবিষ্যৎ শনিবার ২৬ কার্ত্তিক ১০ নভেম্বর দুই প্রহর ছয় ঘণ্টা দিবার সময়ে জোড়াসাঁকোর **ব্রাহ্মসমাজ গৃহে** একত্র হইবেন অতএব এই আহ্বান লিপি প্রকাশে জানাইতেছি যে যাঁহারা স্ত্রীদাহ নিবারণে অনুরাগ করেন তাঁহারা উক্ত সময়ে ও দিবসে সাধারণ গৃহ ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিবেন। ইতি ১২২৯ সাল ২২ কার্ত্তিক।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায়
শ্রীরামনাথ ঠাকুর
শ্রীরাধাপ্রসাদ রায়
"টরষ্টীস"

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা থেকে নেওয়া ১০ই নভেম্বর তারিখের জনসভার এই ছোট্ট খবরটি ছাপা হয় ঃ—

"স্ত্রীদাহ নিবারণে হর্ষসূচক সভা

গত শনিবার সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ গৃহে স্ত্রীদাহ নিবারণে আনন্দিত *যাহারা* এক মনোরম কমিটি করিয়াছিলেন তাহার প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ

ঠাকুর ঐ সভোপবিষ্ট ইয়োরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাত্মাবর্গের সমক্ষে প্রথম প্রশ্ন এই হইয়াছিল যে অত্যধিক ঘৃণ্য স্ত্রীহত্যারূপ দুষ্কর্ম নিবারণ প্রযুক্ত আমাদের যে পরমানন্দের মঙ্গল সমাচার সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে আসিয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আহ্লাদিত করিয়াছে ইত্যাদি।"

এর সঙ্গে আমি আর একটি সাক্ষ্য জুড়ে দিই যেটি—ব্রাহ্মসমাজ রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত এই মতাবলম্বীদের কাজে আসবে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই মন্তব্য করা হয়েছে ঃ—

"এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র হইতে নীত লিপির মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে গত শনিবারের সভার বৃত্তান্ত দৃষ্ট হইতে পারে। শ্রীল শ্রীযুক্ত বাদশাহ ও তাঁহার মন্ত্রিগণ এবং কোর্ট অফ ডৈরক্তর্স এবং শ্রীযুক্ত লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ও রাজা রামমোহন রায় সতীরীতি রহিত করণার্থ যে বিশেষ উদ্যোগ করিয়াছেন তন্নিমিত্ত উক্ত সভাতে তাঁহাদের প্রতি বিশেষ বিশেষ প্রশংসাপত্র প্রেরণ করিতে অনুমিত হইয়াছে ইত্যাদি।"

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকা থেকে নেওয়া এই খবরটি ছাপা হয় ঃ—"স্ত্রীদাহনিষেধ বিষয়ক সভা।

অস্মাদাদির দেশের স্ত্রীপরমপরা মৃত পতি সহ দগ্ধ হইতেন এই ব্যবহার ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হইবাতে এবং ইংলণ্ডে সেই নিয়ম শ্রীল শ্রীযুত কিং ইন প্রিবি কৌন্সলে গ্রাহ্য করিবাতে তাঁহাকে ধন্যবাদপত্র প্রদত্ত করিতে হইবেক এই বিবেচনা করিবার জন্য বিজ্ঞান লিপির অনুযায়িক গত শনিবার সন্ধ্যাকালে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজে তথাকার টরষ্টীদের সম্মতিতে স্ত্রীদাহ নিবারণের অনুরাগি হিন্দুরা এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরো তিনটি নজির আমি এর সঙ্গে জুড়ে দিই। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই মন্তব্য করা হয়—"ব্রাহ্মসমাজের সভা।

ব্রাহ্মসমাজ গৃহে শেষ সভার বৃত্তান্ত জ্ঞানান্বেষণ পত্রে প্রকাশ হইলে দর্পণে তাহা আমরা অবিকল অর্পণ করিয়া বোধ করিলাম যে তাহার আর অধিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করণের প্রয়োজন হইবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।"

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ-এ এই খবর ছাপা হয় ঃ—

"কটকের চাঁদাপত্র
ব্রাহ্মসমাজ ১০ নভেম্বর ১৮৩২
শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৫০
শ্রীযুত কালীনাথ রায় ৫০
শ্রীযুত গোপাললাল ঠাকুর ....৫০ 'ইত্যাদি ইত্যাদি"

'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত এই খবরটি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত হয় ঃ—

ব্রাহ্মসমাজ

১৩ই জুলাই তারিখে ব্রাহ্মসমাজের যে সভা হইয়াছিল জান বুল পত্রে তাহার যথার্থ বিবরণ প্রকাশ হওয়াতে চন্দ্রিকাকার অসহিষ্ণু হইয়া তৎসম্পাদকের প্রতি লিখিয়াছেন যে

'আমরা বিশেষানুসন্ধান পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি ঐ সভায় যে কএক লোকের আগমন হইয়া থাকে তদতিরেক আর হয় নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।"

প্রমাণের তালিকা এতো দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন যে ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা না করে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আদবেই প্রমাণ করা গেলো না। যতগুলি প্রমাণ উপরে ধরে দেওয়া গেলো সবগুলিই হচ্ছে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের নজির। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ নামক একটি প্রতিষ্ঠান ছিলো না, এ কথা কে কবে বলেছে? আমার মতে রামমোহন ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন নি। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি রামমোহন এদেশ থেকে চিরদিনের মতো চলে গেলেন। তাঁর চলে যাবার পরে ব্রহ্মসভা ব্রাহ্মসমাজের নাম ও রূপ গ্রহণ করে। যাঁরা রামমোহনকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলে প্রমাণ করতে চান তাঁদের দেখাতে হবে যে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রহ্মসভা কমল বসুর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হোলো তখন থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি পর্যন্ত অর্থাৎ রামমোহনের দেশত্যাগের সময় পর্যন্ত, এই দুই বৎসর কালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিলো। যাঁরা এটা দেখাতে পারবেন তাঁরা নিঃসন্দেহে রামমোহনকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলে প্রমাণ করতে পারবেন। কিন্তু ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সংবাদপত্রের নজির টেনে রামমোহনকে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা প্রমাণ করবার চেষ্টা ইচ্ছার খাতে ইতিহাসের ধারাকে জোর করে বইয়ে দেওয়ার চেষ্টার সামিল।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত সে সময়ের কোনো সংবাদপত্রে 'ব্রাহ্ম-সমাজ' এই কথাটির উল্লেখ মাত্র নেই। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখের রামমোহন-কৃত ট্রাষ্ট ডিডের নজির দিয়ে কেউ কেউ বলে থাকেন যে এই ট্রাষ্ট ডিড্টি ব্রাহ্ম-সমাজের ট্রাষ্ট ডিড্, কেন না তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রাহ্মসামজের ট্রাষ্ট ডিড্ বলে এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এর উত্তরে এইটুকু দেখালেই যথেষ্ট হবে যে ট্রাষ্ট ডিডের কোথাও 'ব্রাহ্ম-সমাজ' এই কথাটির নামগন্ধ নেই। আর ১৭৭২ শকের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় ট্রাষ্ট ডিড্টিকে 'ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাষ্ট ডিড' এই শিরোনামা দিয়ে ছাপা হয়েছিলো বটে কিন্তু এই সামান্য তথ্যটুকু মনে রাখলে অনর্থক হয়রাণি থেকে বেঁচে যাওয়া যাবে যে ট্রাষ্ট ডিড্টি করা হয় ১৭৫২ শকে আর তার বিশ বৎসর বাদে ওটাকে 'ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডিড্' বলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় ছাপানো হয়। অনন্তকালের পটভূমিকায় কি কেউ কোনো দিন কোন জিনিসের উৎপত্তির কাল নির্ণয় করেছে? কাহিনী এ ভাবে রচিত হতে পারে, কিন্তু ইতিহাস কখনো এতোটা বেপরোয়া ভাবে রচিত হয় না।

এবার ট্রাষ্ট ডিড্টি নিষ্পন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সংবাদাপত্রগুলিতে কি খবর বের হয়েছিলো সেটি দেখা যাক। তারপরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেকালের সংবাদ পত্রগুলিতে কি সব খবর বের হয়েছিলো সেগুলি দেখে নেওয়া যাবে। আমরা আগেই দেখেছি যে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখে ট্রাষ্ট ডিড্টি সম্পন্ন হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদ কৌমুদীতে এই চিঠিটি প্রকাশিত হয় ঃ—

To the Editor of the Cowmoodee

How shall I describe the extent of the knowledge which the Editor of

the Chandrika has attained... . His censuring the employment of Moosoolman music to assist the singing after the reading of the Vedas, reminds me of the couplet of the Mahabharut. "O king, he sees the fault of another, though it be no longer than a grain of mustard seed : he overlooks his own, though it be larger than a Vilva fruit " This couplet is brought to my mind by the fact that the Chandrika sees no propriety in employing Moosoolman music and dancing, and in giving the English wine and meat at the Doorga, Ras and other festivals . ..How astonishing is it that the should see no fault in anything but in the *Brahma Sabha!*

A Reader of Chandrika

Feb 15. 1830

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'জন্ বুল' পত্রিকায় সমাচার দর্পন থেকে এই মন্তব্যটুকু উদ্ধৃত করা হয় ঃ—

We have this week extracted two articles from the Chundrika, and the Counmudy. The Chundrika advocates the Dhurma Subha, the Counmudy, the Brumhu Subha. It is not our intention to enter into the merits of the question at issue between them, but we shall impartially insert in the Durpun the most important articles from both papers.

Samachar Durpun

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে জুলাই তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-এ 'জাতির কর্তৃত্ব বিষয়' শীর্ষক এই মন্তব্যটি ছাপা হয় ঃ—"তিনি (সমাচার দর্পণ-প্রকাশক— লেখক) বিবেচনা পূর্বক সুবিচার করিয়া ধর্মসভাকে জাতির কর্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন ইহা আমরা সপ্রমাণ করিব। যদি বল ইহার কি প্রমাণ? উত্তর এক প্রমাণ দেখ এই নগরে ব্রহ্মসভা নামে একটি সভা আছে তাহার অধ্যক্ষ শ্রীযুত রামমোহন রায়। এক্ষণে তৎপদে তাঁহার পুত্র শ্রীযুত রামপ্রসাদ রায় নিযুক্ত আছেন এবং তথায় শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পাণ্ডিত্য কর্মে অভিষিক্ত এবং শ্রীযুক্ত কালীনাথ মুন্সী সেই সভার মতাবলম্বী। এবম্প্রকারে তত্ত্ব করিলে ঐ সভা সংক্রান্ত আর দুই চারিজন খ্যাত লোক পাওয়া যাইতে পারে। দর্পণ প্রকাশক মহাশয় তাঁহার দিগকে প্রশ্ন কেন না করিলেন।"

এর উত্তরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট তারিখের সমাচার দর্পণ-এ দর্পণ-সম্পাদক এই মন্তব্য করেন ঃ—"পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক স্মরণ করুন যে ভারতবর্ষে জাতির হানিতে পৈতৃক সম্পত্তির হানি হয় এতদ্বিষয়ে শ্রীযুত ফারগিসন সাহেব হৌস অফ কমন্সে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া ঐ প্রস্তাবে আমারদিগের সূক্ষ্মানুসন্ধানাকাঙ্খা হওয়াতে ধর্মসভাকে তদ্বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলাম। ইহাতে তৎ সভা-সম্পাদক চন্দ্রিকা-প্রকাশক মহাশয় কহেন যে আমরা ঐ সভার জাতির কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছি। ফলিতার্থ এই যে ঐ সভাতে অনেক হিন্দুধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আছেন এই বোধে আমাদের উক্ত সভায় তদ্বিষয়ক প্রশ্নকরণমাত্র অভিপ্রায়। ডাক্তার উসলসন বা ডাক্তার কেরী বা বাহ্মসভান্তঃপাতি পণ্ডিতেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও হইত কিন্তু তাহা করিলে কোন বালকেও এমত বুঝিত

না যে ঐ উক্ত সাহেব প্রভৃতিকে জাতির কর্তা বলিয়া স্বীকার করা হয়।”

সমাচার চন্দ্রিকা-প্রকাশক এর যে উত্তরটি দেন সেটি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২০ শে আগষ্ট তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ ছাপা হয় ঃ—“তিনি (সমাচার দর্পণ-প্রকাশক— লেখক) ধর্মসভাকে যে জাতির কর্তা কহিয়াছেন ইহা তাঁহারি লেখা দ্বারা পুনঃ সপ্রমাণ হইতেছে যে হেতু প্রাগুক্ত কথা বিবেচনা করিলে কে না বুঝিতে পারিবেন কেন না তিনি কহেন। ডাক্তার উইলসন বা ডাক্তার কেরী সাহেব অথবা ব্রহ্মসভাকে জিজ্ঞাসা করিলে কি তাঁহারদিগকে জাতির কর্তা স্বীকার করা হইত অর্থাৎ হইত না কেন না অসম্ভব কখনও হয় না।”

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার মির্জাপুরনিবাসী কৃষ্ণমোহন দাস সম্পাদিত 'তিমির নাশক' পত্রিকায় ব্রহ্মসভা সম্বন্ধে এই বিবরণ ছাপা হয়—“কয়েক বৎসর হইল এ মহানগর কলিকাতার জোড়াসাঁকো স্থানে ব্রহ্মসভা নামক এক সভা স্থাপন হইয়াছে ইহাতে প্রতি শনিবার সায়ং সময়ে বেদপাঠ ও ভাষা ব্যাখ্যা এবং ব্রহ্মবিষয়ক গান হইয়া থাকে। ঐ সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরা তদর্থে এক অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন তদুপরি বিষয়ি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শ্রবণেচ্ছুক হইয়া প্রতি সৌরি বাসরেই গমন করিয়া থাকেন এবং তথায় তাহারা বহু সম্মানও প্রাপ্ত হন। বিশেষতঃ ভাদ্রমাসে বহু ব্রহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা পত্র দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করণান্তর তৎ সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরা বহু ধনদান ও সম্মান করিয়া তাঁহারদিগকে বিদায় করেন এতাদৃশ নিয়ম করিয়াছেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত সময়েও তৎসভায় দান বিতরণ হইয়া থাকে। সম্প্রতি ১৯ ভাদ্র শনিবার ঐ সভায় ন্যূনাতিরেক ২০০ দুই শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পত্রদ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহু ছাত্রেরা সমাগম হইয়াছিল। অধ্যক্ষ মহাশয়েরা পত্রানুসারে ১৬। ১২। ১০। ৮। ৬। ৫। ৪। ৩। ২ তঙ্কা করিয়া দান করিয়াছেন।”

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সুবিখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'রিফর্মার' পত্রিকায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই খবরটি বের হয়—

The *'Brahmo Sabha* a Vedant institution was established in the year 1828, by our enlightened and celebrated countryman Babu Rammohun Roy, in conjunction with several other intelligent Hindoos, and it has ever since continued to flourish, and to bestow mental benefits on our countrymen from the rich treasure of theological and moral instructions contained in the Vedant. Its meetings are held every Saturday evening at a well-known house in Chitpore Road, where preaching from the Vedant and singing psalm in praise of the one true God occupy the time of those who meet under the roof to worship the eternal Creator of the universe.....Christians and men of every other persuasion are permitted to be present at the religious acts that are performed within this sanctuary."

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ইণ্ডিয়া গেজেট থেকে 'Calcutta Monthly Journal' এই কথাগুলি উদ্ধৃত করে দিয়েছিলো ঃ—

"The labours of Rammohun Roy and the establishment of the Hindu

College altogether contributed to give a shock to the popular system of idolatry in Calcutta, perhaps we might say in Bengal which has evidently *alarmed* the fears of its supporters. A *Bruhma Sabha* or Hindu theistical society, has been formed by Rammohun Roy and his friends etc., etc."

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্টের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় এই চিঠিটি ছাপা হয় ঃ—

"About two years and a half ago the Editor of the "Chundrika" or Secretary of the Dhurma Subha, filled the Chundrika with numerous assurances, according to the fine inventions of of his own brain, that whereever there were visits and invitations of the brahmuns and others who were the opponents of religion and adherents of the *brumha Sabha*, the gentry of the Dhurma Sabha would not appear, that whoever gave such invititations would be excluded from all others .... Lately, however in a place 10 miles distant from this Metropolis, at the house of a most excellent, estimable, honoured and illustrious brahmun, the most eminent persons of both the *Bruhma*, and the Dhurma Sabha, were invited on a particular occassion, and appeared together."

One impatient of injustice.

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চান অবসারভার' ব্রহ্মসভা সম্বন্ধে লেখে—

"This institution was planned and commenced about the year 1814. Its originator and chief supporter was Rammohun Roy, but he was joined also by Kaleesunkur Ghoshal, Brijomohun Mojumdar, Ramnursing Mukhopodhaya, and a few other highly respectable natives. The meetings were formerly held at the garden-house of Rammohun Roy, but during the last five or six years, service has been regularly conducted once a week at a house in the Chitpore Road. Three eminent Pundits are engaged to conduct the service, Viz., Ramchunder, Ootsobanundo, and a Hindoostanee reader, called Bawjee. The duty of the first is to explain the text of Vyas. Ootsobanunda explains the Upanishads and Bawjee simply reads portions of the Vedas in the original sanskrit language. The object of the *Bruhmo Sabha* is to make known that part of the Vedas which is either unknown, forgotten or neglected... . The only thing that distinguishes the party from other religionists is that they do not bow down to idols, but worship the one eternal, invisible spirit.

The hymns were composed by Rammohun Roy, Neelmony Ghosh, Kaleenath Roy and others, One half of the service consists in sysing some of these humns....... The bealah resembles our violincello, and the mondeera

are small cymbals, which have a very pleasing effect These are the only instruments used in *Brumha Subha.*

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র নবম সংস্করণে রামমোহন ও ব্রহ্মসভা সম্বন্ধে এই মন্তব্য আছে ঃ—

"At last Rammohun felt able to re-embody his cherished ideal and on August 20, 1828, he opened the first Brahma Association (*Brahma Sabha)* at a hired house."

নতুন বাড়ি তৈরী করে ব্রহ্মসভা যখন সেই নতুন বাড়িতে গেলো সেই সম্বন্ধে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বল্‌ছে—

"a suitable church-building was them erected and placed in the hands of trustees, with a small endowment and a remarkable trust-deed by which the building was set apart "for the worship and adoration of the Eternal, Unsearchable and Immutable Being, who is the Author and Preserver of the universe " The new church was formerly opened on the 11th Magh (January 23), 1830, from which day the *Bramha Samaj* dates its existence."

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র মতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে জানুয়ারী তারিখে যেদিন নতুন বাড়িতে ব্রহ্মসভার উদ্বোধন হোলো সেই দিন থেকে ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত হলো। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র এই ধারণা ভুল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যখন কমল বসুর বাড়ি থেকে ব্রহ্মসভা তার নিজের বাড়িতে স্থানান্তরিত হোলো তখন থেকে ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত ঘটে নি। অন্তত সে সময়ের কোনো পত্রিকায় কিম্বা কোনো বইতে তার কোনো প্রমাণ নেই। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র নবম সংস্করণে যখন ব্রহ্মসমাজ সম্বন্ধে এই মন্তব্য করা হোলো তার অনেক দিন আগেই চিৎপুরের ব্রহ্মসভার বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজ চালু হয়ে গেছে! তাই এই ভুল করে বসেছে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ বলে কোনো প্রতিষ্ঠানের হদিশ তৎকালীন ইতিহাস থেকে আমরা পাই না।

রামমোহনের শিষ্য কালীনাথ মুন্সী যখন মারা গেলেন, তখন 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা তাঁর মৃত্যুর খবর দিয়ে লিখলো—

"He was among the most devoted admirers and followers of Raja Rammohun Roy and assisted him in the establishment of the *Brahmo Sabha* etc. etc".

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে যেখানে তিনি উপনিষদের ছিন্নপত্রটি শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যের কাছে তার অর্থ বোঝাবার জন্য নিয়ে যাওয়ার কথা লিখেছেন সেখানে তিনি বলছেন—

"I hurried up to the boythakkhana on the third story, and asked Shymacharan Bhattacharya to explain to me what was written on the printed page, He said, "I have been trying hard all this time, but cannot make out its meaning", this astonished me, Enlgish scholars can undedrstand every

book in Enlgish language : why then cannot Sanskrit scholars understand every Sanskrit book? Who can make it out then? I asked. He said. "that is what the *Brahma Sabha*'talks about". (Autobiography of Maharshi Devendranath Tagore. Translated from the original Bengali by Satyendranath Tagore and Indira Devi 1916)".

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন— "এই বৎসরের (১৮২৮ সাল) ৬ই ভাদ্র দিবসে রামমোহন রায় কলিকাতার চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বসু নামক এক ভদ্রলোকের বাহিরের বৈঠকখানা ভাড়া লইয়া যেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—নিউ এজ সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬২ পৃষ্ঠা ৯৮)

এখানে তিনি ব্রাহ্মসমাজ কথাটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার কয়েক লাইন পরেই লিখছেন—"**ব্রহ্মসভা** স্থাপিত হইলে কলিকাতার হিন্দুসমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিল।"

কয়েক পাতা পরেই আবার পাচ্ছি ঃ—"ইহার অল্প দিন পরেই অর্থাৎ ১৮৩০ সালের ১১ই মাঘ দিবসে রামমোহন রায় তাঁহার নবনির্মিত গৃহে **ব্রহ্মসভাকে** স্থাপন করলেন।"

তার পরের পৃষ্ঠাতেই লিখেছেন—"সতীদাহ নিবারণ ও **ব্রহ্মসভা** স্থাপন নিবন্ধন কলিকাতাবাসী হিন্দুগণের মন এমন উত্তেজিত হইয়াছিল যে সতীদাহ নিবারণ-বিষয়ক আইন রদ করিবার জন্য এক আবেদন পত্রে বহুসংখ্যক লোকের স্বাক্ষর হইতে লাগিল।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—নিউ এজ সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬২, পৃঠো ১০৪)

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইটি থেকে যে অংশগুলি উদ্ধৃত করেছি সেগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে শাস্ত্রী মহাশয় কমল বসুর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভাকে ব্রাহ্মসমাজ বলেছেন নিছক অভ্যাসবশতঃ, কেননা তার পরেই ঐতিহাসিক নির্ভুলতার সম্বন্ধে সজাগ হয়ে তিনি তিন তিন বার ব্রহ্মসভা স্থাপনার কথা বলেছেন।

তাছাড়া এটাও জানা ভালো যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'সমাজ' বলতে এখন আমরা যা বুঝি 'সমাজ' কথাটির ধারণা তখন তা ছিলো না। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে 'গৌড়ীয় সমাজ'-এর ইংরিজি নাম ছিলো 'Literary Society ও তার কাজ ছিলো বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন ও সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ। ১৩৬৪ সালের 'বসুধারা' পত্রিকার অঘ্রাণ সংখ্যায় 'বাংলার নব জাগরণের কথা' প্রবন্ধে যোগেশচন্দ্র বাগল এই 'গৌড়ীয় সমাজ' সম্বন্ধে লিখেছেন যে তৎকালীন মিশনারীদের হিন্দু-ধর্মের প্রতি আক্রমণের প্রতিবাদের উদ্দেশ্যেই এই সমাজ গঠিত হয়।

এগুলি ছাড়াও Rammohun Roy : The Story of His Life–প্রবন্ধে ব্রহ্মসমাজের পত্তনের ইতিহাস বর্ণনা করে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন— "The opening of the new theistic service which the common people of the time called the "*Brahma Sabha*" or the "one-God Society", once more roused the enimty of the orthodox Hindu community of Calcutta ..... .Since the inauguration of the *Brahma Sabha* on the 20 August, 1828. its service began to attract increasing numbers, and it secured new sympathisers",

শুধু সাধারণ লোকই এই একেশ্বরবাদী প্রতিষ্ঠানকে ব্রহ্মসভা বলতেন না, সাধারণ

অসাধারণ সব লোকই তখন যথা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটিকে ব্রহ্মসভা বলতেন কেননা যিনি একেশ্বরবাদী এই প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা সেই রামমোহন রায়ই একে ব্রহ্মসভা নাম দিয়েছিলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন, এই মতের সমর্থকদের প্রথম যুক্তির আলোচনা করছিলুম। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে তৎকালীন সংবাদপত্রগুলি থেকে যে সব নজির আমাদের সামনে হাজির করেছিলেন, সেগুলির বিশদ আলোচনা করেছি। সেগুলি আদবেই প্রমাণ করে না যে ব্রাহ্মসমাজ রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সেটি প্রমাণ করতে গেলে কি করা দরকার সেটি প্রথমেই বলেছি—দরকার দেখানো যে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি পর্যন্ত অর্থাৎ রামমোহনের ভারতবর্ষ ত্যাগের আগে পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ বলে কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সংবাদপত্রগুলির নজির দিয়ে এটা প্রমাণ করা যায় না। এঁদের মতের সমর্থন করে এমন আরো কটি নজির আমি যুগিয়ে দিয়েছি এঁদের। তারপরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নানা পত্রিকার উদ্ধৃতি থেকে আমরা দেখছি যে চিৎপুর রোডের একেশ্বরবাদী প্রতিষ্ঠানটি ব্রহ্মসভা নামেই সুপরিচিত ছিল। এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ ও ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের উদ্ধৃতিগুলিই আমাদের এই আলোচনার জন্যে বিশেষ মূল্যবান। ১৮৩২ ও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পত্রিকাগুলির উদ্ধৃতি এই আলোচনার মধ্যে সত্যি করে স্থান পেতে পারে না। তবুও যেহেতু রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত-ব্রাহ্মসমাজ এই মতাবলম্বীরা শুধু ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সংবাদপত্রের উদ্ধৃতির প্রমাণ হাজির করেছেন তাই ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের একটি একটি করে উদ্ধৃতি আমি পেশ করেছি।

পত্রিকার এই উক্তিগুলির চেয়ে কম মূল্যবান নয় রামমোহন ইংলণ্ডে চলে যাওয়ার পরে ব্রাহ্মসমাজের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উক্তিগুলি।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের বা ১৭৮৬ শকের ২৩শে বৈশাখ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত-বিষয়ে ভাষণ দেন। সুতরাং এই হিসেব মতো পঁচিশ বৎসর বাদ দিলে ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত সূচনা ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে গিয়ে দাঁড়ায়।

আস্তে আস্তে সেটি ব্রাহ্মসমাজের পরিণত রূপ ধারণ করে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যখন পারিবারিক ও সামাজিক ব্রহ্মধর্মানুষ্ঠান সুরু করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

আর একটি জিনিস স্মরণে রাখা ভালো যে রামমোহনের অনুবর্তীরা ব্রহ্মসভা সম্বন্ধে উৎসাহী হলেও ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা সকলেই প্রতীক-উপাসক হিন্দু ছিলেন। তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সবই পৌরাণিক হিন্দুমতে হোতো।

'ব্রহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসর' এই ভাষণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলছেন—"তখনকার লোকের মধ্যে সমাজের সহিত এখন আর কাহারো যোগ দেখা যায় না। কেবল তখনো যে বিষ্ণু গান করিত, এখনো সেই বিষ্ণু আছে।"

এই ভাষণের আর এক জায়গায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলছেন—"যাঁহারা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ব্রহ্মসমাজে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ-হয়তো জানিতেন না যে কিসের জন্য তথায় আসিয়াছেন। তাঁহারা রামমোহন রায়ের সন্তোষের জন্য, তাঁহার অনুরোধ রক্ষার জন্যেই যেন আসিতেন।"

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে রামমোহনের ইংলণ্ডে যাওয়ার পর অনেকেরই অতি সহজে

ব্রাহ্মসভার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। রামমোহনের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে এঁরা এসে জুটেছিলেন, তিনি চলে যাবার পর এঁরা স্বভাবতই সরে যান।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই ভাষণটি 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসর'' আখ্যা দিয়ে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সেই পুস্তিকায় মহর্ষিদেবের এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন—"১৭৫১ শকের দ্বাদশ বৎসর পরে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যখন আমার প্রথম যোগ হয় তখন দেখিলাম—সেই প্রকার নিভৃত রূপেই বেদপাঠ হইতেছে, বিদ্যাবাগীশ সেই প্রকারেই প্রাচীন প্রণালী মত ব্যাখ্যান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন রামচন্দ্রের অবতার হওয়া বর্ণনা করিতেছেন।"

মহর্ষিদেব রামচন্দ্রের অবতারত্ব প্রচার নিষেধ করেন কেন না তাঁর মতে— "পৌত্তলিকতার উপদেশ দেওয়া ধর্ম-বিরুদ্ধ হইয়াছে।"

এর থেকে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে ১৭৬৩ শকেও বিধিবদ্ধ ভাবে ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মসম্প্রদায় বলে কিছুই নেই। ব্রাহ্মধর্ম মতে প্রথম দীক্ষা গ্রহণ হয় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে। তারও বহু পরে প্রকৃতভাবে পারিবারিক ব্রাহ্মধর্মানুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বল্‌ছেন—"ভদ্রাসন বাটী স্থাপনাবধি যে গৃহে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইয়া আসিতেছে, সে গৃহে যে ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান প্রচলিত হওয়া আমি এই চক্ষে দেখিব, এমত আমার আশা ছিল না। ঈশ্বর-প্রসাদে তাহাও আমার জীবনে ঘটিল। ১৭৮৩ শকে (১৮৬১ খৃষ্টাব্দে) আমার কন্যা সুকুমারীর বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম-বিধান মত প্রথম অনুষ্ঠিত হইল। ব্রাহ্মধর্মের সেই প্রথম অনুষ্ঠান—ব্রাহ্মধর্মের সেই প্রথম ফল।"

('ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসর')

রামমোহনের পৌত্রী চন্দ্রজ্যোতির বিবাহ সম্বন্ধে হেমলতা দেবী লেখেন—"বিবাহ হল যথারীতি প্রচলিত অনুষ্ঠানে। সম্প্রদানের সময় নিজে (অর্থাৎ রামমোহন—লেখক) দাঁড়িয়ে ছিলেন বাইরে।" ('ঘরোয়া ব্যাপারে রামমোহন')

রামমোহনের সময় ব্রহ্ম-উপাসকদের বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির জন্যে নতুন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রণয়ণ নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রণয়ণ ও পরবর্তীকালে ব্রাহ্মদিগের জন্যে পারিবারিক ও সামাজিক পদ্ধতি রচনা—এ সবই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন।

রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রহ্মসভায় গিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তার কি অবস্থা দেখেছিলেন তার সম্বন্ধে অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর লিখিত মহর্ষির জীবন-চরিতে লিখেছেন—"দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের মৃত্যুর পরে ব্রহ্মসভায় গিয়া তাহার অবস্থা কেমনতর দেখিয়াছিলেন তাহা কয়েকজন বন্ধুকে গল্পচ্ছলে একদিন বলিয়াছিলেন—"যে সকল ধনীলোক রাজার জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন, রাজার মৃত্যু-সংবাদ কলিকাতায় আসিলে পরেই, তাঁহারা সমাজের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলেন। কতকগুলি মধ্যবর্তী লোক সমাজে আসিতেন। সাপ্তাহিক উপাসনার সময়ে পথের লোক.....কেহ কেহ বাজার করিয়া যাইবার সময় বাজারের ধামা হস্তে প্রবেশ করিত। কেহ কেহ টিয়া পাখী হস্তে লইয়া সমাজে আসিত।"

'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসর' প্রবন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন—"অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে ব্রাহ্মদল হইতে ব্রাহ্ম সমাজ নাম হইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা

নহে, ব্রাহ্ম সমাজ হইতে ব্রাহ্ম নাম স্থির হয়।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট অংশে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখছেন—অর্থাৎ প্রকৃত ঘটনা এই নয় যে আগে কতকগুলিলোক 'ব্রাহ্ম' বলিয়া চিহ্নিত হওয়ার পরে তাঁহাদের দলের নামটি 'ব্রাহ্মসমাজ' হইল: প্রকৃত ঘটনা এই যে, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন লোক প্রতিজ্ঞাপূর্বক 'ব্রাহ্ম' নামে বিশেষভাবে চিহ্নিত হইলেন।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে তিনি জোড়াসাঁকো বাড়িতে দূর্গাপূজার উৎসবে যোগদান করবার জন্যে রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন—"রাজা ব্যগ্রভাবে উত্তর করিলেন—আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ?... .....তিনি আমাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদের নিকট যাইতে বলিলেন। প্রচলিত পৌত্তলিকতায় রাধাপ্রসাদের কোন আপত্তি ছিলো না। সুতরাং তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।" (মহর্ষির আত্মজীবনী) রামমোহনের পুত্র ও ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাষ্টী রাধাপ্রসাদের ধর্মবিশ্বাস কি জাতীয় ছিলো তা মহর্ষির লেখা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। এরকম ক্ষেত্রে রামমোহন প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেছিলেন একথা বলা কি যুক্তি-সঙ্গত?

রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের স্রষ্টা এই যাঁদের মত তাঁরা তার প্রমাণ স্বরূপ দেখান যে মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায় ও 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তিকায় রামমোহন 'ব্রহ্মের কর্তব্য' নির্দেশ করেছেন। কিন্তু তাঁদের মত প্রতিষ্ঠার ব্যগ্রতায় তাঁরা এড়িয়ে গেছেন যে সেই 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তিকাতে রামমোহন লিখেছেন—"সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি তাবৎকালে ব্রাহ্মদের এইরূপ অনুষ্ঠান ছিল।"

এর থেকেই সুস্পষ্ট যে রামমোহনের আদর্শ তাঁর কালের একটি বিশেষ ধর্মগোষ্টীভুক্ত লোকদের চৌহদ্দির মধ্যে 'ব্রাহ্ম' নামটি সীমাবদ্ধ করে নি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী থেকে আমরা জানতে পারি যে "তখন ব্রাহ্ম সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনাতে আসিয়া যাঁহারা বসিতেন, তাঁহারা অন্যত্র প্রতিমা পূজা হইতে বিরত থাকিতেন না। তাঁহারা এই বিশেষ অর্থে 'ব্রাহ্ম' বলিয়া চিহ্নিত হইবার যোগ্য ছিলেন না, এবং সম্ভবতঃ এই বিশেষ অর্থটি (একমাত্র ব্রহ্মের উপাসক) জানিতেন না।"

বিদ্যাবাগীশের সময় ব্রাহ্মসমাজ ও তার ধর্ম সম্বন্ধে অতি অস্পষ্ট ধারণা চল্‌তি ছিলো। তখন ব্রাহ্ম বলে কোনো সম্প্রদায়ের সূত্রপাত হয় নি। একটি সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা বহু পরে অনুভব করা হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন যে রামমোহনের সময় "যে কোনো ধর্মের লোক হউক, এই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবে।.........তাঁহার এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্য ক্রমে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিবার আবশ্যক হইল। ক্রমে দেখা গেল যে ব্রহ্মোপাসনা কেবল এই ব্রাহ্মসমাজ গৃহের চতুষ্পার্শ্বের প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ করিলে হইবে না— তাহা মনুষ্যের হৃদয়ে বদ্ধ করিতে হইবে, মনুষ্যের জীবনে প্রকাশ করিতে হইবে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম-ব্রত সংস্থাপন করিবার আবশ্যক হইল এবং উক্ত ব্রত গ্রহণের নিমিত্তে কতিপয় প্রতিজ্ঞা ধার্য হইল। যাঁহারা উক্ত প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম—ব্রত গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম নামে খ্যাত হইলেন।" (ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসর)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্মদের জন্য চারটি ব্রাহ্মধর্মবীজ নির্ণয় করেন ও ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে

ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ সংকলন করেন যে ধর্মগ্রন্থ অনুসারে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের সাতই পৌষ মহর্ষিদেব নিজে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্মের এই প্রথম দীক্ষা।

মহর্ষিদেবের এই দীক্ষা সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লেখেন—"এই দিনের পর হইতেই ব্রাহ্মসমাজ এক ধর্মের....প্রকৃতপক্ষে একটি 'সমাজ' হইল; ইহার পূর্বে কেবল উপাসনার সময়ে কতকগুলি লোক একত্র আসিয়া বসিত মাত্র।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন—"ব্রাহ্ম সমাজের কেহ কোন একটা ধর্মভাবে বদ্ধ নাই। সমাজে জোয়ার ভাঁটার ন্যায় কত লোক আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কেহই এক ধর্মসূত্রে গ্রথিত নাই। কাহাকে আমরা ব্রহ্মোপাসক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি?"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলছেন—"লোক বাছা আবশ্যক। কেহ বা যথার্থ উপাসনা করিতে আগমন করে, কেহ বা লক্ষ্যশূন্য হইয়া আইসে—কাহাকে আমরা আমাদের বলিতে পারি? এই আন্দোলন হইয়া স্থির হইল—**যাঁহারা প্রতিজ্ঞাপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাই ব্রহ্ম হইবেন**। যখন ব্রাহ্মসমাজ আছে, তখন তাহার প্রতি সভ্যের ব্রাহ্ম হওয়া চাই। যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর করিবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন।" (ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসর)

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের সাতই পৌষ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উত্তরে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বলেন, "রামমোহন রায়ের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তিনি তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এতদিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল।" (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী—নবম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৮৫, তৃতীয় সংস্করণ, বিশ্বভারতী)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিতকার অজিতকুমার চক্রবর্তীর মতে এটি রামমোহনের ইচ্ছা পূর্ণ নয়, এটি বিদ্যাবাগীশের ইচ্ছা ছিলো। অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখছেন—"রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডীড পড়িলে বেশ দেখা যায় যে তিনি ব্রাহ্মসমাজকে বা ব্রহ্মসভাকে একেশ্বরবাদীদের একটা উপাসনা-মন্দিরের মত দাঁড় করাইয়া গিয়াছেন। তাহাতে হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান সকলেই যোগ দিতে পারিত। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মকে বিধির মত গ্রহণ করিয়া একদল লোক একটা নূতন ধর্ম সম্প্রদায় সৃজন করিয়া তোলে, এমন কোন চেষ্টা রামমোহন অবলম্বন করেন নাই। বিদ্যাবাগীশের মনে কিন্তু এই ইচ্ছা ছিল। অথচ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের আগে (প্রথম দীক্ষাগ্রহণ) তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।"

অজিতকুমার চক্রবর্তী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন—"১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন না বলিয়া ব্রহ্মোপাসনার জন্য এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিলেই সঙ্গত হয়।" (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত)

আমার যা প্রতিপাদ্য সেটি হচ্ছে এই যে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড যাত্রার কাল পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজ বলে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিলো না। তখন যে প্রতিষ্ঠানটি ছিলো সেটি হচ্ছে রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম-সভা। ব্রহ্মসভা ব্রাহ্ম-সমাজ হয়ে দাঁড়ায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, আর এই নাম পরিবর্তনের জন্যে দায়ী হচ্ছেন পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তিনি শুধু নামই পরিবর্তন করেন নি তিনি এই প্রতিষ্ঠানের মূল ধারণাকেও পরিবর্তিত করেছিলেন। যথা স্থানে তার আলোচনা করবো। এই গেলো রামমোহন প্রতিষ্ঠিত-ব্রাহ্মসমাজ-

মতাবলম্বীদের প্রথম যুক্তির উত্তর।

এবারে তাঁদের দ্বিতীয় যুক্তিটির আলোচনা করা যাক।

দ্বিতীয় যুক্তি—১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কমললোচন বসুর বাড়ি ভাড়া করে যখন ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত হোলো তখন সেই ব্রহ্মসভাতে প্রতি সপ্তাহে প্রথমে বুধবার বুধবার, তারপরে শনিবার শনিবার পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের ব্যাখ্যান প্রদান করতেন। সেই ব্যাখ্যানগুলি পরে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। তার আখ্যানপত্রে মুদ্রিত আছে—শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা কর্তৃক। ব্রাহ্ম সমাজ। কলিকাতা। বুধবার ৬ই ভাদ্র শকাব্দ ১৭৫০। অতএব রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত-ব্রাহ্মসমাজ-মতাবলম্বীদের মতে এর থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে ১৮৫০ শকাব্দে (১৮২৮ খৃষ্টাব্দ) রামমোহন রায়ের উপস্থিতিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বীকার করতেই হবে যে এই দ্বিতীয় যুক্তিটি খুব জোরালো যুক্তি। এটা যদি প্রমাণিত হয় যে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কমললোচন বসুর বাড়িতে যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় তার নাম ছিলো ব্রাহ্মসমাজ, তাহোলে সকল বিতর্কের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। তাহোলে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকেই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ কথা মানা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আর যে প্রমাণ তাঁরা উপস্থিত করেছেন সে প্রমাণ খুবই জবরদস্ত প্রমাণ। কমল বসুর বাড়িতে যে সাপ্তাহিক সভা বসতো, প্রথমে বুধবার, বুধবার, পরে শনিবার শনিবার, সেই সভাতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যে ধর্মীয় উপদেশ দিতেন তার প্রত্যেকটি বক্তৃতা পরে পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। আর প্রত্যেকটি পুস্তিকার উপরেই 'ব্রাহ্মসমাজ' কথাটি মুদ্রিত আছে। আর দিন ও তারিখ প্রতিটি পুস্তিকার উপর লেখা আছে। তাই সন্দেহের অবকাশ নেই, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকেই ব্রাহ্মসমাজ চলে আস্ছে, আর রামমোহনই এর স্রষ্টা। এখন এই যুক্তির সমর্থনে যে প্রমাণটি হাজির করেছেন রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত-ব্রাহ্মসমাজ-মতাবলম্বীরা সেই প্রমাণটিকে যাচাই করে দেখা যাক। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রতি সপ্তাহে ধর্মের ব্যাখ্যান করতেন কমল বসুর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত একেশ্বরবাদী প্রতিষ্ঠানে। ইচ্ছে করেই এই প্রতিষ্ঠানটিকে কোনো নাম দিতে আপাতত বিরত থাকলুম। প্রতিটি বক্তৃতা একটি পুস্তিকা করে পরে বের করা হয়। এরকম অন্তত ঊনসপ্ততি ব্যাখ্যান পণ্ডিত রামচন্দ্র দিয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। প্রত্যেকটি পুস্তিকার উপরে ব্রাহ্মসমাজ কথাটি এবং তারিখ ও শক মুদ্রিত আছে। কিন্তু এই তারিখ ও শক কিসের নির্দেশক? এটি কি যখন মুদ্রিত হোলো তার নির্দেশক? না, সেটা আদবেই তা নয়। কবে কোন তারিখে বক্তৃতাটি দেওয়া হয়েছে, সেই তারিখ ও সন পুস্তিকাগুলির উপরে লিখিত আছে। যেমন, প্রথম পুস্তিকার উপরে লেখা আছে বুধবার ৬ ভাদ্র শকাব্দা ১৭৫০, দ্বিতীয় পুস্তিকার উপরে—বুধবার, ১৩ ভাদ্র, শকাব্দা ১৭৫০, তৃতীয় পুস্তিকার উপরে—বুধবার, ২০ভাদ্র, শকাব্দা ১৭৫০, চতুর্থ ব্যাখ্যানের উপরে—বুধবার, ৩০ ভাদ্র, শকাব্দা ১৭৫০, পঞ্চম ব্যাখ্যানের উপর—শনিবার, ৭ই আশ্বিন, শকাব্দা ১৭৫০, ষষ্ঠ ব্যাখ্যানের উপর—শনিবার ১৩ই আশ্বিন, শকাব্দা ১৭৫০, সপ্তম ব্যাখ্যানের উপর—শনিবার, ২০ আশ্বিন, শকাব্দা ১৭৫০, অষ্টম ব্যাখ্যানের উপর, শনিবার, ২৭শে আশ্বিন, শকাব্দা ১৭৫০, নবম ব্যাখ্যানের উপরে শনিবার ১০ কার্তিক, শকাব্দা ১৭৫০ আর দশম ব্যাখ্যানের উপর—শনিবার, ১৭ কার্ত্তিক শকাব্দা ১৭৫০। এগুলি হচ্ছে বক্তৃতাগুলি যে যে তারিখে দেওয়া হয়েছে সেই দিনগুলি। যেমন ঊনসপ্ততি ব্যাখ্যানের মলাটে লেখা রয়েছে—শনিবার, ১১ই

মাঘ, শকাব্দা ১৭৫১। অতএব এই তারিখ ও সাল পুস্তিকাগুলি কবে কবে ছাপানো হয়েছে তার কোনো প্রমাণ আমাদের সামনে হাজির করে না। বক্তৃতাগুলি কোন কোন তারিখে দেওয়া হয়েছে শুধু সেইটি আমাদের জানিয়ে দেয়। এই পুস্তিকাগুলিতে লেখা নেই যে কোন প্রেস থেকে কবে ছাপা হয়েছে ব্যাখ্যানগুলি। সেটি থাকলে বইগুলি কবে ছাপানো হয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারতুম। আর প্রেসলাইন যে তখন থেকে চালু হয়ে গেছে তাঁর প্রমাণ আমরা আর একটি আরো আগে ছাপা বই থেকে পাই। বইটি হচ্ছে, পথ্যপ্রদান "Medicine for the sick" "লেখক হচ্ছেন একজন" who laments his inability to perform all righteousness." বইটির মলাটে ইংরিজী ও বাংলাতে বইটি কোন প্রেস থেকে কোন সালে ছাপা হোলো তা লেখা আছে—"সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দা ১৭৪৫। Printed at thc Sungscrit Press 1823.

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়-দত্ত ব্যাখ্যান-পুস্তিকাগুলির মলাটের প্রথম পৃষ্ঠায় বক্তৃতার তারিখ ও সাল দুই-ই পাচ্ছি কিন্তু মুদ্রণের তারিখ ও সাল পাচ্ছি না। সেটি পেলে তবে বোঝা যেতো যে পুস্তিকাগুলির উপরে যে 'ব্রাহ্মসমাজ' কথাটি লেখা আছে সেটি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুদ্রিত পুস্তিকাগুলির উপরে লিখিত না ১২৩০ খৃষ্টাব্দের পরে ছাপানো পুস্তিকাগুলির প্রচ্ছদপটে লিখিত। সেটি বোঝবার কোনো উপায় আপাতত নেই। এই ব্যাখ্যানগুলির প্রথম ব্যাখ্যান থেকে সপ্তদশ ব্যাখ্যান নিয়ে ১৭৫৮ শকে (১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে) একটি দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়। সেই সংস্করণটির একটি কপি লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। তাতে হয়তো প্রথম সংস্করণ কবে ছাপা হয়েছিল সে কথার উল্লেখ থাকতে পারে। কিন্তু যে ব্যাখ্যান পুস্তিকাগুলিকে প্রমাণ স্বরূপ হাজির করেছেন রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত-ব্রাহ্মসমাজ-মতাবলম্বীরা সেই পুস্তিকাগুলির আখ্যাপত্রে মুদ্রিত 'ব্রাহ্মসমাজ' এবং তারিখ ও শকাব্দ থেকে এটা আদবেই প্রমাণিত হয় না যে ব্রাহ্মসমাজ ১৮২৮ থেকে ১৮৩০ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত-ব্রাহ্মসমাজ-মতাবলম্বীদের তৃতীয় ও শেষ যুক্তি হচ্ছে এই যে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে রামমোহন তাঁর পুত্র রাধাপ্রসাদকে যে চিঠি লেখেন তার একজায়গায় রামমোহন লিখেছেন—"এই অবকাশ ব্রাহ্মসমাজের কাজের নিমিত্ত এক গীত পাঠাইতেছি।" এঁদের মতে এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে রামমোহনের সময় ব্রাহ্মসমাজ হয়েছিলো। কিন্তু ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা এই চিঠিতে যেমন ব্রাহ্মসমাজ কথাটির উল্লেখ আছে, তেমনি উল্লেখ আছে ব্রহ্মসভা কথাটির। রামমোহন লিখছেন—"ব্রহ্মসভার কিরূপ নির্ব্বাহ হইতেছে লিখিবে।" যাঁরা এই চিঠির নজির দেন তাঁরা চিঠির এই অংশটুকু উদ্ধৃত করলেন না কেন জানি নে। ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই ধরণের বিস্মরণ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। তাছাড়া বিতর্কের বস্তুটিকে বার বার বদল করে নিলে তো চলে না। বিষয়টি আলেয়ার মতো পিছল ও অ-ধরা হলে আর বহুরূপীর মতো রঙ-বদলানোর খেলোয়াড় হলে সব গবেষণা বানচাল হয়ে যেতে বাধ্য। বিতর্কের বস্তু তো এটি নয় যে রামমোহন বেঁচে থাকতে থাকতে ব্রাহ্মসমাজ হয়েছিলো কিনা। বিতর্কের বস্তু হচ্ছে এই যে রামমোহন নিজে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কি করেন নি আর তিনি ভারতবর্ষ ছাড়বার আগে পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ বলে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছিলো, না হয়নি। আমার মতে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ নামক কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন

নি, তিনি ব্রহ্মসভা স্থাপন করেছিলেন আর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি পর্যন্ত অর্থাৎ কিনা তাঁর ভারত ত্যাগের কাল পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ নামক কোনো প্রতিষ্ঠান এদেশে ছিলো না। রামমোহনের চলে যাওয়ার পরে ব্রাহ্মসমাজ নামটি দিয়ে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ব্রহ্মসভার উদার বিশ্বজনীনতাকে খর্ব করে ব্রাহ্মসমাজ নামে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয়। আমি আগেই বলেছি যে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্রহ্মসভা ব্রাহ্মসমাজ রূপে পরিবর্তিত হয় আর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই পরিবর্তনটি সাধন করেন। তিনিই 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম' ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম বলে প্রচার করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত 'বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম' বলে কোনো ধর্মের অস্তিত্ব ছিলো না। রামমোহন বৈদান্তিক ছিলেন না। সেকালের প্রসিদ্ধ লেখক ও সাংবাদিক কিশোরী চাঁদ মিত্র 'ক্যালক্যাটা রিভিউ' পত্রিকায় লেখেন—

"It was his (Rsmmohun's) system to avoid so far identifying himself with any religious body as to mske himself answerable for their acts and opinions. We would go further and say, though it may startle and scarify the Bramhos of the old regime, that *he was not a Vedantist.*"

অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানে সে কথা অতি সুস্পষ্ট করে বলেন—"যে সকল ব্যক্তি সে সময়ে তাঁহার (রামমোহনের—লেখক) মতের অনুবর্তী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, সকলেই প্রায় বেদান্তনুগত ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, রামমোহন রায়ের ন্যায় শাস্ত্র-নিরেপক্ষ যুক্তি-পথাবলম্বী ব্রাহ্ম ছিলেন না। ....যদিও তিনি এতদ্দেশে স্বীয় মত সংস্থাপনার্থ সমগ্র শাস্ত্র হইতে এবং বিশেষতঃ বেদান্ত শাস্ত্র হইতে প্রমাণপুঞ্জ সংকলন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে বাস্তবিক বৈদান্তিক ছিলেন না, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন, ইহাতে সংশয় হইবার বিষয় নাই........... রামমোহন রায় আপনার অভিপ্রায় গোপন রাখেন নাই। .....তিনি ভারতবর্ষের তৎকালবর্তী শাসনকর্তাকে এক পত্র লিখিয়া এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি সেই পত্রে ইংলণ্ডীয় ভাষায় অশেষ বিধ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান করা নিতান্ত কর্তব্য বলিয়া বেদান্তাদি কতিপয় শাস্ত্রের কাল্পনিক মতের অপকর্ষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেই পত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছেন ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্ত নানা প্রকার মনঃকল্পিত ভাবে পরিপূর্ণ; অতএব তৎসমুদয়ের অধ্যয়নে তাদৃশ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক।)

রামমোহন বৈদান্তিক ছিলেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট অংশে পাই—"রামমোহন রায় বেদান্তকে স্বীয় ধর্মমত প্রচারের সাহায্যের জন্য ব্যবহার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বেদান্তের নামে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত সমুদয় মতকে সমগ্রভাবে কখনই গ্রহণ করেন নাই। যে অদ্বৈতবাদে উপাসনা অসম্ভব.....মায়াবাদ.........সন্ন্যাসবাদ..... তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে রামমোহন কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। এই প্রচলিত বেদান্তবাদের মতে ব্যক্তিগত উপাসনাই অসম্ভব, রামমোহনের প্রবর্তিত সামাজিক উপাসনা তো আরও অসম্ভব। (সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী—ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস)

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখছেন—"রামচন্দ্র বিশ্বাস করিতে ও প্রচার করিতে লাগিলেন যে (১)বেদ অপৌরুষেয়, অতএব নিত্য এবং অভ্রান্ত—এবং (২) বেদান্ত অনুসরণ করিয়া

পরমাত্মা এমং জীবাত্মার অভেদ চিন্তনই মুখ্য উপাসনা। দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; তথাপি তিনি বিদ্যাবাগীশের প্রবন্ধের অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক উক্তি সকলের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।"

রামমোহন যে বৈদান্তিক ছিলেন, কারো কারো মতে সেটির প্রমাণ পাওয়া যায় মৃত্যুকালে যে তিনি ওঁ উচ্চারণ করেন তার থেকে। কিন্তু শুধু মৃত্যুকালে কেন, তাঁর সাধনায় ওঁকার জপ সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল।

কিন্তু ওঙ্কার তো একমাত্র বৈদান্তিক সাধনার অঙ্গ নয়, ঔপনিষদিক ও বহু অন্যান্য দ্বৈতবাদী, বিশেষত ভাগবতধর্মী সাধনারও অঙ্গ। এক কথায় সমগ্র হিন্দু ধর্মচেতনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

রামমোহন মায়াবাদীদের—নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম, পর ব্রহ্ম, অপর ব্রহ্ম—এই ব্রহ্মবিভাগ-মতে একেবারেই বিশ্বাসী ছিলেন না।

জ্ঞানের উদয় হলে অপর ব্রহ্ম মরীচিকার মতো বিনাশ প্রাপ্ত হয়—"জ্ঞানোদয়ে মায়ামরীচিকাবৎ বিনাশশীল।" রামমোহন সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন যিনি এই পৃথিবীর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্তা। এই ভগবানকে সমাধির দ্বারা পাওয়া যায় কিন্তু এই সমাধি সেই অবস্থা নয় যাতে নিজের সম্বন্ধে কিম্বা কোনো বস্তু সম্বন্ধে কোনো চেতনা থাকে না। এই জড়বৎ অবস্থাকে রামমোহন সমাধি বলে স্বীকার করতেন না ও তাঁর একেবারেই বিশ্বাস ছিলো না এই ধরণের সমাধিতে। জড়বৎ অচেতন অবস্থা যাকে সাধারণত সমাধি বলা হয় তার বিরুদ্ধে ছান্দোগ্যোপনিষদ বলেছেন—রামমোহনের মতে সমাধি হচ্ছে সেই অবস্থা যে অবস্থায় ব্যক্তি ভগবানকে সর্বভূতে দেখতে পায়।

শঙ্করাচার্য যে অর্থে 'মায়া' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন 'মায়া'-র সেই অর্থ রামমোহন মেনে নেন নি। রামমোহনের মতে 'মায়া' হচ্ছে ভগবানের সৃজনী শক্তি ও তাঁর সৃষ্টি। ভগবানের সৃষ্টি-শক্তি ও ইচ্ছা-শক্তি হচ্ছে মায়া। ভগবান ইচ্ছাকৃত ভাবে সব সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি তাঁর লীলা-খেলা নয়, কিম্বা তাঁর সন্তানদের ম্যাজিক দেখাবার জন্যে মায়ার সৃষ্টি নয়। পৃথিবী ভগবান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, এই ধারণা পৃথিবীকে অসত্য করে—এই ছিলো রামমোহনের ধারণা। বেদান্তের ধারণা হচ্ছে—পরমাত্মা হি সংসারমায়য়া নসংস্পৃশ্যতে।' রামমোহনের ধারণায় পৃথিবী ঈশ্বরেতে আছে তাই পৃথিবী সত্য। ঈশ্বর থেকে পৃথক হলে অসত্য। যেমন ভগবান সত্য তেমনি পৃথিবীও সত্য। পৃথিবীর সঙ্গে ভগবানের যোগ নেই এই ধারণা রামমোহনের মতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে ও আমাদের শক্তির উৎসকে শুকিয়ে দেয়। এই ধারণা ভগবানের উপাসনা ও আমাদের সামাজিক কর্তব্য—এদের আলাদা করে দিয়েছে। ভগবানের পূজা করলে আর সামাজিক কর্তব্য নেই, সামাজিক কর্তব্য করলে ভগবানের পূজা হয় না। রামমোহন ভগবৎ উপাসনা ও সামাজিক কর্তব্য এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। রামমোহনের মতে এই পৃথিবী ও জীবাত্মা ভগবানের প্রকাশ-ভূমি আর ভগবৎ-উপলব্ধি জীবাত্মার বিনাশে নয়—জীবাত্মার ক্রমিক বিকাশে। প্রার্থনার দ্বারা ভগবৎ-শক্তি আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

ভগবান কি করে পৃথিবী সৃষ্টি করলেন—শূন্য থেকে? রামমোহন এই মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করেন। তাঁর মতে এই ধারণা হচ্ছে সহজ-বুদ্ধি-বিরুদ্ধ ও যুক্তি-বিরুদ্ধ। রামমোহনের মতে পৃথিবী প্রথমে ভগবানের মধ্যে ছিলো, পরে সৃষ্টির পরবর্তীকালে ভগবান পৃথিবীকে

পোষণ করেন। পৃথিবী তাই বলে ভগবান নয়। ভগবান পৃথিবীর মধ্যে আছেন ও পৃথিবীকে ছাপিয়েও আছেন। রামমোহন এইভাবে dualism ও pantheisim কে খণ্ডন করেন।

রামমোহন কর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন ও কখনো কর্ম ত্যাগ করতে বলেন নি। এমন কি জীবন-মুক্তের জন্যেও কর্মের প্রয়োজন আছে। মায়াবাদীদের মতে ব্রহ্মলাভের জন্যে পৃথিবী ও জীবাত্মা—এই দুইকে ভুলতে হবে। রামমোহন এটা আদবেই মানতেন না। তিনি সন্ন্যাসকে মুক্তির একমাত্র পন্থা বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে সংসার ত্যাগ করবার দরকার নেই—ব্যক্তিকে সামাজিক কর্তব্য পালন করতে হবে।

রামমোহনের মতে একটি বস্তুর অস্তিত্ব গুণের উপর নির্ভর করে, যেমন গুণের অস্তিত্ব বস্তুর উপর নির্ভর করে—বস্তু গুণের আগে—রামমোহনের মতে এইটে হচ্ছে 'logical priority'।

রামমোহনের মূল আদর্শ ছিলো সুদৃঢ় ভিত্তিতে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা। হিন্দুদের মধ্যে একেশ্বরবাদ-প্রতিষ্ঠা হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে দিয়েই প্রমাণ করবেন—এই ছিলো রামমোহনের সঙ্কল্প। একেশ্বরবাদের সাধনা হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে এই ছিলো রামমোহনের নিঃসংশয় ধারণা। এই জন্যেই তিনি একেশ্বরবাদের স্বপক্ষে বেদান্ত ও অন্য শাস্ত্র-বাক্য তাঁর রচনায় উদ্ধৃত করেছেন—তিনি বৈদান্তিক ছিলেন সে কারণে নয়। রামমোহন শংকরের বৈদান্তিক মতে আস্থাবান ছিলেন না। ডিগ্‌বী-কে রামমোহন লেখেন—"I translate their most revered theological work, namely Vedant in Bengali and Hindusthani in *order to convince them* that unity of God, and absurdity of idolatry, are evidently pointed out *by their own Scriptures*"

রামমোহনের এই কথাগুলি থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে তাঁর রচনায় বেদান্তের উদাহরণ হিন্দুশাস্ত্রের মধ্য দিয়েই একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, ব্রহ্মসভা'-কে বেদান্তের মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে একেবারেই নয়। শাস্ত্রের প্রমাণ ছাড়া প্রতীক-পূজায় বিশ্বাসীদের কুসংস্কার দূর করা দূরে থাকুক কুসংস্কারের ভিত্ কিছুটা নড়ানোও সম্ভব নয়। তাই প্রখর-বাস্তব-বুদ্ধি-সম্পন্ন রামমোহন বারবার বেদান্তের নজির দিয়েছেন তাঁর রচনায়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তাঁর 'Brahminical magazine'-এর চতুর্থ সংখ্যায় রামমোহন লেখেন—"In conformity with the precepts of our ancient religion, contained in the holy Vedant etc etc".

এই বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন—"তিনি (চন্দ্রশেখর বসু—লেখক) রামমোহন রায়কে যে রূপ বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার যে সমস্ত কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা দেখিলে আপাতত অনেকেরই ভ্রম হইবে যে রামমোহন রায় একজন অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং হিন্দুশাস্ত্রের সকল প্রকার মতে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। এই ভ্রমটি দূর করা আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ....তিনি (রামমোহন—লেখক) অগাধশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য একেশ্বরবাদ স্থাপন। এই প্রসঙ্গে তিনি তর্কের মুখে প্রতিপোষক বাক্য শাস্ত্রের মধ্যে যেখানে যাহা পাইয়াছেন তাহাই উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় বচন পাঠমাত্রেই বোধ হইবে যে হিন্দুশাস্ত্রের সকল কথাতেই তিনি বিশ্বাস করতেন। বাস্তব তাহা নহে।.......এস্থলে একটি কথা বলা বিশেষ আবশ্যক। যখন তাঁহার সহিত সর্বসাধারণের ঘোরতর শাস্ত্রীয় বিচার হয় তখন তিনি আপনাকে কুত্রাপি ব্যক্ত করেন

নাই। যা কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন সমস্তই শাস্ত্র। এইগুলি ধরিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে অবশ্যই ঘোর বৈদান্তিক বোধ হইবে। কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার আপনাকে ব্যক্ত করা আবশ্যক ছিল। তাহা আলোচনা করিলে তিনি যে কি ছিলেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি লর্ড বেণ্টিংকের সময় যখন শিক্ষা সমিতিকে পত্র লিখেন তাহাতে স্পষ্ট বলিয়াছেন বেদান্তদর্শন এদেশের যথেষ্ট অপকার করিয়াছে.........যাক্ রামমোহন রায় যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন না তাহার প্রমাণ আছে।.....জীব ব্রহ্মের একমতে বিশ্বাস থাকিলে উপাস্য উপাসক ভাবের আর স্থান থাকে না। কিন্তু রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজে এই বিসম্বাদী পদার্থের আবার অবতারণা কেন? (ধর্মপ্রচারক ও মহাত্মা রামমোহন রায়—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ, ১৮০৮ শক) অক্ষয়কুমার দত্ত ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই দুই বিখ্যাত চিন্তাবিদদের মন্তব্য থেকে এইটেই সুস্পষ্ট হচ্ছে যে রামমোহন বৈদান্তিক ছিলেন না। অতএব তিনি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য-ধর্ম এই ধারণার জনক কখনই নন। কে তাহলে এই ধারণাটিকে **ব্রাহ্মসমাজের** মূল ধারণা করে চালিয়ে দিলো? তার সন্ধানে এবার বের হওয়া যাক। ১৮০৮ শকের শ্রাবণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'ব্রাহ্মসমাজ ও ইহার অতীত ও বর্তমান' নামক প্রবন্ধের রচয়িতা লেখেন—"রামমোহন রায়ের অবলম্বন প্রধানত বেদ ও বেদান্ত। নিতান্তই বেদের প্রামাণিকতা এই বিশ্বাস তৎকালে লোকের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট ছিল। কিন্তু রামমোহন রায়ের কার্যপ্রণালী পর্যালোচনা করিলে কিছুতেই বোধ হয় না যে তিনি এই সাধারণ বিশ্বাসের অনুকরণ করিয়াছেন। তথাচ তিনি যখন দেশ কাল পাত্রের অনুরোধে এই বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়া যান, তখন লোকের মনে বেদের নিত্যতার উপর বিশ্বাস অটল ছিল। তাঁহার লক্ষ্য যেকোন রূপে হউক দেশব্যাপী উপধর্ম নির্মূল করিতে হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন ধর্ম উন্নত না হইলে নির্জীব হিন্দুসমাজে পুনরায় সজীবতা আসিবে না। লোকে বেদকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করুক আর নাই করুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। বেদ-প্রমাণে যদি একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমানে এইটুকুই পরম লাভ। সম্ভবত তিনি এই জন্য বেদের উপর কোনরূপ আঘাত করিতে নিরস্ত ছিলেন। কিন্তু এদিকে তাঁহার সহযোগী সুপণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজে যে সকল উপদেশ দেন তাহা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি শঙ্করের ন্যায় বেদ ও অনুভবকে ঈশ্বরসিদ্ধির প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপদেশের স্থানে স্থানে স্পষ্টাক্ষরে এই কথাও আছে যে মনুষ্য চরমে ঈশ্বরে লীন হয়। বিদ্যাবাগীশ প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে শিক্ষা রামমোহন রায়কে স্বাধীন বুদ্ধি দিয়েছিল কিছু দিন পূর্বের ব্রাহ্মণপণ্ডিতে সেই রূপ শিক্ষা ছিল না। ফলত তিনি যে একজন বৈদান্তিক ছিলেন সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হয় না। এই বেদান্তবিৎ পণ্ডিত যে উপদেশ ও আলাপে লোকের মনে বেদের নিত্যতা ও বৈদান্তিক ধর্মের শ্রেষ্ঠতা দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া যান এই বিষয়ে তাঁহার শাস্ত্র ব্যাখ্যানই প্রমাণ। যাহাই হউক বেদ নিত্য এবং ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম বৈদান্তিক ধর্ম ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ইতিহাসে যে এই কথা পাঠ করা যায় সম্ভবত এইটুকুই তাহার মূল।"

'বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম' এটি ব্রাহ্মসমাজের ধারণা-কেন্দ্রে কে এনে হাজির করেছিলেন সেটি একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেলো। প্রবন্ধকার স্পষ্টভাবে বলেছেন যে রামমোহনের মৃত্যুর পরে অর্থাৎ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজের ধর্মকে বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম বলে ঘোষণা করেছেন। রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভার অসাম্প্রদায়িক

সমন্বয়ী সাধনার জায়গা নিলো একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্মমত। এই ধর্মমতকে ব্রহ্মসভার কেন্দ্রে বসাবার প্রচেষ্টার সঙ্গে ব্রহ্মসভাকে ব্রাহ্মসমাজে পরিণত করার ইতিহাস অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। সকল ধর্মের একেশ্বরবাদীদের মিলন-ক্ষেত্র রচনা করতে চেয়েছিলেন রামমোহন। কোনো বিশেষ ধর্মের লোকদের জন্যে সমাজ পত্তন করা তাঁর বিশ্বস্পর্শী চিন্তার প্রত্যন্তসীমাকেও স্পর্শ করে নি। কিশোরীচাঁদ মিত্র ঠিকই বলেছেন—

"......He belonged to no existing sect, nor did he seek to inaugurate a new system of religion. The great ambition of his life was to promote love to God and love to men. This he tried to effect but bringing together men of existing persuasions, irrespective of all distinctions of colour and creed into a system of universal worship of the One True and Living God...... It is therefore, manifest that what Rammohun Roy wanted was not unity of creed or the creation of a separate religious community like that of the Brahmos, but to spread monotheistic worship to establish a universal church where all classes of people,—Hindus, Mahomedans, and Christians,—would be all alike welcome to unite in the worship of their supreme and common Father." (Calcutta Review)

তাছাড়া একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে গেলে যা যা করা উচিত রামমোহন তার একটিও করেন নি। রাজনারায়ণ বসুর মতে— "ধর্ম-সম্প্রদায়ের যে সকল প্রয়োজন তন্মধ্যে তিনটি প্রধান প্রয়োজন রামমোহন রায়ের সময় সিদ্ধ হয় নাই। প্রথমতঃ উপাসনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল না; কেবল উপনিষদের শ্লোক ও বেদান্ত-সূত্র সকলের ব্যাখ্যা হইত। দ্বিতীয়তঃ তখন ব্রাহ্ম-দল বলিয়া দল-বদ্ধ কোনো সম্প্রদায় ছিল না; তখন প্রতিজ্ঞাপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবার রীতি ছিল না। তৃতীয়তঃ আত্ম-প্রত্যয়-মূলক সত্য; যাহা সকল ধর্মের মূলে নিহিত আছে;যাহা তর্ক-তরঙ্গ দ্বারা কখনই আন্দোলিত ও নিরস্ত হইতে পারে না ও যাহা সকল মনুষ্যের হৃদয়ে নিত্যকাল বিরাজমান আছে; এক্ষণে যেমন সেই আত্মপ্রত্যয়মূলক সত্যের উপরে ব্রাহ্মধর্মকে স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, ও রূপ তখন ছিল না।"

(ব্রাহ্মধর্মের ইতিবৃত্ত এবং লক্ষণ—রাজনারায়ণ বসু)

আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মদের সাধারণ সভায় ১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দের (১৭৮২ শক) পৌষ মাসে রাজনারায়ণ বসু এই ভাষণ দেন। এই ভাষণের এক জায়গায় বলেন—

এই প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে দেন 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র সংস্থাপক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজনারায়ণ বসু লিখছেন—" 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র সংস্থাপক মহাশয় স্থির-নিশ্চয় হইলেন যে এইসকল গ্রন্থের (অর্থাৎ বেদ ও উপনিষদের—সৌম্যেন্দ্রনাথ) সকল বাক্যকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। **অতএব তিনি স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থ সংকলন করিয়া প্রকাশ করিলেন। সেই আমাদের বর্তমান ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ।** ইহার প্রথম খণ্ডে উপনিষদ হইতে সংগৃহীত প্রাচীন ঋষিদিগের প্রোক্ত ঈশ্বর-বিষয়ক যে-সকল বাক্য আছে ইত্যাদি.......**ব্রাহ্মধর্মের দ্বিতীয় খণ্ড.........ইহাতে ব্রাহ্মদিগের অতি কর্তব্য সংসারকর্ম নির্বাহের সুন্দর উপদেশ বাক্যসকল আছে।**"

এই পুস্তিকার আর এক জায়গায় রাজনারায়ণ বসু লিখছেন—"**১৭৭২ শকে (১৮৫০ খ্রীঃ) ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়**। রামমোহন রায়ের সময়ে যে তিনটি অভাব ছিল, তাহা ক্রমে মোচন হইল।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যদিও ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ-সংকলন করেন ১৮৪১খৃষ্টাব্দে ও ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করেন, ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থটি কিন্তু প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে। রামমোহন রায় তার বহু আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই আলোচনা এখানেই শেষ করা যায়। রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই ধারণা ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি প্রতিষ্ঠিত চল্‌তি কথা ও সাম্প্রদায়িক মনের অভিলাষের উপর। এই প্রসঙ্গে এটিও মনে রাখতে হবে যে ব্রাহ্মধর্ম বলে কোনো ধর্মের উল্লেখ আমরা রামমোহনের সময় পাই না। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সময়েও ব্রাহ্মধর্ম বলে কোনো ধর্ম আত্মপ্রকাশ করে নি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন তখনও ব্রাহ্মধর্ম বলে কোনো ধর্মের অস্তিত্ব নেই। তত্ত্ববোধিনী সভা যে ধর্মের প্রচার করেছিলেন সে ধর্ম ছিল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ-প্রবর্তিত বেদান্ত প্রতিপাদ্যধর্ম। নানা শাস্ত্র থেকে, বিশেষ করে উপনিষদ থেকে বচন সংগ্রহ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামক গ্রন্থ সংকলন করেন ও তার অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে। তাই ১৮৪১ খৃটোব্দের আগে ব্রাহ্মধর্ম বলে কোনো ধর্ম ছিল না। তবে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম যে 'বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম' নয় তার ধর্ম যে ব্রাহ্মধর্ম, এটি ঘেষিত হয় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে। ১৭৮৬ শকের ১১ ই পৌষ তারিখে তত্ত্ববোধিনী সভার একটি অধিবেশনে এই পরিবর্তনটি সাধিত হয়। 'বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম' কথাটি বর্জন করে তার স্থানে ব্রাহ্মধর্ম কথাটি প্রবর্তন করবার প্রস্তাব আনেন রাজনারায়ণ বসু আর সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন অক্ষয়কুমার দত্ত। বলাই বাহুল্য যে তাঁদের এই প্রচেষ্টার পেছনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পূর্ণ সমর্থন ছিল।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করে আমরা তিনটি প্রণিধানযোগ্য ঐতিহাসিক স্তর দেখছি—-

প্রথম স্তর—সব ধর্মের একেশ্বরবাদীদের সমন্বয় সাধনের জন্যে রামমোহন কর্তৃক ব্রহ্মসভার স্থাপনা।

দ্বিতীয় স্তর—রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন এবং 'বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম'-কে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম বলে ঘোষণা। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজ হয়েছে কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম বলে কোনো ধর্মের অস্তিত্ব নেই।

তৃতীয় স্তর—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্রাহ্মধর্ম সৃষ্টি ও ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মধর্মের বনিয়াদের উপর পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত করা।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস এই তিন স্তর দিয়ে রচিত। তার সর্বপ্রথম স্তর হচ্ছে রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভার স্তর। সেই প্রথম স্তরের ঐতিহাসিক-প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও আলোচনাই আমি এই প্রবন্ধে করেছি।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ

যুক্তিবাদ সাম্প্রতিকতার দাবি করলেও সে দাবি টেক্‌সই নয়। যুক্তিবাদ যে এ কালের বিশেষত্ব নয়—তাই তার একালীয়ত্বের দাবি যে যথার্থ নয় তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে। অন্য দেশের কথা নাই বা উল্লেখ করলুম, ভারতবর্ষে বৈদিক যুগের বৈদিক যাগযজ্ঞের বিধি ও অন্যান্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝড় তুলেছিলেন যাঁরা তাঁরা বৈদিক সাহিত্যে ব্রাত্য নামে অভিহিত। আচার-বদ্ধতা ও রীতি-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে ব্রাত্যদের এই বিদ্রোহ বৈদিক যুগে যুক্তিবাদের অস্তিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ দেয়।

তার কয়েক শতাব্দী পরে বৈদিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে ভারত-ইতিহাসের এক অনুপম অধ্যায় রচনা করেছে। যাগযজ্ঞের ও পশুবলির আধ্যাত্মিক যথার্থতার দাবি অস্বীকার ক'রে তার বিরুদ্ধে ও ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির সামাজিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ যে ভাবে রুদ্ধ ক'রে রেখেছিল তার বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব যে বিদ্রোহ শুরু করলেন তা ভাবালুতার উপর নয়, সম্পূর্ণভাবে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অপ্রামাণ্য আধিদৈবিক কারণ দর্শিয়ে কোনো কিছুর যথার্থতা প্রমাণ করবার কোনো চেষ্টা বুদ্ধদেব করেন নি। বৌদ্ধ সাধনার মধ্যে আধিদৈবিক বা অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুর স্থান নেই। মানুষের মনকে কুহেলিকা-মুক্ত ক'রে যুক্তির পথে মুক্তির গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেওয়ার এমন চেষ্টা বৌদ্ধ মতবাদের মতো আর কোনো মতবাদ করে নি।

কালে এই যুক্তিবাদের ধারা নানা ধরনের আধিদৈবিক বালির চরের বিরুদ্ধতায় ক্ষীণ-স্রোত হয়ে পড়লেও, এ ধারা কখনো লুপ্ত হয় নি ভারতবর্ষে।

উপনিষদকার বলেছেন যে, মন ও বুদ্ধি—এ সবই ব্রহ্মলাভের উপায়। অতিপ্রাকৃত পথে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ উপনিষদ স্বীকার করেন নি। ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের নাগালের বাইরে কিম্বা শুধু শাস্ত্রবাক্যের মাহাত্ম্যের জোরে ব্রহ্ম লাভ ঘটবে—উপনিষদের এই মতও অগ্রাহ্য করেছেন। একাত্মপ্রত্যয়সারং— জ্ঞান হচ্ছে নিজের আত্মপ্রত্যয়ের সার। বেদান্ত ও জগৎ কারণরূপে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন।

যোগবশিষ্ট-এর রচয়িতা বলছেন—যুক্তিযুক্তং উপাদেয়ং বচনং বালকাদপি অন্যং তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা— বালক যদি যুক্তিযুক্ত কিছু বলে তা সাদরে গ্রহণীয়, আর স্বয়ং ব্রহ্মা যদি যুক্তিহীন কিছু বলেন তা তৃণের মতো পরিত্যাজ্য।

বৃহস্পতি বলছেন—কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যোর্থ নির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানি প্রজায়তে। কেবল শাস্ত্রের উপর নির্ভর ক'রে কোনো কিছুর অর্থ নির্ণয় করবার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই ধরনের যুক্তিহীন বিচারের পন্থা অবলম্বন করলে ধর্মহানি হয়।

যুক্তিহীনতার পথ ধরলে যে ধর্মহানির আশঙ্কা আছে, এমন অপূর্ব ও সুদীপ্ত বাক্য

ভারতবর্ষের ঋষির মুখ থেকে আমরা শুনেছি। যুক্তিবাদের এর চেয়ে জোরালো সমর্থন আর কি হতে পারে?

ষড়-দর্শনের যুগেও যুক্তিবাদ অস্বীকৃত হয় নি। সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্যে যে পন্থা মীমাংসাকার বাত্‌লে দিয়েছেন সে পন্থাও সম্পূর্ণভাবে যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মীমাংসা দর্শনে বলা হয়েছে যে সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্যে চারটি পৈঁঠা যুক্ত একটি সোপান আছে, সেটি হচ্ছে শাস্ত্র-সন্দেহ-বিচার-সঙ্গতি—এই চারটি ধাপযুক্ত একটি সোপান। একটা কিছুকে নিয়ে তো শুরু করতে হবে সত্যের সন্ধান, তাই শুরু করতে হবে শাস্ত্রের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে। শাস্ত্র আর কিছুই নয়, শাস্ত্র হচ্ছে অতীতের চেতন পুরুষদের জ্ঞানসুদ্ধ উপলব্ধির চয়নিকা। মানুষের কোনো অভিজ্ঞতাই যেমন হেসে উড়িয়ে দেওয়ার বস্তু নয়, ধীর মনে বিচার ক'রে সেটি গ্রহণযোগ্য কিম্বা বর্জনযোগ্য সেটি স্থির করা উচিত, শাস্ত্রবাক্য সম্বন্ধেও সেই একই বিচারশীল মনোভাব প্রযোজ্য। শাস্ত্রের যে কোনো একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরু করার মানে সেই সিদ্ধান্তটিকে গ্রহণ ক'রে নেওয়া নয়। সেই সিদ্ধান্তটি নিয়ে শুরু করেই, তার যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে বলছেন মীমাংসাকার। সন্দেহ প্রকাশ করবার উপদেশ নিয়ে শাস্ত্রকার আমাদের মনকে জাগ্রত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের অলস মন অলস দেহের মতোই পরিশ্রম করতে চায় না। চিন্তাহীন গ্রহণ অথবা চিন্তাহীন বর্জন—এই আয়াসের পথ ধরতে পারলেই সে বেঁচে যায়। এই আল্‌সে মনের খোরাক জুটিয়ে দেন নি শাস্ত্রকার। তিনি সিদ্ধান্তের যথার্থতা সম্বন্ধে শুরুতেই সন্দেহ করতে বলেছেন। সন্দেহের নিরাকরণ করবার জন্যে বিচার করবার এক প্রস্তাব জানিয়েছেন। সিদ্ধান্তটিকে বিচার করো, সেই সিদ্ধান্ত আমাদের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়, কিম্বা স্থানুত্বের শিকলে বেঁধে জড়ত্বের উপাসক ক'রে তুল্‌ছে—সেটি জাগ্রত মন দিয়ে বিচার ক'রে দেখো, তারপর সেই সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি গ্রহণ ক'রে কিম্বা বিচারের দ্বারা তার পরিবর্তন সাধন ক'রে কিম্বা তাকে ভুল বলে প্রতিপন্ন ক'রে ও সেই হেতু তাকে বর্জন ক'রে আর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছোও। এই পথই সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পথ।

সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্যে কিম্বা একটি সিদ্ধান্তের সত্যতা যাচাই করবার জন্যে মীমাংসাকার নির্দিষ্ট এই প্রণালী স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাবে যুক্তিহীন বিচারহীন মনের জড়তা নাশ ক'রে স্রোতহীন মানসিক জলাশয়ে স্রোত আনবার জন্যে আমাদের আহ্বান জানিয়ে গেছেন মীমাংসাকার। যুক্তিকে উপেক্ষা ক'রে কোনো কিছুকেই গ্রহণ করতে বলেন নি ভারতের যুগযুগান্তব্যাপী সাংস্কৃতিক জীবনের স্রষ্টা চিন্তানায়কের দল।

ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক ও মায়াবাদী পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমকে বিচারে পরাজিত করেন। দক্ষিণভারতে স্মৃতি, পুরাণ ও আগম-বিশারদ আচার্যদের বিচারে পরাজিত ক'রে গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদের প্রতিষ্ঠা করেন। বারাণসীতে বিখ্যাত মায়াবাদী অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বিচারে পরাভূত ক'রে তাঁর পরিণামবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। ঈশ্বরোপলব্ধির জন্যে জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গের চেয়ে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন নি চৈতন্যদেব কীর্তন গেয়ে। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণ বুদ্ধির দ্বারা তিনি ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন।

আমার বর্তমান আলোচনার বিষয় হচ্ছে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে বৈদিক যুগ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর চিন্তাধারার কথা বলবার প্রয়োজন কি ছিল—এই কথা কারো কারো মনে হতে পারে। প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। একটি জাতির মানস পুর্বাপররহিত ভুঁইফোড় নয়, তার একটি ঐতিহাসিক পরিণতির দিক আছে। ভারতীয় মানসের মধ্যে শত শতাব্দী ধরে যুক্তিবাদ বারবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে নির্বিচার গ্রহণের বিরুদ্ধে, তাই সেটি সম্বন্ধে দুচারটি কথা না বললে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ পরম্পরা-রহিত ভুঁইফোড় বলে প্রতিপন্ন হবে। ইতিহাস সে কথা বলে না—অতএব সেটা সত্য নয়, এবং সেই কারণেই অসঙ্গত। আরো একটি কারণ আছে। ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে যুক্তিবাদের ধারা যে প্রাচীন কাল থেকে প্রবহমান এটি জানা থাকা দরকার। অজ্ঞানতা-প্রসূত একটি অপপ্রচার চলতি আছে—সেটি হচ্ছে এই যে ভারতীয় চিন্তাধারায় যুক্তিবাদের প্রথম সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর য়ুরোপই হচ্ছে ভারতের এই যুক্তিবাদের জনক। তাই য়ুরোপের যুক্তিবাদের ঢেউ ভারতের তীরে এসে পৌঁছয়, তারই ধাক্কায় আমাদের যুক্তিবাদের জন্ম। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছে আমাদের যে কোনো কাজে আসে নি এমন অন্ধ জাতীয়তাবাদ-দুষ্ট কথা আমি আদবেই বলছি না, কিন্তু আমাদের ভারতীয় যুক্তিবাদের জনক য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ, এই কথাটি আদবেই স্বীকার করা যায় না।

তা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান পুরুষ জ্ঞানে ও কর্মে যুক্তিবাদের অগ্নিস্পর্শ দিয়ে আমাদের দেশে নব যুগের সূচনা করলেন সেই যুগপুরুষ রাজা রামমোহন রায় বাইশ বৎসর বয়েসে ইংরিজি শেখেন। য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি হয় তাঁর বাইশ বৎসর বয়েসের পরে। তার আগেই তাঁর জীবন-দর্শন পরিণতি লাভ করেছে ও সে পরিণতি লাভে তাঁকে সহায়তা করেছিল সংস্কৃত, ফারসী ও আরবী সাহিত্য মন্থন করেছিলেন। ভারতীয় দর্শন ও আরবী যুক্তিবাদ এই দুটি রামমোহনের জীবনতত্ত্বের বনিয়াদ রচনা করেছিল, য়ুরোপীয় দর্শন নয়। রামমোহন শাস্ত্রকে অস্বীকার করেন নি কিম্বা নির্বিচারে বর্জন করতে বলেন নি। শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি বিচার ক'রে নিতে হবে এই কথা তিনি বলেছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন বেদান্তের বাংলা অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদের 'অনুষ্ঠান' নামক মুখবন্ধে রামমোহন লেখেন—'আমাদের উচিত শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্ধারিত পথের সর্বথা চেষ্টা করি; এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।'

কেনোপনিষদের ইংরিজি অনুবাদের ভূমিকায় রামমোহন শাস্ত্র ও যুক্তিকে সত্য নির্ণয়ের উপায় বলেছেন। তিনি বলেছেন—'সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বোধ হয় এই যে, শাস্ত্র ও যুক্তি এ দুয়ের কোনও একটির হস্তে আপনাদের সম্পূর্ণ সমর্পণ না ক'রে উভয়ের প্রদত্ত আলোকের যথাযথ ব্যবহার দ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক জ্ঞানকে উজ্জ্বল রাখা।'

রামমোহন তাঁর বিচার-গ্রন্থগুলিতে বৃহস্পতির এই বচনটি প্রায়ই উদ্ধৃত করেছেন—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যোহর্থ নির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানি প্রজায়তে॥

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উপর ভিত্তি ক'রে রামমোহন যেমন তাঁর যুক্তিবাদকে দাঁড় করালেন তেমনি গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তিনি অষ্টম শতাব্দীতে আরব্য দেশের

বস্‌রা সহরে যে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয় তাদের মতবাদের দ্বারা। সেই মতবাদের পাঁচটি মূল বক্তব্য ছিল এই—

এক) ভগবানের সঙ্গে ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট বস্তুদের কোনো সাদৃশ্য নেই। ভগবান মনুষ্যমূর্তি ধরে আবির্ভূত হন না অর্থাৎ অবতারবাদ ভ্রান্ত মত। ঐশীগুণ আছে কিন্তু সেই গুণগুলি ঈশ্বরের সত্তার থেকে পৃথক নয়।

দুই) মানুষের সমস্ত ক্রিয়া মানুষের স্বাধীন-ইচ্ছা প্রসূত।

তিন) আবু বক্‌র যে খালিফা হয়েছিলেন সেটি যদিও বিধিসম্মত, সেটি কিন্তু divine revelation এর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এক কথায় divine revelation মুতাজিলারা স্বীকার করেন নি।

চার) কোরাণ অপৌরুষেয় নয়। কোরাণ মানুষের সৃষ্টি।

পাঁচ) যে সব জাতি ঈশ্বরের কাছ থেকে ঐশীশক্তিজাত শাস্ত্রের অধিকারী হয় নি, সে সব জাতিও জ্ঞান লাভ ক'রে তাদের কর্তব্য পালন করে।

ইস্‌লামীয় শাস্ত্রের গোঁড়ামির বন্ধন ছিন্ন ক'রে এই মতবাদ বস্‌রা থেকে বাগদাদে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী কালে সিরিয়ায় ও মিশরে এই মতবাদ প্রসার লাভ করে। এমন কি স্পেন দেশেও মুতাজিলা মতবাদ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করে।

রামমোহন এই মুতাজিলা চিন্তা-প্রণালীর যুক্তিবাদের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হন। 'তুফৎ-উল-মুহাদ্দীন নামক' যে বইটি তিনি লেখেন ফারসী ও আরবী ভাষায়, সেই বইটিতে রামমোহন যুক্তিবাদী মনোভাব নিয়ে ধর্মের বিচার করা দরকার এই মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন—'নানা ধরনের অভ্যাস ও বিভিন্ন বাতাবরণের মধ্যে বাস করার ফলে ব্যক্তিদের চরিত্রে যে সব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলির সঙ্গে তাদের অন্তর্নিহিত গুণগুলি যেগুলি জাতির কিম্বা ব্যক্তির প্রকৃতিগত—তাদের মধ্যে সুগভীর পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নানা জাতি যে সব বিভিন্ন ধর্মীয় মতগুলি পোষণ করছে সেই সব মতগুলির যথার্থতার নিরপেক্ষ বিচার করতে হবে।'

ধর্মগুলির তুলনামুলক বিচার করবার জন্যে রামমোহন তাঁর দেশবাসীদের ও বিশ্ববাসীদের আহ্বান জানান। ধর্মগুলির তুলনামুলক অনুসন্ধিৎসার জনক হচ্ছেন রামমোহন, শুধু ভারতেই নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ধর্মগুলির তুলনামুলক বিচারের পন্থা অবলম্বন করেন। রামমোহন লেখেন—'মনুষ্য জাতির প্রকৃতিতে একটি অন্তর্নিহিত গুণ আছে, সেটি হচ্ছে এই—সেই গুণের বশবর্তী হয়ে যে কোনো ব্যক্তি একটি ধর্মমত গ্রহণের পূর্বে কিম্বা পরে বিভিন্ন জাতিরা যে সব ধর্মমত লিপিবদ্ধ করেছে সেগুলির খোঁজ খবর নেবে ও কোনো একটি বিশেষ ধর্মমতের প্রতি কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব না ক'রে ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে সব ধর্মমতগুলির তুলনামূলক বিচার ক'রে কোনটি সত্য, কোনটি অসত্য, কোনটি যুক্তিসঙ্গত আর কোনটি যুক্তিবিরুদ্ধ তার বিচার করবে।'

এইভাবে ধর্মমতগুলির তুলনামূলক বিচারের পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলে রামমোহন সব কুসংস্কারের ও অন্ধবিশ্বাসের মূল কারণটি কি সেটি আমাদের দেখিয়ে দিলেন। তিনি বললেন—'প্রতিটি ঘটনার কার্যকারণ সম্বন্ধ অনুসন্ধান করবার ক্ষমতার অভাবের ফলে কুসংস্কারের জন্ম।'

এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ অধিকারী ভেদের কথা তুলে থাকেন অর্থাৎ ব্যক্তির গ্রহণ-

ক্ষমতার উপর ফলাফল নির্ভর করে—এ কথা তাঁরা বলেন। রামমোহন অধিকার-ভেদের কথা আংশিক ভাবে স্বীকার ক'রে বলেছেন—'কতটা ফল দেবে সেটি ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন গ্রহণ-ক্ষমতার উপর নির্ভর করলেও এটি এক বিশ্বাসীর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। কেউ যদি বিষকে মিষ্টান্ন মনে ক'রে খায়, সেই বিশ্বাস থাকার জন্যে সে কি মরবে না?

এই ভাবে প্রতিটি বিষয়ের কার্যকারণ সম্বন্ধটি আবিষ্কার ক'রে সব অন্ধবিশ্বাসের ও কুসংস্কারের মূলচ্ছেদ করবার উপদেশ দিয়েছেন রামমোহন।অতিপ্রাকৃতবাদের ও অলৌকিকতত্ত্বের বিষয়ে রামমোহন বলেছেন যে—'মানুষ যা বুঝতে পারে না, কিম্বা যার হেতু সম্বন্ধে তার ধারণা নেই তাকেই সে অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক বলে ধরে নেয়। আসলে কিন্তু কার্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারা এই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু অন্য বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অভিজ্ঞতার অভাবেই একটি বস্তুর হেতু অজানা থাকে। তখন কোনো কোনো ব্যক্তি বস্তুর অস্তিত্বের কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞানরহিত লোকদের জুটিয়ে নেয় আপনাদের অলৌকিক শক্তির দোহাই দিয়ে।'

রামমোহন বললেন যে—'ভগবানও অলৌকিক কিছু করতে পারেন না। কেউ কেউ বলেন যে ভগবান যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তিনি মৃতকেও প্রাণ দিতে পারেন, তিনি এই দেহকে আলোর গুণ ও বাতাসের শক্তি দিতে পারেন। এই ধরনের যুক্তি শুধু 'হতেও পারে' এই সম্ভাবনার কথা বলেই খালাস। এই ধরনের বাস্তব ঘটনার প্রমাণ দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করে না।'

এইসব কথা বলার পর রামমোহন বলছেন—'ভগবানও নিয়ম লঙঘন করতে পারেন না। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন না— যেমন ভগবান তাঁর নিজের অস্তিত্বের অভাব সৃষ্টি করতে পারেন না।' তুফাৎ-উল্-মুহাদ্দীন, যার অর্থ হচ্ছে একেশ্বরবাদীগণকে উপহার—সেই পুস্তিকায় রামমোহন যুক্তির ভিত্তির উপর ধর্মমতের প্রতিষ্ঠার পথ ধরবার জন্যে তাঁর দেশবাসীদের আহ্বান করেছেন। মায়াবাদী বৈদান্তিকদের মতও তিনি যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করেছেন। পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম—মায়াবাদীদের এই ব্রহ্ম-বিভাগের মতবাদে রামমোহন একেবারেই বিশ্বাসী ছিলেন না। মায়াবাদীদের মতে অপরব্রহ্ম 'জ্ঞানোদরেমায়ামরীচিকাবৎ বিনাশশীল'। ব্রহ্মের এই বিনাশশীলতা অযুক্তিযুক্ত বলে তিনি মনে করতেন।

শঙ্করের মায়াবাদ তিনি স্বীকার করেন নি। বেদান্তের ধারণা—'পরমাত্মা হি সংসার মায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে।'

রামোহনের ধারণা—পৃথিবী ঈশ্বরেতে আছে তাই সত্য। ঈশ্বর থেকে পৃথক হলে অসত্য। যেমন ভগবান সত্য, তেমনি জগৎও সত্য। রামমোহনের মতে 'মায়া' হচ্ছে ভগবানের সৃজনীশক্তি, তাঁর সৃষ্টি। মায়া হচ্ছে ভগবানের real energy ও তাঁর ইচ্ছাশক্তি। ভগবান হচ্ছেন তাঁর ভাষায় 'The wilful agent of creation', সৃষ্টি তাঁর লীলা খেলা নয় কিম্বা তাঁর মায়ার সৃষ্টি সন্তানদের তাঁর মায়ার ম্যাজিক দেখাবার জন্যে নয়। পৃথিবী ভগবান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এই ধারণা পৃথিবীকে অসত্য করে—এই ছিল রামমোহনের ধারণা। জীবন ও পৃথিবীকে রামমোহন মায়া বলে জ্ঞান করতেন না। কেন না এই পৃথিবী ভগবানের সৃষ্টি আর এই সৃষ্টির মধ্যে তাঁর প্রকাশ। পৃথিবীর সঙ্গে ভগবানর যোগ নেই

এই ধারণা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ক'রে আমাদের সব শক্তি শুকিয়ে দেয় ও সামাজিক কর্তব্য সাধন ও ভগবৎপূজা এই দুয়ের কোনো সম্পর্ক নেই—এই সব ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে। রামমোহন ভগবৎ-আরাধনা ও সামাজিক কর্তব্যসাধন—এই দুয়ের মধ্যে বিরোধের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি।

রামমোহন তাই কখনো কর্ম ত্যাগ করতে বলেন নি। এমন কি জীবের মুক্তির পক্ষেও কর্মের প্রয়োজন আছে এই কথা বলেছেন। মায়াবাদীর মতে পৃথিবীকে ও জীবাত্মাকে দুইকে ভুলতে হবে ব্রহ্মের জন্যে। রামমোহন এটা আদবেই মানেন নি। সন্ন্যাসকে তিনি মুক্তির একমাত্র পন্থা বলে স্বীকার করেন নি।

কিন্তু শুধু ধর্মকে আচার ও রীতির জড়বন্ধন-মুক্ত ক'রে তিনি পথ নির্দেশ করেন নি, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তিনি নতুন ধারা প্রবর্তনের প্রথম প্রবক্তা। শুধু নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাধারাকে গতি দিয়ে ক্ষান্ত হন নি রামমোহন, জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে নানা দিকে তিনি গতি সঞ্চার করেছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরাতন টোলো শিক্ষাপ্রণালীর বদলে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করবার জন্যে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লর্ড এ্যামহার্স্টকে তাঁর সুবিখ্যাত চিঠিটা লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি বলেন যে ব্যাকরণের নিয়মগুলি আয়ত্ত করানো আর metaphysical বিচারনিপুণতা শিক্ষা দেওয়ানো—এই দুই অত্যন্ত নিরর্থক মানবসমাজের পক্ষে। এই সব বাদ দিয়ে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, natural science. ভূগোল ও ইতিহাস পাঠের ব্যবস্থা করা দরকার। তাঁর প্রস্তাব তখন গৃহীত না হলেও, বারো চোদ্দ বছর পরে তাঁরই শিক্ষানীতি অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮২১ থেকে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ লেখেন 'সংবাদ-কৌমুদী'তে। ভূগোলের পুস্তিকা ও ম্যাগনেট, বেলুন, মাছদের আচরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন রামমোহন।

তাঁর আর একটি বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রামমোহন লেখেন—

'I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus, is not calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions among them, has entirely deprived them of political feeling. It is, I think, necessary that some changes should take place in their religion, at least for the sake of their political advantages and social comfort.'

এর থেকে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ধর্মের সংস্কারের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির যে নিবিড় সম্বন্ধ আছে সেটি রামমোহন তাঁর যুক্তিবাদী মন দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করেছিলেন। এই ভাবে বিশ্লেষণ ও যুক্তির দ্বারা আমাদের মনের বিচিত্রমুখী ধারণাগুলিকে অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিকত্বের কুয়াশা-মুক্ত ক'রে, জ্ঞানের নির্মল স্রোতে তাদের ধৌত করেছিলেন রামমোহন। ধর্মের সাফাই গেয়ে যে কর্মবিমুখ জড়তার পূজা আমরা করেছিলুম তার থেকে আমাদের ত্রাণ ক'রে ও অতীতের সত্য অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে আমাদের চিত্তের যোগসূত্র রক্ষা ক'রে নতুন যুগের পথে আমাদের যাত্রা শুরু করিয়ে দিয়ে রামমোহন চলে গেলেন।

তিনি চলে গেলেন বটে কিন্তু যুক্তিবাদের যে প্রবল ধারা বইয়ে দিয়ে গেলেন তাতে

বাংলা দেশের মৃত্তিকা থেকে অন্ধ জড়তার সব জঞ্জাল ভেসে চলে গেলো। একের পর এক মশালবাহী পুরুষ এলেন বাংলার অঙ্গনে জ্ঞানের ও অনুভূতির আশ্চর্য ফসল ফললো বাংলাদেশের মানসভুমিতে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা ও এই সভার দ্বারা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সুচনা—বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এই দুটিই হচ্ছে নবযুগ-প্রবর্তনী ঘটনা। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিরা যথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি 'তত্ত্ববোধিনী সভার' সভ্য ছিলেন। শুধু ধর্মীয় জীবনে কুসংস্কার দূর করার ব্রত নিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' বাংলাদেশের জীবনে আবির্ভূত হয় নি, অতিপ্রাকৃতের দোহাই দিয়ে যুক্তিলেশবর্জিত যে চিন্তাধারা বাংলাদেশের জীবনে ক্ষীয়মান স্রোতে বয়ে চলেছিল, তাকে অতিপ্রাকৃতের বালুচরের পীড়ন থেকে যুক্তিবাদের বন্যার দ্বারা মুক্ত ক'রে তাকে বেগবান ক'রে তোলাও ছিল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম অভিপ্রায়। তার সঙ্গে ভাবজগতে যে আবিলতা ও বিকার বাঙালীর জীবনকে নির্বীর্য ভাবালুতার আবর্জনায় পঙ্কিল ও অপরিশুদ্ধ ক'রে রেখেছিল সেই আবর্জনা দূর ক'রে অনুভূতির ব্যাপকতা ও গভীরতা প্রসারিত ক'রে ও বৃদ্ধি ক'রে বাঙালীর মানসকে মহতী সৃষ্টির অগ্নিদীক্ষা দেওয়াও ছিল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র স্রষ্টার অন্যতম উদ্দেশ্য।

'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রারম্ভ থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত হন অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু। অক্ষয়কুমারকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী পুরুষ নিঃসংশয়ে বলা চলে। অপ্রমান্য অনুভূতির প্রামাণ্য তিনি স্বীকার করেন নি চিন্তার ক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত অনুভূতির দোহাই দিয়ে বিচারকে ঠেকিয়ে রাখবার যে রেওয়াজ বহুকাল থেকে চলে আসছিল চিন্তার জগতে, অক্ষয়কুমার রুখে দাঁড়ালেন তার বিরুদ্ধে। অনুভূতির প্রামাণ্যকে বিচারের ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত করবার তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্যে আত্মোপলব্ধিতে বিশ্বাসবান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের মতবিরোধ ঘটে ছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সত্যনিষ্ঠ যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার যুক্তিবাদের পথ থেকে মুহূর্তের জন্যেও সরে যান নি। দুঃখের বিষয় যে এই অসাধারণ পুরুষকে বাংলা দেশ একেবারে ভুলে গিয়েছে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করলে দোষ হবে না যে অক্ষয়কুমার হচ্ছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বারো বৎসর 'তত্ত্ববেধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনা করেন অক্ষয়কুমার। বহু অনুসন্ধিৎসামূলক ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ তিনি লেখেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় শুধু ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ থাকতো, এই একান্ত ভ্রান্ত ধারণা আমাদের দূর করা উচিত ছিল বহুদিন আগে। পরিতাপের ও লজ্জার কথা যে অতীতের সাধনার সঙ্গে যোগবিযুক্ত সমকালীন বাংলার শিক্ষিত সমাজ বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র অপরিসীম দান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন বল্‌লেও জলে। তার ফলে ক্ষতির বোঝা বহন করতে হচ্ছে সমকালীন বাংলার শিক্ষিত সমাজকে।

১৭৭৭ শকের বৈশাখ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় অক্ষয়কুমার লেখেন—' Pure rationalism is our teacher. What ever has been discovered by Bhaskara and Aryabhatta, Newton and Laplace is also a part of our scripture.' খাঁটি নির্ভেজাল

যুক্তিবাদ হচ্ছে আমাদের শিক্ষক। ভাস্কর, আর্যভট্ট, নিউটন ও লাপ্লাস্—এঁরা যা কিছু আবিষ্কার করেছেন, সবই আমাদের শাস্ত্রের অন্তর্গত।

অক্ষয়কুমার শাস্ত্রের সীমানা প্রসারিত করে ছিলেন। শুধু ভারতীয় নয়, সারা পৃথিবীর যুক্তি-আশ্রয়ী আবিষ্কারকে তিনি শাস্ত্র বলে স্বীকৃতি দিলেন। মনে রাখতে হবে যে চিন্তার ক্ষেত্রে এই দুঃসাহসিকতা গতানুগতিককে উপেক্ষা করছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্বে।

১৭৭৬ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র চৈত্র সংখ্যায় অক্ষয়কুমার লিখলেন—'সমাজ ও ব্যক্তি, সমষ্টি ও ব্যষ্টি ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধ বদ্ধ। ব্যক্তি যদি দরিদ্র থাকে, অসৎ হয় তা হলে সমাজের কল্যাণ হতে পারে না।

দারিদ্র্যের সঙ্গে ব্যক্তির অসৎ হওয়ার প্রবণতার যে গভীর সম্বন্ধ আছে তার এমনই যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা অক্ষয়কুমার ক'রে গেছেন একশো বছর আগে। ব্যক্তির দারিদ্র্য না ঘোচালে যে সমাজের কল্যাণ অসম্ভব সে কথাও তিনি দীপ্তভাবে ঘোষণা করেছেন এক শতাব্দী পূর্বে।

কিন্তু এই দারিদ্র্য দূর হবে কি ক'রে? ভগবৎ-আরাধনার কৃপায় কিম্বা ধনীকে সৎ হয়ে দাতাগিরির সাধনায় লিপ্ত হতে বলে? যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার একেবারেই ভাববিলাসী ছিলেন না। ১৭৭৬ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৌষ সংখ্যায় তিনি লিখছেন — 'যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে উৎপাদন বাড়বে, লোকের অভাব কমবে, অবসর পাবে, অনুসন্ধিৎসার মনোভাব বৃদ্ধি পাবে।'

যুক্তিবাদী সোশালিষ্ট চিন্তধারার সার কথা অক্ষয়কুমার বলে গেছেন। অবসরকে কি ভাবে কাজে লাগানো যাবে সেটি হচ্ছে গভীর চিন্তার বিষয় সমকালীন যুগে। অবসরে যে ব্যবহার সমকালীন যুগের মানুষেরা ক'রে চলেছে তাতে সামাজিক সংকট দেখা দিয়েছে পৃথিবী জুড়ে। অক্ষয়কুমার বলছেন—এই অবসরকে অনুসন্ধিৎসার কাজে লাগাও। তবেই ব্যক্তির জীবনে ও সামাজিক জীবনে কল্যাণ সুদূরপ্রসারী হবে।

'ধর্মনীতি' ও 'বাহ্য বস্তুর সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'—তাঁর লেখা এই বই দুটিতে অক্ষয়কুমার দেখিয়েছেন যে ধর্ম, নীতি, স্বাস্থ্যের নিয়ম, আইন—এ সবই প্রকৃতির নিয়ম থেকে উদ্ভূত। প্রকৃতির এই নিয়মগুলি জানবার জন্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা চাই আর এই অনুসন্ধিৎসার জন্ম যুক্তিবাদ থেকে।

এই ভাবে বাইরের প্রকৃতির জগৎ ও মানুষের অন্তর-প্রকৃতির জগৎ—এই দুই জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে অতিপ্রাকৃতের কুয়াশা-মুক্ত করে অক্ষয়কুমার বিদায় নিলেন। গরীব চাষীদের দুর্দশা সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি যে সব প্রবন্ধ লেখেন সেগুলি যেমন যুক্তিপূর্ণ, ভাবালুতা-বর্জিত তেমনি গভীর মানবপ্রেমের নিদর্শক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একজন অসাধারণ ও অতুলনীয় পুরুষ হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম ও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু। তিনি ছিলেন একাধারে বহুগুণসমন্বিত পুরুষ—যুক্তিবাদী, গভীর মানবদরদী ও অসাধারণ তেজদীপ্ত পুরুষ। এই তিনটি চারিত্রিক গুণের মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য যোগসূত্র আছে বলে আমার ধারণা। তার ব্যাখ্যা করার প্রলোভন আপাতত সম্বরণ করা গেলো।

কোনো বস্তুর যথার্থতা প্রমাণের জন্যে সেই বস্তু সম্বন্ধে কোনো একটি শাস্ত্র কি বলেছে তার উদ্ধৃতিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় একমাত্র যুক্তি বলে গ্রাহ্য করেন নি। শাস্ত্র কি বলেছে

সেটি নিশ্চয় জানতে হবে কিন্তু জানা মানেই তাকে স্বীকার করা নয়। শাস্ত্র-বাক্যকে বিচার ক'রে দেখতে হবে। এ বিষয়ে তিনি একান্তভাবে রামমোহনের অনুগামী।

ডাক্তার ব্যালাণ্টাইন্ শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে যে রিপোর্ট দেন সেই রিপোর্ট সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-পরিষদকে যে লিখিত মন্তব্য দেন তাতে লেখেন—'বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় প্রকারের পাঠপদ্ধতি যে ভালো এ কথা ডাঃ ব্যালাণ্টাইন্ স্বীকার করিয়াছেন। অথচ উভয়বিধ পাঠ্যের ফলে 'সত্য দ্বিবিধ'—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাত্রদের মনে জন্মিতে পারে, এ ভয় করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস যে লোক সংস্কৃত ও ইংরেজি— এই উভয় ভাষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের মতো পাঠ করিয়াছে ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে—তাহার সম্বন্ধে এ ভয় জন্মিবার কোনো কারণ নাই। যে যথার্থ রূপে ধারণা করিয়াছে তাহার কাছে সত্য—সত্যই। 'সত্য দুই রকমের' এই ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল।'

ডাঃ ব্যালাণ্টাইন্ বলেন—'হিন্দুর দার্শনিক আলোচনা যে সকল প্রাথমিক সত্যে পৌঁছিয়াছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাহাদের পূর্ণতার বিকাশ দেখাইয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবে।' দুঃখের বিষয় এই বিষয়ে আমি ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত অন্যমত। 'আমার মনে হয় না, আমরা সকল জায়গায় হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঐক্য দেখাইতে পারিব। যদি বা ধরিয়া লওয়া যায় ইহা সম্ভব, তবুও আমার মনে হয়, উন্নতিশীল য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের তথ্য সকল ভারতীয় পণ্ডিতগণের গ্রহণযোগ্য করা দুঃসাধ্য। তাহাদের বহুকাল-সঞ্চিত কুসংস্কার দূর করা অসম্ভব। কোনো নূতন তত্ত্ব—এমন কি তাহাদের শাস্ত্রে যে তত্ত্বের বীজ আছে, তাহারই পরিবর্ধিত স্বরূপ—যদি তাহাদের গোচরে আনা যায় তবে তাহারা গ্রাহ্য করিবে না। পুরাতন কুসংস্কার তাহারা অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে।'

বেদান্ত ভ্রান্ত কিম্বা অভ্রান্ত তার বিচার এই আলোচনার বিষয় নয়। আমি শুধু এইটেই দেখাতে চাই যে ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্ত সম্বন্ধে চল্‌তি সত্যকে তাঁর ধারণা অনুসারে বাতিল করতেও কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর মহাশয় লেখেন—'আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহাই করিব।'

করলেনও তিনি তাই। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-পুনর্গঠন সম্বন্ধে তিনি যে রিপোর্ট পেশ করলেন গভর্মেন্টের কাছে তাতে পাঠপ্রণালীর পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জোর দিলেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিতে হবে, তার জন্যে বাংলা ভাষায় নানা ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা দরকার আর ইংরিজিও শেখাতে হবে। এ ক্ষেত্রেও তাঁর আশ্চর্য মিল আছে রামমোহনের শিক্ষানীতির ধারণার সঙ্গে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কায়স্থ ছেলেরা ও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সব জাতের হিন্দু ছেলেরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃপায় সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের অধিকার পেলো। জাতের সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙ্গে দিলেন তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে। কম বাধা তাঁকে পেতে হয় নি অতীত মুখো কুসংস্কারবদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছ থেকে। বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয় শুধু শাস্ত্রীয় যুক্তির অবতারণা করেন নি, নিজের যুক্তিও যথেষ্ট দর্শিয়ে ছিলেন। বিধবা-বিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' এই প্রবন্ধ ১৭৭৬ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ফাল্গুন

সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র সংশয়বাদী (agnostic) তো ছিলেনই, মনে হয় যে তিনি নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। যুক্তিবাদ তাঁর বলিষ্ঠ সমর্থনে দৃপ্ত পদে এগিয়ে গেলো বাংলায়।

ধর্মজগতের বাসিন্দেরা উপলব্ধির উপর ঝোঁক দেন বলে, তাঁদের সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা যে তাঁরা যুক্তি বাদী হন না। আর ওই ধারণা যে একেবারে অহেতুক তাও নয়। তাই একজন ধর্মপথের পথিকের যুক্তিবাদ সম্বন্ধে কি ধারনা ছিল সেটিজানলে আমাদের উপকারই হবে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ও তঁর মৃত্যু হয় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। তিনি ধর্মসাধনায় একান্তভাবে নিবেদিত ছিলেন ও তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, শুধু বাংলার কিম্বা ভারতের নয়, পৃথিবীরও—এই খ্যাতির অধিকারী ছিলেন তিনি। ঈশ্বরের ধ্যানে ও উপাসনায় তিনি বিভোর হয়ে থাকলেও, ধর্মের ভিত্তি অলৌকিক কিম্বা অতিপ্রাকৃত তত্ত্বে—এ তিনি আদবেই স্বীকার করতেন না। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তারিখে তিনি 'Am I an inspired prophet' বলে ইংরেজি ভাষায় একটি বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন— I accept no truth unless it be such as can be demonstrated. Religion must have as strong and sound a basis of evidence as Euclid and Mathematics, otherwise it cannot be acceptable.... If there is any thing in my church which is opposed to science, I wish rather that my church should perish and the cherished creed of my life than science would perish....I will give up all my mysticism, my daily communion with God, my asceticism, my philosophy, if it can be proved that these are opposed to science, and contrary to the revelations of nature.' ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে লেখা 'An episitle to fellow-Indians' প্রবন্ধে কেশবচন্দ্র লেখেন—Ye shall respect science above all things, the science of matter above the Vedas and the science of mind above the Bible. Astronomy and geology, anatomy and physiology, botany and chemistry are the living scriptures of nature's God. Philosophy, logic and ethics, yoga, inspiration and prayer are scriptures of the soul's God. In the new faith every thing is scientific.'

এই ভাবে ধর্মকে ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রমাণের উপর বিশ্বাসের উপর নয়, যুক্তির উপর নিছক অনুভূতির উপর নয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আহ্বান করেন কেশবচন্দ্র। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও যুক্তিবাদের সমর্থনে অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ১২৯১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 'ধর্মজিজ্ঞাসা' নামক প্রবন্ধে লিখলেন—'গুরু—আমি কোনো ধর্মকেই ঈশ্বরের প্রণীত বা অভ্রান্ত ঋষি-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করি না। সকল ধর্মেই অনেক ভুল, অনেক মিথ্যা আছে মানি। কিন্তু ধর্ম মাত্রেই যে ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নাই ইহা স্বীকার করি না। তাহা বলিলে মনুষ্যবুদ্ধির অনুচিত অবমাননা করা হয়। বস্তুত সকল ধর্মেই কিছু মিথ্যা কিছু ভ্রম আছে। আবার সকল ধর্মেই কিছু সত্য আছে। কেহই একেবারে সত্য, একেবারেই মিথ্যা নহে। একেবারে মিথ্যা এমন কোনো ধর্ম যদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাহা টিকে নাই, এবং তদ্দারা

মনুষ্যের কোনো উন্নতি সিদ্ধ হয় নাই।

শিষ্য—আমার ষষ্ঠ আপত্তি এই যে, ধর্ম মাত্রেই যদি ভ্রম এবং মিথ্যার সংশ্রব আছে, তবে কেনো ধর্মই অবলম্বনীয় হয় না। কেন না মিথ্যা মাত্রেই অনিষ্ট আছে।

গুরু—এই জন্য সকল ধর্মের সংস্কার আবশ্যক। যে ধর্মই অবলম্বন করো তাহার সংস্কার পূর্বক, ভ্রান্তি ও মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্বক, তদন্তর্গত সত্যকে ভজনা করিবে।'

রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'প্রচার' নামক মাসিক পত্রিকায় 'হিন্দুধর্ম' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র। সেই প্রবন্ধে তিনি লিখছেন—'বেদাদিতে অসত্য বা অধর্ম আছে, বা থাকিতে পারে, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিবেন না। এমন কথা শুনিলে অনেকে কানে আঙ্গুল দিবেন। এ সম্প্রদায়ের জন্য আমরা লিখিতেছি না। ....যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে,তবুও অসত্য, অধর্ম বলিয়া পরিহার্য। .....তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, যেটুকু হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম, যেটুকু সার ভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম, সেইটুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত। প্রথম জিজ্ঞাসা—হিন্দু ধর্ম কি? হিন্দুয়ানিতে অনেক রকম দেখিতে পাই। হিন্দু হাঁচি পড়িলে পা বাড়ায় না, টিকটিকি ডাকিলে 'সত্য সত্য' বলে, হাই তুলিলে তুড়ি দেয়, এ সকল কি হিন্দুধর্ম? অমুক শিয়রে শুইতে নাই, অমুক বারে ক্ষৌরী হইতে নাই, অমুক বারে অমুক কাজ করিতে নাই, এ সকল কি হিন্দুধর্ম?.....যদি ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে আমরা হিন্দুধর্মের পুনর্জ্জীবন চাহি না।'

উনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তিবাদের আলোকে বাঙালী যখন শাস্ত্রগুলিকে যাচিয়ে দেখতে শুরু করেছিল, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি তখন শাস্ত্রে যা কিছু উল্লিখিত আছে তা নির্বিচারে গ্রহণ করতে হবে, এই মত প্রচার করতে শুরু করেন। আল্‌সে মনের মানুষদের মধ্যে তাঁর প্রতিপত্তি কম হয় নি সে সময়। যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মত গ্রহণযোগ্য নয় বলেন। 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধের ফুটনোটে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন—'পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে হিন্দূধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকেবে না এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না। এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া আমরা তাঁহার কোনো কথার প্রতিবাদ করিলাম না।'

· আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান ভিত্তিক মনোভাব সম্বন্ধে নানাভাবে নানা কথা নানা সময়ে বলেছেন। তাঁর জন্ম ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ও তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে। যে পথ ধরে বৈজ্ঞানিকের যাত্রা সে সম্বন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্র 'বিজ্ঞান সাহিত্য' নামক তাঁর প্রবন্ধে লেখেন—বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষা ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়। এইজন্যে মনের কথা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোনো মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।'

'নিবেদন' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন—'বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যে অনেক সাধনার আবশ্যক।'

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির মর্ম বোঝাবার জন্যেই আচার্য জগদীশচন্দ্রের দুটি লেখা থেকে এই অংশগুলি উদ্ধৃত করেছি। বাইরের বস্তুর ও নিজের মনের বস্তুর কঠোর পরীক্ষা করতে

হবে, নিজের মনের ঝোঁক বস্তুর উপর আরোপ ক'রে কোনো কিছুর বিচার করা চল্‌বে না। এ পথে ভুল অনিবার্য।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের Royal Society of Arts এ বক্তৃতা কালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বলেন—'Believing that the prosperity of my country depends in a great measure on the spread of scientific education and the practical application of science. I shall in this paper put forward a few suggestions...so that the above-mentioned object could be attained.'

এই বলে তিনি বিজ্ঞানকে কি ভাবে সহজ ক'রে য়ুনিভার্সিটিতে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে ও কি ভাবে তার প্রচারের ব্যবস্থা হতে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও ছাত্রসমাজ সম্বন্ধে তিনি বলেন—'We want to train our students to think accurately and to fix in their minds a few fundamental principles. We want to teach them ...how to observe and how to avoid errors. We would wish them, as far as possible to find out things for themselves, and take very little on trust.'

এই অল্প কয়েকটি কথায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। খুঁটিয়ে নির্ভুল চিন্তা করতে শেখা, কতকগুলো বুনিয়াদী নিয়ম সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করা, মন দিয়ে দেখতে শেখা, আর অন্যের কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না ক'রে নিজে অনুসন্ধান ক'রে জানা—এই হ'ল বৈজ্ঞানিক মনোভাবের মাপকাঠি।

বিজ্ঞানের শিক্ষা কি ভাবে দেশে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে ১৩১২ সালে 'ভাণ্ডার' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পত্রিকার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে প্রশ্ন করেন। জগদীশচন্দ্র তার উত্তরে বলেন—'আমাদের দেশে শিক্ষিতদের মধ্যেও বিজ্ঞানচর্চা তেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়ে নাই।......তাহার জন্যে দেশে বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা ব্যপ্ত হওয়া চাই। ছাত্ররা যাহাতে......প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিজ্ঞানদৃষ্টি চালনার চর্চা করিতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে।'

বিজ্ঞানদৃষ্টি চালনার চর্চা ছাড়া বিশ্বপ্রকৃতির ও অন্তরপ্রকৃতির সন্ধান মেলা অসম্ভব এই হুঁশিয়ারী তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও বিজ্ঞানের পথে যাত্রা করতে আমদের ডাক দিয়েছেন। ১৩২৯ সালে লেখা 'বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান নির্ণয়' প্রবন্ধে বিজ্ঞানমূলক সভ্যতার সম্বন্ধে তিনি লিখছেন— 'সভ্যতার মূলমন্ত্র হইতেছে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার পূর্বক তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষের সুখ ও সম্ভোগে নিযুক্ত করা।'

ভারতের ত্যাগের পন্থাকে যারা বিজ্ঞানমূলক সভ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর খেলা খেলে আমাদের বাধা দেয় প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অনন্তশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করবার দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে, তাদের কঠিন সত্য কথা শুনিয়েছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তিনি বলেছেন—'ত্যাগের পন্থা অবশ্য আধ্যাত্মিক হিসাবে উচ্চ পন্থা সন্দেহ নাই, কিন্তু ভোগের ক্ষমতার অভাবে যে ত্যাগ সেই ত্যাগকে তো সাত্ত্বিক ত্যাগ বলা যাইতে পারে না।'

তিনি বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া আমরা জাতি গঠনের কার্যে কিছুতেই ফললাভ করিতে পারিব না।'

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত 'রত্নপরীক্ষা' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখছেন—'বর্তমান কালে জগতে বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহার তুলনায় প্রাচীন হিন্দুদের বিজ্ঞান-জ্ঞান সামান্য ছিল। তবে ইহা স্বীকার্য যে যখন য়ুরোপ তমসাচ্ছন্ন ছিল তৎকালের পক্ষে হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল গৌরবজনক। প্রাচীন কালে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের পরিবর্তে কুসংস্কার এবং কবিকল্পনার রাজত্বও বিস্তৃত হইয়াছিল।'

যুক্তিবাদীর সত্যনিষ্ঠার অপূর্ব পরিচয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের এই উক্তি। জাতীয়তাবাদীদের অতিশয় উক্তির ও অজ্ঞ মিথ্যা রচনার ধার দিয়েও তিনি যান নি। যেখানে ভারতবর্ষের সত্য প্রশংসা প্রাপ্য সেখানে সত্য প্রশংসা করেছেন, আর যেখানে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক উন্নতির তুলনায় তার জ্ঞান সীমিত ছিল, তাব ঐতিহাসিক কারণ দর্শিয়ে তিনি আমাদের সত্য বিচারের পথ দর্শিয়েছেন।

তিনি আরো বলেছেন যে, 'পূর্বপুরুষদের অধুনা-বিলুপ্ত বাহাদুরীর বড়াই করিয়া আর বেদবেদান্ত উপনিষদের দোহাই পাড়িয়া জাতির দুঃখ ঘুচিবে না, দারিদ্র্যও দূর হইবে না।'

বেদবেদান্ত উপনিষদকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আদবেই অবজ্ঞা করেন নি, এগুলির দোহাই পেড়ে যারা যুক্তির পথ, বিচারের পথ বন্ধ ক'রে দাঁড়ায়, ভারতের অগ্রগতির পথ-রুদ্ধকারী তাদের নির্বুদ্ধি বাচালতাকে তিনি ক্ষমা করেন নি।

১৩৪২ সালে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন সেই ভাষণের এক জায়গায় তিনি বলেন—'মানুষ শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকের চিত্তবৃত্তির বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে।' এই বিচিত্র প্রবর্তনায় সাড়া দিতে গেলে প্রতিটি বিষয়কে জানবার প্রয়োজন আছে। আর এই বিষয়কে জানা সম্ভব নয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব ছাড়া। কাব্যের জগতে যে মহাকবি ভাব ও রসবর্জিত স্তূপীকৃত তথ্যসম্বল কবিতাকে কবিতা বলে স্বীকৃতি দেন নি, বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে, জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে তিনি বিশ্লেষণ-বিমুখ, অতীতের সিদ্ধান্তগুলিকে নির্বিচারে গ্রহণেচ্ছু মনোভাবকে বীর্যহীন ও জড়তাবদ্ধ বলে কঠোর ভাবে ভর্ৎসনা করেছেন।

শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে দেশকে অচলায়তনের মধ্যে বন্দী করে পচিয়ে তোলা যেমন সঙ্গত কাজ নয় তেমনি ভাবালুতার উদ্দামতা দিয়ে দেশকে ঠেলে নর্দমায় নামিয়ে দেওয়াও কল্যাণের পরিপন্থী। যেখানে সুন্দরের সাধনা সেখানে যেমন ভাবের আরাধনা, যেখানে কল্যাণের সাধনা সেখানে তেমনি শুদ্ধ বুদ্ধির, বিশ্লেষণ ও বিচার শক্তির ব্যবহার। এই কথা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে শতবার আমাদের জানিয়েছেন।

শাস্ত্রকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি, কিন্তু বিচার ক'রে নিতে বলেছেন। এখানে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে রামমোহন-পন্থী। শাস্ত্রগুলির শিক্ষায় যেখানে গতির নির্দেশ আছে সেগুলি তিনি গ্রহণ করেছেন, যেখানে শাস্ত্রবাক্য মানুষের মনকে গতিহারা করে দিয়ে নিশ্চলতায় বিকারগ্রস্থ করেছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ সেই সব শাস্ত্রবাক্যের যথার্থতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। কি ধর্মের স্বরূপ বিচারে, কি সমাজের নানা আচার ও রীতির বিচারে রবীন্দ্রনাথ কোনো কিছুই নির্বিচারে গ্রহণ করেন নি। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা কি বস্তু, ত্যাগের আসল মর্ম কি, পাপের উৎস কি, কর্ম ও আধ্যাত্মিকতা কি পরস্পর বিরোধী শক্তি—ধর্মসংক্রান্ত

এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যুক্তির পন্থা অনুসরণ ক'রে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক সমস্যাগুলির সমাধান বাত্‌লেছেন তিনি যুক্তির অবতারণা ক'রে ও যুক্তিবাদের পথ ধরতে তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলছেন—'এ কথা নিশ্চিত যে বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে ফেলে হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতেই দূর হতে পারে না। মানুষের জানা এগিয়ে চলবে না, কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এত বড় কুলিগিরির সাধনা আর নেই।'

মানুষের যে জানাকে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে চলতে বলেছেন সেটি কোন জানা? সেটি হচ্ছে বিজ্ঞানের জানা, বিশ্লেষণভিত্তিক জানা, যুক্তির ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত জানা।

১৩১৫ সালে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ভূপেশচন্দ্র রায়কে লিখিত একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চাষীদের নতুন নতুন ফসল ফলাবার জন্যে উৎসাহ দিতে বলছেন। মান্ধাতার আমল থেকে তারা যে ফসল ফলিয়ে আসছে তার থেকে একচুলও এদিক ওদিক হওয়ার প্রবৃত্তি তাদের নেই, এই জড়বুদ্ধির বন্ধন থেকে তাদের মনকে মুক্ত ক'রে দেওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—'কৃষিবিজ্ঞানের উপদেশ মতো চেষ্টা করিবে।'

এটা বলাই বাহুল্য যে যেখানে বিজ্ঞান সেখানেই বিশ্লেষণ ও বিচার, সেখানেই যুক্তির অনুপ্রবেশ।

শ্রীনিকেতনের বার্ষিক অধিবেশনে গ্রামের কর্মীদের সম্বোধন ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেন—'দেশের মধ্যে এই যে প্রকাণ্ড বিভেদ একে দূর করে জ্ঞানবিজ্ঞান কি পল্লী, কি নগর সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামের লোকেরা থাকুক তাদের ভূত, প্রেত, ওঝা, তাদের অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, নিরানন্দ নিয়ে, তাদের জন্যে শিক্ষার একটুখানি যে কোনো রকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট, এ রকম অসম্মান যেন গ্রামবাসীদের না করি।'

এখানেও গ্রামে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের দ্বারা গ্রামবাসীদের মনকে বিচারশীল ক'রে তুলতে হবে, তাহলেই ভূত প্রেত, ওঝা, তাদের অশিক্ষা, সব দূর হয়ে যাবে। যা তা কিছু অশ্রদ্ধার সঙ্গে পরিবেশন করলে চলবে না। তাতে আছে শুধু গ্রামবাসীদের প্রতি অসম্মান। গ্রামবাসীদের মন জাগিয়ে তুলতে পারলেই প্রকৃত কাজ করা হবে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় গ্রাম্য-স্বরাজের যে চিন্তা রবীন্দ্রনাথ বীজরূপে বাঙালীর মনে বপন করেন তার মধ্যে গ্রামের মানুষদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার কথা ছিল। সেই উদ্বুদ্ধতা যুক্তির পথ ছাড়া আর কোনো উপায়ে চিরস্থায়ী হতে পারে না মানুষের মনে। শুধু ভাবপ্রবণতা ও সাময়িক উত্তেজনার উপর আশ্রয় নিলে সেই উদ্বুদ্ধতা কর্পূরের মতো উবে যাবে, যেমন ঘটছে এ কালে।

সমবায় প্রণালীর প্রবর্তনের দ্বারা ও গ্রামাঞ্চলে intensive cultivation প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা ক'রে কৃষি-অর্থনীতির পরিবর্তন সাধনের মহতী সম্ভবনার কথা চাষীদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। বিচারবুদ্ধির বাণ ডাকাও দেশের মধ্যে তাতে অতীতের স্থানুত্ব-জড়ত্বের কচুরীপানা ভেসে চলে যাবেই যাবে—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও আন্তরিক কামনা।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর অসামান্য যুক্তিবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ মন নিয়ে অর্ধশতাব্দীরও আগে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছিলেন তাদের নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করবার ও তাদের অভাব অভিযোগগুলির কথা শিক্ষকমণ্ডলীর সভায় আলোচনা

করবার। অধুনা ছাত্রদের অধিকারের ন্যায্যদাবি বিকৃতি ও অসংযমের আতিশয্যে তার যথার্থতাকে ক্ষুণ্ণ করছে ও সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে মনে। সংযম যে দুর্বলতার লক্ষণ এ ভুল কেমন ক'রে বাংলার তরুণদের পেয়ে বসলো তা জানি নে। শিক্ষকগোষ্ঠীর বিচারহীন উদ্ধত মনোভাবও যে আংশিক ভাবে এই বিকৃত ও অসংযমের জন্যে দায়ী তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থার জন্যে রবীন্দ্রনাথ উঠে পড়ে লেগেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যুক্তিবাদী ও বিচারশীল মন নিয়ে তিনি ভারতের ও বিশ্বের সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা ক'রে গেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অসামান্য শক্তিধর পথিক পুরুষদের মধ্যে শেষ পথিক হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে. রবীন্দ্রনাথের জন্মের দু'বছর পরে তাঁর জন্ম, ১৯০২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বামীজীর যুক্তিবাদী বিচারশীল মনের খবর দেশবাসীরা অল্পই রেখে থাকেন। যেখানে তিনি আত্মসম্মানহারা জাতির আত্মসম্মান জাগানোর জন্যে অতীত ভারতের উচ্ছ্বসিত জয়গান করেছেন শুধু সেইটুকুই তাঁরা জানেন। এই অজ্ঞানতার জন্যে দেশের লোক দায়ী নন, দায়ী হচ্ছেন পরিবেশকের দল। যে কোনো বীর্যবান ব্যক্তির মতো স্বামীজীর মধ্যেও প্রবল বিরোধ ছিল, নানা ধারণার সংঘর্ষ ছিল। তাঁর চরিত্রের এ ধারণার বিচিত্র প্রকাশকে খর্ব ক'রে যাঁরা তাঁর একপেশে পরিচয় দিয়ে তাঁকে তাঁদের গোষ্ঠীর কাজে লাগান, তাঁরা স্বামীজীর প্রতি ও দেশবাসীর প্রতি অবিচার করেন।

দেশের শ্বাসরোধকারী জড়তার আবহাওয়ায় স্বামীজি হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে এদের অন্ধ মনের জড়তা ঘোচাতে গেলে আঘাত হানতে হবে এদের ধারণাগুলির বুকে। হয়তো তাতে এদের মনের নিশ্চল নিশ্চয়তা নাড়া খাবে, এরা জেগে উঠে ভাবতে শুরু করবে। যুক্তিবাদের শ্রেষ্ঠত্বের সমর্থনে স্বামীজি বলেন—'কোনো একজনের কথায় কোটি দেবদেবতায় অন্ধ বিশ্বাস রাখার চেয়ে যুক্তি ও বিচার অনুসরণ করে সমস্ত মানবসমাজ নাস্তিক হয়ে যায় সেও ভালো।' যুক্তিবাদের এর চেয়ে জোরালো সমর্থন আর কি হতে পারে?

স্বামীজি অলৌকিকত্বের চলতি মহিমা উপেক্ষা ক'রে বললেন—'জীবনের দরজা প্রত্যেকের জন্যে খুলে ধরে বর্ণের একচেটিয়া সুযোগগুলি নষ্ট করে কিছু লোকের মুঠোর মধ্যে যে অতুলনীয় ঐশ্বর্য লুকোনো আছে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু ক'রে দিয়ে ভূতবাদ (materialism) এক অর্থে ভারতের ত্রাণের কাজে এসেছে।'

যে লোক ঐতিহাসিক-দৃষ্টিসম্পন্ন নয় সে লোক যথার্থ যুক্তিবাদী নয়। ঐতিহাসিক -দৃষ্টিসম্পন্ন স্বামীজি ভারতের জীবনে ভূতবাদের আবির্ভবের ঐতিহাসিক সার্থকতা উপলব্ধি করেছিলেন। ভূতবাদ না এলে, আধ্যাত্মিক মত বাদের সঙ্গে ভূতবাদের দ্বন্দ্ব না শুরু হলে আলোচনা শুরু হাবে কি ক'রে? আর আলোচনা ছাড়া বস্তুর স্বরূপের সন্ধানই বা কি ক'রে পাওয়া যাবে? মেকী আধ্যাত্মিকতাকে নির্মম বিদ্রুপ ক'রে তিনি বলেন—'মাংসাহারে আধ্যাত্মিকতা নষ্ট নয় এমন আধ্যাত্মিক দেশে ক'জন আছেন?'

কর্মবিমুখতা যাঁরা আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন বলে জাহির করেন সেই কাপুরুষদের ভর্ৎসনা ক'রে স্বামীজি বললেন—'এই জগতের ঘূর্ণায়মান চাকা থেকে পালিয়ে যেও না। এর ভিতরে এসে দাঁড়াও, কাজের রহস্য আয়ত্ত করো।' পলায়নী বৃত্তির অনাধ্যাত্মিকতাকে

এই ভাবে নির্মম আঘাত হেনেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ঘোষণা করলেন যে ভাবতবর্ষের উন্নতির জন্যে, দারিদ্র্য দূর করবার জন্যে কৃষিপ্রধান ভারতে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয়।

জাতীয়তাবাদীরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সত্যসন্ধান না জেনেও তার নিন্দায় পঞ্চমুখ ছিলেন, আজও আছেন। সেই অজ্ঞদের কান মলে দিয়ে স্বামীজি বললেন—'পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সাদরে আহ্বান করিতে হইবে। ধ্বসিয়ে দিলেন তিনি জাতীয়তাবাদীর মুর্খতার তাসের ঘর। জিজ্ঞেস করলেন তাদের—'হিন্দুধর্ম লইয়া এ্যামেরিকার সমাজ গড়িতে পারো?'

এ্যামেরিকায় যে প্রাণ-উচ্ছ্বলতা, নয়া সমাজ গড়বার জন্যে সেখানকার মানুষদের যে অশ্রান্ত সাধনা, তার প্রতি স্বামীজির শ্রদ্ধা ছিল। জাতের অন্ধতায় শতবিভক্ত ভারতবাসী শক্তিহীন ও জ্ঞানহীন হয়ে পড়েছিল। স্বামীজি জানতেন যে এই খণ্ডিত, গতিহীন সমাজ ব্যবস্থায় নতুন কিছু গড়ে তোলা অসম্ভব।

উনবিংশ শতাব্দীর মুখে কাল তার যবনিকা ফেলে দিল। উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীদের শেষ যুক্তিবাদী স্বামী বিবেকানন্দ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ১৯০২ সালে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুড়ি পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের যে তিনজন বিজ্ঞানবিদ্ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, মানবসমাজ সম্বন্ধে তাঁদের কি ধারণা তার সম্বন্ধে কিছু বলে আমার বর্তমান আলোচনা শেষ করবো। প্রথমে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার মতামত উল্লেখ করি। উত্তর প্রদেশের বিজ্ঞান এ্যাকাডেমীর ১৯৩২ সালের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক সাহা বলেন—'Before the great world war, the politician was at the stage where the physicist found himself before the time of Archimedes, or better still, in the days of Homer and Hesiod, His country was his Olympus, his own people were his gods, all others were demon, barbarians fit only to be secured against the stroke of the sword or exploited as helots....Olympian attitude towards other nations must be forsaken, the present faulty system of education which seeks to perpetuate the mediaval mind must be eschewed The humanising influence of science must get a large scope....The politicians should hand over many of his functions to an international board of trained scientists...who will think in terms of the whole world as a unit.'

অধ্যাপক সাহার মতে জাতীয়তাবাদ, মধ্যযুগীয় মনের অস্তিত্ব ও যুক্তিবাদের অভাব—এরাই হচ্ছে পৃথিবীর নানা অশান্তির জন্যে দায়ী। তিনি বলছেন—প্রকৃত বিজ্ঞানী যে বিশ্লেষণে ব্যস্ত থাকে তার কারণ হচ্ছে যে সেই মূলসূত্র অথবা নীতি অবলম্বন ক'রে মানবসমৃদ্ধির সৌধ রচনা করা যায়।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে যুক্তির পথ ছাড়া এই বিশ্লেষণ কোনো মতেই সম্ভব নয় ও মূলনীতিতে পৌঁছনোও অসম্ভব। অধ্যাপক সাহা বলছেন—'বিজ্ঞানীর এটা ধ্রুব বিশ্বাস যে শুধু ধর্মশাস্ত্র চর্চা ক'রে সেটা কখনো হবে না। প্রেরণা ও শক্তির জন্যে নিভৃতে তার জীবনদেবতার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তার অনুশীলন ও চর্চা করার প্রয়োজন আছে মানুষের,

কিন্তু মানুষ যখন কাজে নামবে তখন সম্পূর্ণ উদ্বুদ্ধ মন নিয়ে নামতে হবে অর্থাৎ বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে একেবারেই চলবে না।'

আমরা আগেই দেখেছি যে অধ্যাপক সাহার মতে বিজ্ঞানের পথ হচ্ছে বিশ্লেষণের পথ ও যুক্তিবাদের পথ। মেঘনাদ সাহা বলছেন—'দড়িকে সাপ কল্পনা করলে চলবে না, কল্পনা দিয়ে সব কিছুর অস্তিত্ব 'নাস্তি' বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না, যদি 'নাস্তি' বলে উড়িয়ে দিই তা হলে মানুষের রোগ অনাহার প্রভৃতির দুঃখ কখনো দূর হবে না।

নিছক কল্পনার পথ ধরে মানুষকে সামাজিক ও অর্থনীতিক নিষ্পেষণের জাঁতাকল থেকে ত্রাণ করা চলবে না। যুক্তিবাদের পথ ধরে সামাজিক ও অর্থনীতিক অবস্থার ও প্রচলিত ব্যবস্থার বিশ্লেষণ ক'রে অশান্তির ও নিষ্পেষণের মূল কারণটি বের করতে হবে তবেই মানুষ পরিত্রাণ পাবে।

বসুবিজ্ঞান মন্দিরের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ দেবেন্দ্রমোহন বসু বলেন—'প্রকৃতির নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করবার শক্তি মানুষের আছে। সত্য আছে, কিন্তু সেই সত্যকে অনুসন্ধান ও পরীক্ষার দ্বারা আবিষ্কার করতে হবে ও তার ফল সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বৈজ্ঞানিকের ধারণা হচ্ছে এই যে সব আবিষ্কার ও ফলাফল সাময়িক ধাঁচের। এই কারণে যারা সেই সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নয় তাদের মতামতও পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে, তাতে যদি নিজের সিদ্ধান্ত ভেসে যায় তো যাক, বদল করতে হয় তো হোক।'

দেবেন্দ্রমোহন পরীক্ষার পথে ও বিশ্লেষণের পথে প্রকৃতির নিয়মগুলির ও সত্যের অনুসন্ধান করতে বলেছেন। যুক্তিবাদী সহিষ্ণু হবে, উদার হবে কেন না সে যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে, নিজের গোঁড়ামির নয়। যে গোঁড়া সে যে শুধু যুক্তিবাদী নয় তা নয়, সে আসলে মানবতাবাদীও নয়। দেবেন্দ্রমোহনের মতে ধর্মের উৎপত্তি মানুষের অবচেতন লোকে যেখানে প্রতীক (symbol) তৈরির উৎস রয়েছে। এই প্রতীকগুলি যুক্তির মশলা দিয়ে তৈরি নয়, তৈরি হৃদয়াবেগ দিয়ে। তাই ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তির বলি হয়েছে। গোঁড়ামি বহুলাংশে দেখা দিয়েছে। আচারবদ্ধতা ও আনুষ্ঠানিকতা সত্যসন্ধানে বাধা হয়েছে।

আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—ধর্মের ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বত্র এই যুক্তিবাদী মন নিয়ে অবস্থার ও নীতির বিশ্লেষণের অভাব রয়েছে। চরম দৈন্য সত্যসন্ধানী যুক্তিবাদী মনের সমকালীন যুগে। অন্ধ অজ্ঞ গোঁড়ামি আজ যুক্তিকে নির্বাসিত করবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠে পড়ে লেগেছে।

বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ অধ্যাপক সত্যেন বসু বলেন—'বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে অধ্যাত্মবাদীদের বোধহয় এই রকম মনোভাব যে বিজ্ঞানীরা রেলগাড়ি চালিয়েছে, কালিঝুলি মেখে কয়লা ভেঙ্গে প্রকৃতির কাছ থেকে কিছু শক্তি সংগ্রহ করেছে, কিন্তু তাতে সভ্যতার বহিরঙ্গের রূপ কতকটা বদল হয়েছে কিন্তু এসব নিয়ে মেতে থেকে বিজ্ঞানীরা হারিয়েছে দার্শনিকের মনোভাব। কিন্তু এটা ঠিক নয়। সৃষ্টির রহস্য বুঝতে মানুষ সব সময়েই চেষ্টা ক'রে এসেছে, বিজ্ঞানীরাও ক'রে থাকেন।'

সত্যেন্দ্রনাথের মতে বিবর্তনের ফলে মানুষ ক্রমশই উপরের দিকে চলেছে, তার সভ্যতা ক্রমশই ঊর্ধ্বপথে চলেছে। তাই নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করলে মানুষের জয়রথ এগোবে না। প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ-করা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মানবসভ্যতাকে।

যদি শুধু দর্শনশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আমরা ভাবি যে সব হিংসা-দ্বেষ বিসর্জন দিয়ে আমরা সারা জীবন কাটাতে পারবো, তা হলে আমাদের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস প্রমাণ করছে যে সেটা অলীক কল্পনামাত্র। পরাতত্ত্ব ভারতবর্ষের ঘরোয়ানা জিনিস কিন্তু ভারতবর্ষের কোনোকালে দ্বেষ-হিংসা সংঘাতের বিরাম নেই। দারিদ্র্য অজ্ঞতা, অত্যাচার ও অবিচারকে মায়া বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না! ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বলে এগুলোকে এড়িয়ে গেলেও চলবে না। বিজ্ঞানীর ধারণা হচ্ছে এই যে, মানুষ যতদিন থাকবে ততদিন সে চেষ্টা করবে এই সব ক্লেদ কানুষের জীবন থেকে মুছে দিতে ও এমন সমাজ গড়তে যাতে এদের অস্তিত্ব থাকবে না। মানুষ যে মানুষকে বিশেষভাবে সম্মান ক'রে এসেছে এতকাল, তা মনে হয় না। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের পথ ধরে মানুষ সবে মাত্র সেই পথে যাত্রা শুরু করেছে। সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্য এতই স্পষ্ট যে তার ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বিংশ শতাব্দীর বার্ধক্যের যুগ পর্যন্ত বাংলা দেশের জীবনে প্রায় দুশো বছর ধরে যুক্তিবাদের যে ধারা বয়ে চলেছে—কখনো প্রবল জোয়ারে বাঙালীর চিত্তকে, তার মানসকে প্লাবিত করে, কখনো বা গোঁড়ামির বালিতে চাপা পড়ে ক্ষীণ ধারায়, তারই একটি ধারাবাহিক পরিচয় দিতে আমি চেষ্টা করেছি এই আলোচনায়। এই বিরাট ধারাকে একটি আলোচনার বাঁধ দিয়ে ধরে দেওয়ার চেষ্টা যদি সফল না হয়ে থাকে, সেই ধারাকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে যদি না পেরে থাকি তো তার জন্যে সম্পূর্ন দায়ী আমি, দায়ী আমার শক্তির অভাব, দায়ী নয় বাংলার এই প্রাণদায়িনী মনের তমোনাশিনী যুক্তিবাদের ধারা।

স্বদেশী চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ

ইংরেজের ভারতে আগমন ঘটেছিল এদেশের পুঁজিবাদী বিপ্লবের শক্তিগুলিকে শাপমুক্ত করার ঐতিহাসিক আয়ুধ হিসাবে। একটি সর্বভারতীয় প্রশাসনের অধীনে সমস্ত দেশের একীকরণ এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির প্রবর্তন—ভারতে পুঁজিবাদী বিপ্লবের এই দুই অপরিত্যজ্য পূর্বসর্তকে পূর্ণ করার প্রয়োজন ইংলন্ডের নিজস্বার্থেই অত্যাবশ্যকীয় ছিল। এই প্রক্রিয়ারই উপজাত হিসাবে জন্ম নিয়েছিল ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। ইতিহাস চিরকাল পরিহাসপরায়ণ; প্রায়শঃই দেখা যায় যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় জাত অভিপ্রেত ফলাফলের তুলনায় উপজাত বস্তুটির তাৎপর্য অথবা গুরুত্ব কোনক্রমেই হীন নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমস্ত ভারতে মাত্র দুজন পুরুষের কাছেই এদেশে ব্রিটিশ শাসনের ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক বিপ্লবের সঠিক ঐতিহাসিক তাৎপর্য ধরা পড়েছিল। এই দুজনের নাম রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)। দুজনেই ছিলেন ভারতপ্রেমিক, জাতীয় ঐতিহ্যে গৌরববান এবং জাতীয়তাবাদী। তবুও এই দুজনে ভারতে ও পৃথিবীর অন্যত্র ক্রিয়াশীল শক্তিগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার ব্যাপারে সংকীর্ণমনা ছিলেন না। ব্রিটেন কর্তৃক ভারত অধিকারের ফলে এদেশে যে নূতন অর্থনৈতিক শক্তিগুলির জন্ম হয়েছিল তাদের সঠিক চরিত্র অনুধাবনের উপযুক্ত পরিণত ঐতিহাসিকবোধ ঐ বিশেষ সময়ে সমস্ত দেশে কেবলমাত্র ঐ দুজনেরই ছিল। দুজনেই ঐ অর্থনৈতিক বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক শক্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ ও ঘাতপ্রতিঘাতের উপযুক্ত সুযোগ প্রদানের জন্য যে অবশ্যম্ভাবী রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা দেবে তা যে ভারতের পক্ষে প্রভূত কল্যাণকর হবে সে বিষয়ে দুজনেই সম্যক সচেতন ছিলেন। ভারতীয় অর্থনীতির বদ্ধ জলাশয়ে জোয়ার আসার প্রতীক্ষায় তাঁরা ব্যগ্র দিনপাত করতেন। অপরদিকে বিদেশী শক্তির পদানত ভারতবাসীদের যে প্রচন্ড রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাধানিষেধের সম্মুখীন হতে হবে সেকথাও তাঁদের ধারণাতীত ছিল না। ভারতীয়গণ সরকারী শাসনযন্ত্রে যাতে যোগ্যস্থান গ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য রামমোহন ও দ্বারকানাথের প্রচেষ্টা নিরলস ছিল।

ভারতীয় নবজাগরণের প্রাণপুরুষ রামমোহন বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। ১৮৩২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় রায়তদের অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষ্যদান কালে তিনি প্রজাপীড়ন ও প্রজাশোষণের জন্য জমিদারদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং এ প্রসঙ্গে জমিদারগণকে অবাধ স্বাধীনতা দানের জন্য শাসক শক্তিকে ভর্ৎসনা

করেন। জমিদারগণ কর্তৃক গ্রামাঞ্চলের হাটগুলি থেকে তোলা আদায় প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন আন্দোলন করেন। তিনি বিলাসসামগ্রীসমূহের উপর শুল্ক বসানোর দাবী করেন এবং লবণ ব্যবসায়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একাধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। একচেটিয়া ব্যবসায় না অবাধ বাণিজ্য এই প্রশ্নে তৎকালীন ইংলন্ডে প্রবল আলোড়ন চলছিল। রামমোহন ও দ্বারকানাথ উভয়েই অবাধ বাণিজ্যের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। একচেটিয়া ব্যবসায়কে শিল্প-বিপ্লবের ক্রমবিকাশ ও বিস্তৃতির পথে প্রধান বাধা হিসাবে চিহ্নিত করতে উভয়েই সমর্থ হয়েছিলেন।

রামমোহন দেশ শাসনের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের বিচার বিভাগে সহকারী হিসাবে নিয়োগের দাবী তুলেছিলেন। আদালতে ভারতীয় বিচারপতি ও জুরী নিয়োগও তার দাবীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলিকে বিচারের ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাবও তিনি করেছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহন ও দ্বারকানাথ উভয়েই প্রবল সংগ্রাম করেছিলেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংস্কারের আন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে উভয়েই স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে নিজমত প্রচারের জন্য উভয়েই ইংরেজি,হিন্দি, পারসীয় এবং বাংলা ভাষায় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৩৭ সালে মফঃস্বলের পুলিসী প্রশাসনের সংস্কারের জন্য ইংরেজ সরকার এক কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটির কাছে সাক্ষ্যদানকালে দ্বারকানাথ ঠাকুর ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। দ্বারকানাথের ভাষায়, "ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সমাজের সম্ভ্রান্তশ্রেণীভুক্তগণের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা উচিত। দারোগা, সেরেস্তাদার বা অনুরূপপদে ইতিমধ্যেই কর্মরত ব্যক্তিগণকে শুধুমাত্র বেতনবৃদ্ধির সুযোগদানের জন্য ঐ পদে নিযুক্ত করা সঙ্গত হবে না। অবশ্য দারোগা ইত্যাদিদের মধ্যে দু-একজনকে হয়তো উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে এরা সকলেই অপদার্থ। ...তাঁরা (ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটগণ) দেশের অভ্যন্তরে কর্মের জন্য নিযুক্ত হবেন। ফৌজদারী ব্যাপারে তাঁদের ক্ষমতা মুনসেফদের সমতূল্য হবে এবং থানাদারদের উপরে তাঁদের আধিপত্য থাকবে।"

১৮৩৮ সালের এপ্রিল মাসে দ্বারকানাথ "ল্যান্ডহোল্ডারস এসোসিয়েশন"এর প্রতিষ্ঠা করেন। নাম থেকেই বোঝা যায় যে এটি জমিদারদের সংগঠন। দেশের মধ্যবিত্তশ্রেণীর তখনও রাজনৈতিক সাবালকত্ব প্রাপ্তি হয়নি এবং সামাজিক শ্রেণী হিসাবে জমিদারগণই তখন সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী। নিজশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র হিসাবেই জমিদারগণ এই এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা করেন এবং অচিরেই এসোসিয়েশন প্রভাবশালী রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে পরিগণিত হল। উদীয়মান মধ্যবিত্তশ্রেণী স্বাভাবিকভাবেই এই এসোসিয়েশনকে সুনজরে দেখেননি। তাই অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা নিজেদের একটি পাল্টা রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। কিন্তু এ ব্যাপারেও ল্যান্ডহোল্ডারস এসোসিয়েশনের নেতা দ্বারকানাথ ঠাকুর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

১৮৪২ সালের জানুয়ারী মাসে দ্বারকানাথ ইউরোপ যাত্রা করেন। ইংলন্ডে থাকাকালে তিনি সে দেশের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করেন। সে দেশের সরকারী প্রশাসন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থাগুলির গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থার প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ঐ বছরের শেষভাগে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য, প্রসিদ্ধ বাগ্মী এবং উদারমতাবলম্বী রাজনৈতিক নেতা জর্জ থমসনকে

সহযাত্রীরূপে আমন্ত্রণ করে এদেশে আনেন।

১৮৪৩ সালের ২০ এপ্রিল তারিখে জর্জ থমসনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় "বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি" গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন ডিরোজিও ও রামমোহন রায়ের অনুগামী এবং ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রধান নেতা। ঐ গোষ্ঠীর অপর নেতা চন্দ্রশেখর দেব প্রস্তাব সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি এইরূপ ঃ

প্রস্তাব করা হচ্ছে যে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি সংগঠন এখন প্রতিষ্ঠিত হোক। ব্রিটিশ ভারতের প্রজাবৃন্দের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ এবং এদেশের আইন, প্রতিষ্ঠান ও সম্পদ সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতি সকল শ্রেণীর দেশবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য ও তাদের সকল স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় সর্বপ্রকার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায় গ্রহণ করবে।

এইভাবে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সুহৃদ জর্জ থমসনের সাহায্য ও নির্দেশনায় ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সম্প্রসারিত করার জন্য ভারতে এইটিই সর্বপ্রথম সংগঠন। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য আন্দোলন শুরু করে এবং সমস্ত প্রকার চাকুরীর ক্ষেত্রে পূর্ণ ভারতীয়করণের দাবী সমেত একটি স্মারকলিপিও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে প্রেরিত হয়। সিভিল সার্ভিসকে কেবলমাত্র ইংরেজদের জন্য সংরক্ষিত রাখার নিন্দা করে তারাচাঁদ চক্রবর্তী লিখলেন, "এই প্রথা বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মণীষা ও প্রতিভা স্ফূরণের পক্ষে বাধাস্বরূপ এবং এর ফলে কর্মোদ্যম, মেধা ও চারিত্রিক বলের প্রকৃত মূল্যায়ণের প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। ...সিভিল সার্ভিসকে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা উচিত। সবদিক দিয়ে বিচার করলে এর ফল স্বাস্থ্যকর ও লাভজনক হবে।"

১৮৪৩ সালে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক আহূত জনসভায় সকল প্রকার সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে পূর্ণ ভারতীয়করণের দাবী উত্থাপিত হয়। প্রস্তাব উত্থাপন করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অল্প দিনের মধ্যেই সোসাইটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন। এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ছিল" সর্বপ্রকার বৈধ উপায়ে ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকারের কর্মদক্ষতা ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টার দ্বারা গ্রেট ব্রিটেন ও ভারতের যৌথ স্বার্থের সম্প্রসারণ করা ও স্থানীয় অধিবাসীদের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টিত থাকা।"

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫) এসোসিয়েশনের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এসোসিয়েশনের তরফে আহূত এক সভায় দেবেন্দ্রনাথ চৌকিদারী প্রথার সংশোধনের দাবী জানান। তিনি বলেন, "গ্রামীন জনসাধারণের কর্মপ্রচেষ্টাই রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির প্রধান উৎস; অথচ তাদেরই ধনপ্রাণ রক্ষার সুবন্দোবস্ত নেই। অন্যান্য শ্রেণীর মানুষেরা এ ব্যাপারে কিছু কিছু সুবিধা পেয়ে থাকেন। কিন্তু গ্রামের মানুষের সেটুকু সুবিধাও নেই। এই নিরাপত্তার জন্য প্রস্তাবিত আইনের খসড়ায় গ্রামবাসীদের নিজ অর্থে নিযুক্ত চৌকিদারদের কাজকর্মের উপর কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হলেও সরকারী অর্থকোষ থেকে কোন অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব নেই। সরকারী রাজস্বের একটা মোটা অংশ আদায় করা হয় দেশে উপযুক্ত পুলিসী ব্যবস্থা চালু রাখার অজুহাতে; অথচ এ ব্যাপারে দায়িত্ব পালনে সরকারী ঔদাসিন্য দীর্ঘদিন

ধরে সুবিদিত। প্রস্তাবিত আইন কার্যকরী হলে জনগণের প্রতি যে অবিচার করা হবে, আশা করি সে কথা (আইনের খসড়া প্রণয়ণকারী) কমিটি সরকারের দৃষ্টিগোচর করবেন।" কৃষিজীবী জনসাধারণের উপর নিপীড়নমূলক প্রচলিত লবণ আইনের প্রতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এসোসিয়েশনের তরফে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে স্মারকপত্র পেশ করেন তাতে বলা হয়, "হয়তো আধ ডজন ব্যক্তি একটি ছোট তালুক বা কিছু নিষ্কর জমির মালিক এবং এই জমি বা তালুকে হয়তো বা এক আধ ডজন প্রজা বসানো আছে। এই সব জমি থেকে কদাচিৎ বার্ষিক এক শত টাকার বেশি আয় হয়; সমস্ত জমির বাজার দর মোট পাঁচ শত টাকাও নয়। প্রজাদের অধিকাংশেরই নিত্য প্রয়োজনীয় লবণ ক্রয়ের ক্ষমতা নেই। তাই কোন প্রজা যদি কিছু নোনা মাটি সংগ্রহ করে বা সমুদ্রের বালিতে গর্ত খুঁড়ে নোনা জল সংগ্রহ করে নির্বোধের মত লবণ তৈরির চেষ্টা করে তবে তাকে তার সমস্ত সম্পত্তির বাজার দরের সমতুল পরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে দিতে হবে।"

ভারতের রাজনীতি ইতিমধ্যেই অবিমিশ্রিত সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক ছিন্ন করে সাধারণ মানুষের সমস্যাবলীর কথা চিন্তা করতে সুরু করেছে।

সরকারের কাছে উপস্থাপিত অপর এক স্মারকপত্রে স্বায়ত্বশাসনের দাবী জানানো হয়। গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের গরিষ্ঠসংখ্যক সদস্য পদে ভারতীয়দের নিয়োগের দাবীও ঐ স্মারকপত্রে জানানো হয়।

বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ভারতের অন্যত্র ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের শাখা খোলা হয়। ভারতীয় জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দাবীগুলি প্রচারের উদ্দেশ্যে সংগঠিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে এসোসিয়েশনই প্রথম ভারতীয় প্রয়াস। জাতীয় আন্দোলন সংগঠিত করার ব্যাপারে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে পিতা দ্বারকানাথের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথ ও সবিশেষ সচেতন ছিলেন। ১৮৬১ সালে দেবেন্দ্রনাথের আর্থিক সহায়তায় "ইন্ডিয়ান মিরর" নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। নবগোপাল মিত্র "ন্যাশনাল পেপার" প্রতিষ্ঠা করেন। এর পিছনেও ছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণা ও আর্থিক সহায়তা।

১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং উৎসাহদাতা। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মেলার সম্পাদক এবং নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক। স্বদেশী—দেশী সামগ্রী প্রস্তুত ও ব্যবহারে উৎসাহদান, মাতৃভাষার উন্নতিবিধান এবং শরীরচর্চা ছিল হিন্দুমেলার স্বীকৃত লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই ১৮৬৭ সালে বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম পরিচালনার জন্য জাতীয় আন্দোলনের মূল সোপান হিসাবে উক্ত আদর্শগুলিকেই স্বীকৃতিদান করা হয়েছে। হিন্দুমেলা প্রায় চৌদ্দ বছর স্থায়ী হয়।

ইংরেজ শাসকবর্গের কাছ থেকে সুযোগসুবিধা আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনই এতদিন একমাত্র উপায় হিসাবে চিহ্নিত ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনায় নিজশ্রেণীর জন্ম ও পূর্ণতালাভের সর্তগুলিকে অতিক্রম করা হয়তো সেদিন সম্ভব ছিল না। নিজ শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নিজশ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে স্থির নিশ্চয়তা তখনও গড়ে ওঠে নি। এগুলির উন্মেষ হতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। সেদিনের রাজনৈতিক পরিবেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে বিদেশী প্রভুর কাছে আবেদন নিবেদনের নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্তব্য পালন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ভারতীয়

মধ্যবিত্তশ্রেণী ইউরোপীয় সমগোত্রীয়দের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের সঙ্গে তখনও সম্যক পরিচিত হয়ে উঠতে পারে নি। ফরাসী বিপ্লব, ইউরোপীয় এনার্কিজম এবং রুশ নিহিলিজমের ইতিহাস ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছে সেদিন কোন বার্তা বহন করে আনে নি। দেশবিদেশের ঘটনাবলীর এইসব বিবর্তনের কাহিনী উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছে একপ্রকার অজানা ছিল বলা চলে।

রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-১৮৯৯) আবির্ভাবের সাথে সাথে জাতীয় আন্দোলনের এই বিনম্র দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের পরিবর্তন সূচিত হল। জাতীয় স্বাধীনতা-হীনতার জন্য তীব্র বেদনাবোধ এবং সর্বব্যাপী বে-পরোয়া দৃষ্টিভঙ্গী এই সময়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮৮৮ সালে দেশবাসীর উদ্দেশে রাজনারায়ণ বসু বলেন ঃ

"সর্ববিষয়ে বিদেশী অনুকরণের চাপে মৌলিকতা আজ মৃতপ্রায়। তোমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর বাক্যালাপ দেশী ও ইংরেজি ভাষার এক জঘন্য জগাখিচুড়ী যা মাতৃভাষাপ্রেমিকের কাছে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ও বেদনাদায়ক বলে বিবেচিত হয়। এমনকি ইংরেজদের কাছেও এ ব্যাপার পরিহাসজনক বলে মনে হয়। তোমাদের বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক সমূহ, বিশেষ করে ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক পুস্তকগুলি এমনভাবে লিখিত যে তরুণদের মনে কোন জাতীয় চেতনার উদ্রেক করে না... তোমাদের চারুকলা ও শিল্প যা অতীতে বিদেশীদের প্রশংসা অর্জন করেছে বা আজও করছে, এখন মৃতপ্রায়। যে সব শিল্পী ও কারিগর এইসব বস্তুর জনক, তারা আজ কর্মহীন ও অনশনক্লিষ্ট। তোমাদের দেশের ধনসম্পদ ও উপকরণ বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে; অপরদিকে আমাদের সামান্য দেশলাইটুকুর জন্যও ইংলন্ডের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। সাধারণ লবণ আমদের মুখের অন্নকে সুস্বাদ করে তোলে; সেটিকেও লিভারপুল থেকে আমদানী করতে হয়। সমুদ্রকূলবর্তী কোন দরিদ্র প্রজা যদি নিজ প্রয়োজনে সমুদ্রের জল ফুটিয়ে যৎসামান্য লবণ সংগ্রহ করে তবে বিদেশী শাসকের নিষ্ঠুর বিধানে তাকে দন্ডনীয় হতে হবে। দেশ দিনের পর দিন দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে অন্নহীনতা এতই ব্যাপক যে শাসকশ্রেণীর একজন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে অন্ততঃ পাঁচ কোটি মানুষ দৈনিক একাহারে দিন যাপন করে। এই ভয়াবহ অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য স্বনির্ভরতা এবং অন্যান্য নিয়মতান্ত্রিক ও বৈধ উপায়ে তোমরা কি নিরন্তর আন্দোলন করবে না? হতাশার গলিত আবরণে নিজেদের আবৃত করে রেখে তোমরা কি দিন কাটিয়ে দেবে? আমাদের বিদেশী প্রভুরা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, আমাদের সেবা করার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই এদেশে এসেছে—তোমরা কি এতই নির্বোধ যে এই বিশ্বাস মনে নিয়ে রাখবে? তোমরা কি বিশ্বাস কর যে নিজেদের বার্মিংহাম ও ম্যাঞ্চেষ্টারকে অবহেলা করে তোমাদের প্রভুরা তোমাদের কলা ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করবে? পদদলিত জাতির মানুষেরা! তোমরা কি জান না যে, পদানত জীবকে নিজ প্রচেষ্টাতেই উঠে দাঁড়াতে হয়?"

পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভ করতে হলে পদদলিত জাতিকে কি প্রচেষ্টা করতে হবে? যদিও রাজনারায়ণ বসু, "নিরন্তর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও অন্যান্য বৈধ উপায়ের" কথা বলেছিলেন তবুও বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের বৈধতায় তিনি পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। প্রয়োজনে এই উদ্দেশ্যে গুপ্তসমিতি গঠনেও তাঁর আপত্তি ছিল না। রাজনারায়ণ বসু প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতিতে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যোগ দিয়েছিলেন; এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ তিনি "জীবনস্মৃতি"তে বিবৃত করেছেন।

এই সমিতিতে দেশের শত্রু নিধনের জন্য বলপ্রয়োগের শপথ নিতে হত। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম অস্ত্ররূপে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার বিতর্ক রাজনারায়ণ বসু সুরু করেন এবং আন্দোলনের চরমপন্থী অংশ এই মতবাদকে সংগ্রামের প্রয়োজনীয় নীতিসঙ্গত কৌশল হিসাবে স্বীকার করেন। মান্যতা লাভ করলেও এই মতবাদকে সক্রিয় করে তুলতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এই কৌশলের রূপকার অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ এবং সত্যেন বসু। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন প্রথমোক্ত দুজনের মাতামহ এবং শেষোক্তের পিতৃব্য। অতঃপর জাতীয় আন্দোলন গৌরবময় বীরোচিত পথগ্রহণ করল—যদিও এই পথ ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের নিরর্থক অন্ধগলি।

একথা মনে রাখা দরকার যে জাতীয় আন্দোলনকে সক্রিয় রূপদানের জন্য যে সব ব্যক্তি প্রথমে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন পরম ধর্মপরায়ণ এবং প্রগাঢ় পন্ডিত। রামমোহন রায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দেবেন্দ্রেনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু এবং অন্যান্যেরা সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সুপরিচিত ধর্মপ্রচারক পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনিও জাতীয় আন্দোলনের সক্রিয় সৈনিক ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন ও ভারতের জাতীয় সংগ্রামের নেতা বিপিনচন্দ্র পাল শিবনাথ শাস্ত্রী সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "পন্ডিত শাস্ত্রীই জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ হওয়ার মন্ত্রে আমাদের প্রথম দীক্ষিত করেন। আমাদের একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হত। প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথম অনুচ্ছেদ বর্ণিত ছিল ঃ 'একমাত্র স্ব-শাসিত সরকারকেই আমরা ঈশ্বর নির্দেশিত সরকার বলে স্বীকার কবি।' শরীরচর্চা এবং জাতীয় আন্দোলনের কর্মীদের ব্যবহারের জন্য সমস্ত ব্যক্তিগত উপার্জন একত্রিত করার অঙ্গিকারও প্রতিজ্ঞাপত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিল।" জাতীয় আন্দোলন এতদিন রামমোহন রায় প্রচারিত নবজাগরণের ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পূর্বে বর্ণিত সংস্কৃতিবাণ ও বীরোচিত চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে জাতীয় আন্দোলনের কর্ণধার হিসাবে লাভ করায় সেদিনের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীগণ সত্যই ভাগ্যবান ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় চিন্তাধারায় এক নূতন প্রবাহের জন্ম দিলেন। নবজাগরণের আবহের মধ্যে বর্ধিত হলেও ধর্মীয় চিন্তাধারা ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে বিবেকোনন্দ (১৮৬৩-১৯০২) এবং ঐ ঐতিহ্যের মধ্যে প্রভেদ ছিল। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হিসাবে তিনি সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং সমাজ সেবার আদর্শকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে এই সকল আদর্শকে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারার অঙ্গীভূত করেছিলেন। এতদিন পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র ছিল সন্দেহপরায়ণ এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন; অতীতকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখার কোন প্রচেষ্টাই ছিল না। প্রচলিত রাজনীতি অথবা ঐতিহ্যকে উপযুক্ত বিচার বিতর্কের পরেই গ্রহণ অথবা বর্জন করার রীতি ছিল; অন্ধভাবে কোন কিছুকেই গ্রহণ অথবা বর্জন করা হত না। স্বামী বিবেকানন্দ কঠোর ভাষায় জাতিভেদ প্রথার নিন্দা করেছেন কিন্তু ঐ প্রথা বর্জনের আন্দোলনে কোন দিন অংশীদার হননি। তাই ঐ ঘৃণ্য প্রথার প্রতি বিবেকানন্দের আক্রমণ মৌখিক বিতর্কের মধ্যেই সীমিত রয়ে গেছে, কোনদিনই দৃঢ়বদ্ধ আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে নি। অপরদিকে বিবেকানন্দ তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ও উদগ্র উৎসাহ দিয়ে হিন্দু ধর্মকে পুরোপুরি সমর্থন জানিয়ে গেছেন। বিচার বিতর্কের দ্বারা ঐতিহ্যের সঠিক মূল্যায়ণ ও নবজাগরণের যুক্তিবাদ—এ সমস্তই ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের অযৌক্তিক

পূতিস্রোতে নিমজ্জিত হয়ে গেল। যাই হোক, চিন্তা ও বিচারের ক্ষেত্রে জাতীয় আন্দোলন যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হল, উচ্ছ্বাস ও আবেগ দিয়ে সেই ক্ষতির পূরণ হল। বিবেকানন্দ ছিলেন উদগ্র জাতীয়তাবাদী; স্বদেশের পরাধীনতায় তিনি গভীর মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করার কাজে অপ্রত্যক্ষে সদাসচেষ্ট ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সুপ্রসিদ্ধা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সাথে প্রথমাবধি একাত্ম ছিলেন। 'আবেদন নিবেদনের থালা'বাহী নরমপন্থীদের সাথে তাঁর কোন যোগ ছিল না। তাঁর সংযোগ ছিল মুক্তি আন্দোলনের চরমপন্থী অংশের সাথে—যাঁরা বোমা রিভলবার নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন। এই বিপ্লবীদের তিনি উৎসাহিত করতেন এবং বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে সাহায্য করতেন।

এইভাবে জাতীয় আন্দোলন, বিশেষভাবে এর বৈপ্লবিক অংশ হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। অতঃপর জাতীয় আন্দোলনের ভাবধারায় নবজাগরণ আন্দোলনের "সার্বিক জাতীয়তাবাদের" পরিবর্তে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের প্রাধান্য স্বীকৃত হল।

স্বাধীনতা আন্দোলনে বলপ্রয়োগের নীতি ইতিপূর্বে স্বীকৃত হলেও এই নীতির কোন সক্রিয় সাংগঠনিক রূপ এতদিন দেওয়া সম্ভব হয় নি। লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের ফলে বৈপ্লবিক আন্দোলন এক বিরাট সুযোগের সম্মুখীন হল। বাংলাদেশকে খন্ড বিচ্ছিন্ন করার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিটি বাঙ্গালী তৎপর হল এবং রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজে ব্রতী হলেন।

বিদেশী সরকার নিয়ন্ত্রিত তৎকালীন শিক্ষানীতি যে দেশের তরুণদের মনে জাতীয় চেতনা বিকাশের পরিপন্থী একথা জনমানসে দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছিল। শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতীয় ইতিহাসের ঘটনাবলীকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা হচ্ছিল। বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকগুলিতেও ভারতীয় জাতি ও এই জাতির সুকৃতিগুলিকে ঘৃণিত ও হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস ছিল। এই জঘন্য অপকর্মের প্রতিরোধের উপায় হিসাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), অরবিন্দ ঘোষ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বাংলাব স্বনামধন্য মনীষীগণ 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন" গঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। "জাতীয় আদর্শে ও জাতীয় পরিচালনায় বিজ্ঞান, সাহিত্য ও কারিগরী বিষয়ে শিক্ষা"কে কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপিত করলেন। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানালেন। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের পরিচালনাধীন প্রস্তাবিত কলেজের পাঠ্যসূচী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত হল।

জাতীয় আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বচ্ছবুদ্ধি নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ১৯০৭ সালে এক স্মরণীয় বক্তৃতায় বলেন ঃ

"এতদিন ধরে আপনারা কি শিক্ষালাভ করে আসছেন? জাতীয় জীবন এবং ইতিহাসের প্রত্যক্ষ ঘটনাবলীর সাথে এই শিক্ষার অতি অল্পই সংযোগ আছে। আপনাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গেও এর কোন যোগ নেই। কোন ভারতীয় নমুনা নয়, ব্রিটেনের নমুনা দিয়েই আমাদের উদ্ভিদবিদ্যা শিখতে হয়। ...আমাদের শিক্ষা করতে হয় ওক, এলম, বীচ গাছ

সম্বন্ধে; অথচ অমাদের বট, আম, চাঁপা বা আরও অগণ্য বৃক্ষরাজি অজ্ঞানে অবহেলায় পড়ে আছে। ...এই শিক্ষা ইংরেজ সরকার নিজ স্বার্থে এদেশে চালু করেছে। ...বিদেশী সরকারের আজ্ঞাবাহী হিসাবে সেবা করার জন্য এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষাদানের এটি প্রথম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এদেশে এমন এক শ্রেণীর মানুষ তৈরি করা যাদের স্বার্থ অবিমিশ্রিতভাবে সরকারী স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। ...অতএব জাতির মনীষা বিকাশের স্বার্থে—না তার চেয়েও বেশি, সমগ্র জাতির স্বার্থে আমাদের নিজেদের শিক্ষার ভার নিজেদেরই হাতে নেওয়ার দিন এসে গেছে। এর ফলে সমগ্র জাতির মন, প্রাণ ইচ্ছা ও শক্তি আমরা আমাদের ভাগ্যনির্ধারণের প্রচেষ্টার দিকে চালিত করতে পারব (ন্যাশানাল এডুকেশন)।"

অরবিন্দ ঘোষ এবং রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে স্বদেশী আন্দোলন শুধুমাত্র মর্মস্পর্শী গান বা কবিতা লাভ করে নি; ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রকৃত তাৎপর্য, গ্রামপুনর্গঠন, সমবায় আন্দোলন, ভাষা সমস্যা, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর দাক্ষিণ্য অপরিসীম।

ব্রিটিশ পণ্যবর্জনের পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের নয়। বিদেশী প্রসাশন বর্জন এবং সকলপ্রকার সরকারী কাজকর্ম থেকে স্বেচ্ছায় বিযুক্ত থাকার এক সবিস্তার পরিকল্পনা তিনি জাতির উদ্দেশে অর্পণ করেন। এক কথায় দেশবাসীকে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বিপিনচন্দ্র পাল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশপ্রেমের এক নূতন ধারণার জন্ম দিলেন। বিপিনচন্দ্র পালের এক প্রভূত অর্থবহ রচনার অংশ ঃ

"স্বদেশপ্রেমের পুরাতন অর্থ ভারতীয় নামে ইউরোপ আমেরিকার বাস্তবতার জন্য লালায়িত হওয়া; এই ধারণায় প্রকৃত ভারতীয় কোন বস্তুর স্থান নেই। এদেশের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-আকার-আয়তন-প্রকৃতি-ভাষা আদর্শ প্রতিষ্ঠান কোন কিছুই এই ধারণার মধ্যে আসে না। কেবল ভারতীয় নামের প্রতিই যতটুকু ভালবাসা। ...গত কুড়ি বছরের সামাজিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় প্রতিক্রিয়াগুলি আমাদের অন্ততঃ একটি উপকার করেছে—এই কাল্পনিক, অবাস্তব ও বিমূর্ত দেশপ্রেমের হাত থেকে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি। নূতন দেশপ্রেমের অর্থ ভারতের ভূপ্রকৃতির প্রতি সপ্রেম আচরণ। এদেশের নদীপর্বত, শস্যক্ষেত্র ও রুক্ষ মরুভূমি, নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর হলেও এদেশের পল্লী ও নগর, এদেশের বৃক্ষ-লতা ও পশুপক্ষী—এসবই আমাদের ভালবাসার ধন। এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এদেশের কুৎসিত ও বন্য বৃক্ষপ্রাচুর্য, এদেশের ঘর্মাক্ত নগ্নদেহপদ নরনারী ও অপরিষ্কৃতদেহ গ্রাম্য শিশুদল, প্রচলিত অর্থে শিক্ষা ও সভ্যতাহীন গ্রামের বধূ ও কুমারী—এ সকলেরই প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা এই দেশপ্রেমের অঙ্গ। ক্লাসিক থিয়েটারে সেদিন রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বলেছিলেন, কর্দমাক্ত আগাছাপূর্ণ গ্রাম্য গলিপথ, শেওলাঢাকা পুষ্করিণী, গ্রামের দরিদ্র অনশনক্লিষ্ট ম্যালেরিয়াজীর্ণ কৃষক, এদেশের ভাষা সাহিত্য ও দর্শন, এদেশের ধর্ম সংস্কৃতি ও সভ্যতা—এ সকলের প্রতি ভালবাসাই এই নূতন দেশপ্রেমের বিশেষত্ব।" রবীন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রচারিত এই স্বদেশপ্রেম হিন্দু বা মুসলিম জাতীয়তাবাদ নয়। এই স্বদেশপ্রেমকে বিপিনচন্দ্র "সার্বিক দেশপ্রেম" বলে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ১৯০৫ সালে তিনি বলেন ঃ

ভারতবর্ষ হিন্দুদের নয় যদিও তারা এদেশের প্রাচীনতম অধিবাসীদের অন্যতম। অপরদিকে এদেশ মুসলমানদেরও নয় যদিও তারা দীর্ঘদিন এদেশে আধিপত্য করেছে।

এই দেশ সমভাবে এই দুই মহান সম্প্রদায়ের। সাথেসাথেই আমরা অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কথা বিস্মৃত হতে পারি না। অতি প্রাচীনকাল থেকে তারাও আমাদের মিলিত সংস্কৃতি সভ্যতা ও ইতিহাসের মহান অংশীদার। আদিবাসী ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষেরাও ভারতীয় জাতির গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; তাদের স্বার্থ ও অধিকার পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য বলে বিবেচনা করতে হবে। এরা প্রত্যেকেই নবীন ভারতীয় জাতির অপরিহার্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ভারতীয় জাতির উন্নতিবিধানের অর্থ কোন বিশেষ শ্রেণী বা একাধিক প্রধান শ্রেণীর উন্নতি নয়, এর অর্থ নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ গঠন ও অতীত ঐতিহাসিক বিবর্তন অনুযায়ী প্রতিটি প্রত্যঙ্গের সমান উন্নতি। এককথায় সমগ্র দেশের উন্নতি।

সার্বিক জাতীয়তাবাদের এই সুমহান চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা "ভারততীর্থ" এ সুপরিস্ফুট হয়েছে ঃ

...দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে...
এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু, মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরেজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

১৯০৭ সালে বিপিনচন্দ্র এক স্মরণীয় বক্তৃতায় বলেন ঃ

"স্বদেশপ্রেম এক নিঃসর্ত সদ্‌গুণ। একমাত্র সার্বজনীন মানবতাবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই এই গুণকে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে, অন্য কোন বিবেচনাতেই নয়। স্বদেশ প্রেমের অনুভূতিকে বিশ্বমানবতাবাদের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এক সাথে চর্চা করতে হবে।"

এইভাবে একদিকে যেমন সার্বিক জাতীয়তাবাদের উত্থানের ফলে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ তথা জাতীয়তাবাদ পরিত্যক্ত হল, অপরদিকে জাতীয়বাদের সাথে বিশ্বমানবতাবাদের সংযোগ স্থাপিত হল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রণী অংশ কর্তৃক একদিকে যেমন গোষ্ঠীবাদ, সংকীর্ণতাবাদের ও উগ্র স্বদেশীয়ানা বর্জিত হল এবং অপরদিকে ভারতের জাতীয়তাবাদী আকাঙ্খার সাথে বিশ্বমানবতাবাদের আদর্শের যে কোন বিরোধ নেই সেকথাও তাঁরা আবিষ্কার করলেন। স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গঠনে স্থির নিশ্চয় হওয়ার পর নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি নির্ণয়ে ব্যাপৃত হলেন।

ফিরোজশা মেটা ও তাঁর অনুগামীগণ কর্তৃক প্রচারিত "অনুগত দেশপ্রেম" এর আদর্শ ঘৃণাভরে পরিত্যক্ত হল। ২৫ শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৫ তারিখের "নিউ ইন্ডিয়া" পত্রিকায় বিপিন চন্দ্র লিখলেন, "স্বীকার করি আমাদের আদর্শ বৈপ্লবিক। কিন্তু বৈপ্লবিক পন্থায় আদর্শকে অর্জন করার প্রচেষ্টা আমাদের নেই—আমাদের ধারণা এই পথে আদর্শের রূপায়ণ সম্ভবও নয়। আমাদের সর্বোচ্চ দেশপ্রেমের আদর্শ অনুগত শুধু এই অর্থে যে এই দেশপ্রেম আইন মান্যকারী। অন্য কোন অর্থেই নয়।"

এই প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র আরও লিখলেন, "আমাদের মনে ব্যক্তিগত অনুভূতি রূপে

আনুগত্যের উদ্রেক হওয়া সম্ভব নয়। দেশে এ আবেগের কোন বাস্তবতাও নেই। ...রাজা এডোয়ার্ডের ভারতীয় প্রজাবৃন্দ আজ যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অমর্যাদায় অধিষ্ঠিত সেই অবস্থায় কোন ইংরেজ রাজশক্তির প্রতি অকপটে অনুগত থাকতে পারেন না। ...১৮৭৭ সালে দিল্লিদরবারে আমাদের আনুগত্যের শপথ উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হবার পরেও আমরা পেলাম লর্ড লিটনের অস্ত্র আইন ও দেশীয় সংবাদপত্র আইন। ...এই পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী যে আমরা যাদের বিশ্বাস অর্জন করতে চাই তারা আমাদের আনুগত্যের শপথে বিশ্বাস করে না। তাহলে এই বৃথা প্রচেষ্টায় আমাদের শক্তিক্ষয় করে লাভ কি?"

নরমপন্থীদের "অনুগত দেশপ্রেমের" আবর্জনা এইভাবে দূর হয় এবং ভারতীয়দের পক্ষে ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতি অনুগত থাকার অসম্ভাব্যতার কথা প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়। বিদেশী শাসকের কাছে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আবেদন-নিবেদনের আর কোন প্রয়োজন নেই। দেশপ্রেমের নূতন চেতনা দেশবাসীর হৃদয় উদ্বেল করে তুলেছে। এই নবচেতনার কণ্ঠদান করে ১লা অক্টোবর ১৯০৬ তারিখে বিপিনচন্দ্র লিখলেন, "পরনির্ভরতার পুরাতন ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। ...পুরাতন ধারণা অনুসারে রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সরকারের হাত থেকে দান হিসাবে পাওয়া যায়। নূতন চিন্তাধারায় নিজ শক্তি ও বিবর্তনের মধ্য দিয়েই জনগণ সেই পরিণতিতে উপনীত হবেন। ভারতের আকাশে বাতাসে আজ আত্মপ্রত্যয় ও স্ব-নির্ভরতার সুর ধ্বনিত হচ্ছে। এই নূতন সংবেদনশীল দেশপ্রেমের ভাবধারায় দাসত্ব বা পরনির্ভরতার কোন স্থান নেই।" দেশবাসীকে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানালেন যে ইংরেজ শাসকের দ্বারে ভিক্ষার প্রত্যাশায় দিনাতিপাত না করে নিজ জমিতে আগাছা পরিষ্কার করাও শ্রেয়।

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ শাসনমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্ব-শাসনের ধারণা জন্ম নিয়েছিল। স্বাধীনতা ও দাসত্বের মাঝামাঝি কোন অবস্থানই আর গ্রাহ্য নয়। স্বাধীনতা ও পূর্ণ স্বাধীনতার বিভেদ বিচারের কূট তর্কে স্বদেশী নেতৃবৃন্দ দিনক্ষয় করেন নি।

চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী পত্রিকা "বন্দেমাতরম" এ বিপিনচন্দ্র পাল লিখলেন ঃ

"সত্য, সামাজিক প্রগতি ও জনগণের স্বাধীনতার স্বার্থে আমাদের ব্রিটিশ বন্ধুদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জবাব দেবার দিন আজ এসে গেছে। সুস্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দিতে হবে যে নিজেদের দায়িত্ব লাঘব করার চেষ্টায় সরকার যে অতি অল্প সংখ্যক সৎ কাজ করেছেন আমরা সেজন্য কৃতজ্ঞ; কিন্তু আমাদের মুক্তি ও প্রগতির জন্য বিদেশী প্রভুর নেতৃত্ব মেনে নিতে আমরা আর রাজি নই। তাদের দৃষ্টিকোণের সাথে আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গির কোন মিল নেই। নিজেদের প্রভূত্ব বর্জন না করে ভারত সরকার জনপ্রিয় হতে চান। অপরদিকে আমাদের লক্ষ্য ব্রিটিশ প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল সরকার।"

স্বদেশী আন্দোলনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণায় এই অবস্থারই নাম স্বরাজ—নিজ শক্তি বলে অর্জিত "প্রকৃত জনগণের স্বরাজ।" বিপিনচন্দ্রের ভাষায় "সমগ্র ভারতীয় জনগণের স্বরাজ, কোন বিশেষ গোষ্ঠী স্বরাজ নয়।" স্বদেশী আন্দোলনের এই লক্ষ্যই নির্দিষ্ট হল।

স্বরাজ অর্জনের পন্থা বা উপায় কি? —এই প্রশ্নই স্বতঃই জনগণ ও নেতৃবৃন্দের মনে জাগরূক হল। এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া গেল তা কোনক্রমেই গতানুগতিক বা অস্পষ্ট

ছিল না। ধোঁয়াটে ভাষায় স্ব-নির্ভরতা বা স্বকীয় প্রচেষ্টার কথা বলা হল না; স্বরাজ অর্জনের জন্য সুস্পষ্ট এক কর্মসূচী উপস্থাপিত হল। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের আহ্বান জানানো হল। সরকারী প্রশাসন ও আমলাতন্ত্র থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে থেকে জাতীয় শিক্ষা প্রচারের জন্য নিজস্ব সংগঠন স্থাপন এবং যতদূর সম্ভব স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আহ্বান জানালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এক সর্বাত্মক অস্ত্র। জাতীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য সংগঠন, কুটীর শিল্পের প্রসার ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন—এসমস্তই ঐ প্রতিরোধের অঙ্গ। কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কেবলমাত্র নেতীবাচক আন্দোলন নয়; জনগণের পূর্ণ সঙ্গতি ও সহযোগ একত্রিত করে সরকার বিরোধীতার জন্য নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন স্থাপনের মতো ইতিবাচক কর্মসূচীও এই আন্দোলনের স্বীকৃত আদর্শ ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কোনক্রমেই নিষ্ক্রিয় কর্মপন্থা ছিল না। ১৯০৭ সালে মাদ্রাজে প্রদত্ত "স্বরাজ ঃ পথ ও উপায়" শীর্ষক এক বক্তৃতায় বিপিনচন্দ্র পাল বলেন ঃ

"এদেশে স্বরাজের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার উপায়, পথ বা অস্ত্র কি? সাধারণভাবে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলে আমি বলব যে রাজনীতিশাস্ত্রে যাকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বলে সেই পন্থার মধ্যেই এই প্রশ্নের জবাব নিহিত আছে। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ব্যতিরেকে কোন প্রতিরোধই ঘটতে পারে না। ...তাহলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অর্থ কি? এর অর্থ এই নয় যে এই প্রতিরোধ সক্রিয় নয়। পক্ষান্তরে এই প্রতিরোধ আক্রমণাত্মক প্রতিরোধ নয়। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অ-সক্রিয় প্রতিরোধ নয়—অনাক্রমণাত্মক প্রতিরোধ। এদেশে এখনও পর্যন্ত প্রচলিত আইনের সীমানার মধ্যে নিজ অধিকারের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আইন আমরা ততদিনই মান্য করব যতদিন এই আইন আমাদের মূল অধিকারগুলিকে মান্য করবে। এই অধিকারগুলি সরকার সৃষ্ট নয়, অতএব কোন সরকারই এগুলিকে খর্ব করতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত এই সরকার সৃষ্ট আইনগুলি আমাদের জীবন, ধন, সম্পত্তি বা অনুরূপ মৌলিক অধিকারগুলির সুরক্ষার দায়িত্ব নেবে ততদিনই আমাদের আন্দোলন আইনের সীমানায় সীমিত থাকবে। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অর্থ জনগণ প্রদত্ত বিধিসঙ্গত প্রতিরোধ।"

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিদেশী পণ্য বর্জন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অন্যতম অঙ্গ ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী সর্বাপেক্ষা মারাত্মক এই অস্ত্রের ব্যবহারের দাবী ক্রমে প্রবল হয়ে উঠল এবং বিদেশী বর্জন আন্দোলন সবেগে সুরু হয়ে গেল। নিজ অর্থে এই আন্দোলন নেতিবাচক; সেজন্য আন্দোলনকে গঠনমুখী করার উদ্দেশ্যে স্বদেশী শিল্প ও কলার পুনরুজ্জীবন ও বিকাশের কার্যক্রম রচিত হল। ১৯০৭ সালে বিপিনচন্দ্র বললেন,

"বিদেশী পণ্যের বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ নীতি এদেশে সম্ভব নয়। কিন্তু বিদেশী পণ্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে দেশী শিল্পকে কিছু পরিমাণে সংরক্ষিত করা যায়। বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলনের মূল ভিত্তি এই ব্যবহার নিয়ন্ত্রিকরণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আমাদের কাছে বর্জনের অর্থ সংরক্ষণ। বর্জনের অর্থ জনগণের উপরেই সংরক্ষণ শুল্ক ধার্যকরণ...অপ্রত্যক্ষভাবে বিদেশ থেকে আমদানীর উপরেও এই শুল্ক ধার্য হবে।"

বর্জন আন্দোলনের অর্থনৈতিক খুঁটিনাটি বিচার না করেই অন্ধভাবে এই আন্দোলন

সুরু হয় নি। স্বদেশী শিল্পকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করার জন্য দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং দেশী শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে বিদেশী পণ্য ব্যবহার করতে নিষেধ জানানো হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র বলেছেন ঃ

"আমরা তিনটি বা চারটি পণ্য বর্জনের উপর জোর দিয়েছি। এগুলি হল কাপড়, লবণ, চিনি, এনামেল দ্রব্য, কিয়ৎ পরিমাণে কাঁচের দ্রব্যাদি এবং সাধারণভাবে বিলাস সামগ্রী। সকল প্রকার বিদেশী পণ্য বর্জনের কথা আমরা কখনও বলিনি।"

শুধুমাত্র স্বদেশী শিল্প ও কলা সংরক্ষণের অর্থনৈতিক অস্ত্র হিসাবেই কি বর্জনের উপযোগিতা? একে কি অর্থনৈতিক স্বাদেশিকতা বলা যায়? নরমপন্থীরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবেই বর্জনের কথা বলেছেন এবং বারবার অর্থনৈতিক স্বাদেশিকতার কথা বলেছেন। বিপিনচন্দ্র এই মূঢ় ধারণাকে সমূলে বিনষ্ট করেছেন। তিনি বলেন ঃ

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা স্বাধীন দেশেই সম্ভব। ...যে দেশ স্বশাসিত এবং শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগামী সে দেশেই এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে অর্থনৈতিক স্বাদেশিকতা ইংলন্ডে সম্ভব; এদেশে শিল্প উৎপাদন অতি উচ্চপর্যায়ে পৌঁচেছে। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতায় ভারতের স্থান অতি পিছনে। এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত এ কাঁচামালের ভান্ডার অপরিসীম। কিন্তু এই সম্পদ ও কাঁচামাল ব্যবহার করে ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী উৎপাদন করার কোন ব্যবস্থা বা কারখানা এদেশে নেই। এই অবস্থায়, বিশেষ করে এই দেশ যখন অপর জাতির পদানত এবং ঐ পণ্য উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী দেশ যখন শাসক হিসাবে নিজ দেশ ও ব্যবসায়ের স্বার্থে এদেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে—তখন এই দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক স্বাদেশিকতা একেবারেই অসম্ভব।"

অর্থনীতি কোন সময়েই রাজনীতির সংশ্রব বিবর্জিত নয়। অতএব অর্থনৈতিক স্বাদেশিকতা বা "সৎ স্বদেশিকতা" (ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতীয়দের এই নীতি গ্রহণের উপদেশ দিয়েছে) অসম্ভব বস্তু। বিপিনচন্দ্রের ভাষায় "সৎ, অরাজনৈতিক এবং সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক স্বাদেশিকতার নীতিকে অবাস্তব বলে গণ্য করুন।" বিদেশী বর্জন আন্দোলন শুধুমাত্র আন্দোলন ছিল না। বিপিনচন্দ্রের মতে ঃ

"এটি রাজনৈতিক অস্ত্র—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অস্ত্র। অপর জাতির প্রভুত্বের ফলে সৃষ্ট বৈষম্যকে প্রতিহত করা এই অস্ত্রের দ্বারাই সম্ভব। ...এই আন্দোলন শুধুমাত্র স্বদেশী শিল্পের সংরক্ষণের জন্য জনগণের কৃতসংকল্পতার ঘোষণাই নয়; এই আন্দোলন স্বরাজের সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য কর্মরত নুতন শক্তিসমূহেরও জন্মদান করবে। ...এই বর্জন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনমানসে একদিকে যেমন "পররাজ"-এর স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দেবে, অপরদিকে স্বরাজের জন্য তীব্র আকাঙ্খাও মূর্ত হয়ে উঠবে। সরকারী স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে জনগণের দৃঢ় সংকল্পের ঘোষণা ও আইনসম্মত প্রচেষ্টার ফলেই আমাদের মনে যে মায়ার সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান ঘটবে। এইভাবেই রাজনীতিগতভাবে বর্জন আন্দোলনের অবসান হবে এবং সরকার পক্ষকে অবদমিত করা সম্ভব হবে।"*

আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে সরকারী প্রশাসনের সমান্তরাল গণপ্রশাসনের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছিল। এই কর্মসূচী গ্রহণের অর্থ স্বায়ত্বশাসনের কলাকৌশলের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ। কিন্তু এই কর্মধারা তখনই সফল হবে যখন ভারতের অগণ্য গ্রামগুলিকে

সংগঠিত করা সম্ভব হবে। এই কারণেই স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ গ্রামজীবনের সুসংগঠনের উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও পল্লী পুনর্গঠনের বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। গ্রাম সংগঠনই স্বরাজের ভিত্তিভূমি—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের বাণী। বিপিনচন্দ্র পালও বিভিন্ন বক্তৃতা ও রচনায় এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। বর্জন প্রসঙ্গে বক্তৃতায় তিনি বলেন, "বর্জনের দ্বারা এইসব লক্ষ্য অর্জিত হওয়া সম্ভব; কিন্তু যথেষ্ট প্রশিক্ষণের অভাব ঘটলে স্বশাসন কোনদিনই বর্জনকারীদের করায়ত্ব হবে না। গ্রামজীবনের সংগঠন এবং ক্রমান্বয়ে তালুক ও জেলা সংগঠনের মধ্য দিয়েই এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। প্রচলিত সরকারী প্রশাসন বিমুক্ত সমান্তরাল গণপ্রশাসন প্রস্তাবকে আমি আমাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি।"

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেই ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল। আদর্শের ক্ষেত্রে বিশ্বমানবতাবাদ জাতীয়তাবাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বলে স্বীকৃত হয়েছিল। প্রয়োগগত ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, বিদেশী বর্জন, জাতীয়শিক্ষা, পল্লী পুনর্গঠন ও সমান্তরাল প্রশাসন গঠনের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের চিন্তাধারার গভীরতা এবং ঘোষণা সমূহের মহান আদর্শবাদ সত্যই অপূর্ব। এই আন্দোলনের ফলেই সৃষ্ট জাতীয় আন্দোলনের যুগের চিন্তাধারা ও বক্তব্য পূর্বযুগের মহত্বকে কোনদিনই অতিক্রম করে যেতে পারি নি।

অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রণয়নের কালে মহাত্মা গান্ধী স্বদেশী আন্দোলনের কর্মধারা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজ চরিত্রের অসাধারণ প্রাণবন্ততায় এই আদর্শকে ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে কোনদিন ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারী চিন্তা ও কর্মের দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত হতে পারেন নি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সৃষ্ট আদর্শকে লোকগ্রাহ্য করার প্রচেষ্টার ফলে এই ভাবধারায় ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদ ও সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার অনুপ্রবেশ ঘটল। গান্ধীজী কর্তৃক অহিংসা ও মানবতার উপর গুরুত্ব দেওয়া সত্বেও সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে আদর্শবাদের এই অবনমন বিশেষভাবে লক্ষিত হল। এইভাবে লোকগ্রাহ্য করার প্রচেষ্টায় স্বদেশীযুগের আদর্শবাদের যতটুকু লাভ হল, অসহযোগ আন্দোলনের যুগের চিন্তাধারায় যুক্তিবাদের দৈন্যে ও অগভীরতায় তার সবটুকুই বিনষ্ট হল।

সমকালীনতা ও আধুনিকতা

প্রতিটি কাল তার দাবি নিয়েই হাজির হয় বিশ্বের দরবারে। এটা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। খণ্ড কালের রাজ্যের বাসিন্দে মানুষের নানান অভাব আছে, নানা অসঙ্গতির সঙ্গে তাকে যুঝতে হয়, তার জীবনের নানা ধরনের অপূর্ণতা পূর্ণতার দিকে হাত বাড়ায়। মানুষের ইতিহাসে এর নজির অফুরন্ত। তাই আমাদের কালেও যে এ কালের মানুষ তার দাবি নিয়ে হাজির হবে সমাজের বিচারশালায় এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

শুধু একটি বিশেষত্ব এ কালে দেখা দিয়েছে। এ কালের মানুষ শুধু দাবি জানিয়েই ক্ষান্ত নয়, দাবিগুলির উপর নানা ধরনের লেবেল না লাগানো পর্যন্ত সে কিছুতে খুসি নয়। এই লেবেলগুলি ভাবুক ও চিন্তাশীল মানুষের সৃষ্টি হলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো, তা হলে ভুল লেবেলের দৌরাত্ম্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতো একদিন না একদিন। কিন্তু সেটি হওয়ার নয়। এ কালের সব লেবেলগুলি সমষ্টির কারখানায় তৈরি হয়, রাজনৈতিক দলের আখড়ায় লেবেলের উৎপত্তি। তার ফলে যারা লেবেল দেখে জিনিস সংগ্রহ করতে যাচ্ছে, তারা যা চায় তা না পেয়ে তার জায়গায় অন্য সওদা নিয়ে ঘরে ফিরছে।

ভুলের আর ক্ষতির বহর যদি এখানেই শেষ হ'ত তা হলে এটাকেও না হয় কোনো রকমে সহ্য ক'রে নেওয়া যেতো, কিন্তু এখানেই এর ক্ষান্তি নয়। বিপদটা হচ্ছে এইখানে যে ভুল জিনিস লেবেলের মহিমায় আসল জিনিস বলে চলে যাচ্ছে সমাজে। মানুষ লেবেল-পূজারী হয়ে পড়েছে, জিনিস চেনবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। প্রচার এখন বিচারের জায়গা গ্রহণ করেছে, শ্লোগান ও লেবেল এখন বিশ্লেষণ ও বস্তুর মূল্য যাচাই করবার প্রচেষ্টার জায়গা দখল ক'রে নিয়েছে।

এই লেবেল-পূজারী যুগে শব্দগুলির অপব্যবহার নিত্যই ঘটছে। 'রাষ্ট্রীয়করণ' শব্দটি সোশালিজমের লেবেল মেরে স্বচ্ছন্দে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয় একালীয়তা যার অন্য দুটি নাম হচ্ছে সাম্প্রতিকতা ও সমকালীনতা, সেটি আধুনিকতার লেবেল মেরে শুধু অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিতদের আসরে নয়, সংস্কৃতিবানদের আসরেও তার কদর জমিয়ে নিয়েছে। একালীয়তা, আধুনিকতার ছদ্মবেশে ভয়াবহ একটি খেলা শুরু করেছে মানুষকে ঠকাবার।

প্রতিটি কালের কতকগুলি দাবি থাকে। সেই দাবিগুলি সেই যুগের বিশেষ কতকগুলি লক্ষণ-সমন্বিত ও তারা সেই কালের সমাজের বিশেষ অবস্থার প্রতিক্রিয়া। সে দাবিগুলি

মিটে গেলে তাদের আর কোনো মূল্য থাকে না। একটি বিশেষ কালের মানসিকতার দ্বারা সেই দাবিগুলি রচিত হওয়ায় সেই কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দাবিগুলির যথার্থতা থাকে না আর। মেয়ে জন্মালে তাকে গঙ্গাতে বিসর্জন দেওয়া, পাঁচ বৎসরের মেয়ের বিয়ে দেওয়া গৌরীদানের মাহাত্ম্য রচনা ক'রে, কিম্বা সতীত্বের মহিমা কীর্তন ক'রে স্ত্রীকে মৃত স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়ে মারা—এ সব একটি বিশেষ কালের সমাজের আচার ও বিধির অঙ্গ ছিল, সেগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তুল্লো সমকালীন মানুষ, তারই ফলে সেই রীতি ও বিধিগুলি বর্জিত হ'ল সামাজিক জীবন থেকে।

চাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করতো জমিদারেরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশে। সারারাত তাদের জলার ব্যাঙ তাড়াতে হ'ত যাতে জমিদারের ঘুমের ব্যাঘাত না করে বাঙের ডাক। গ্রাম ছেড়ে চাষীদের অন্য জায়গায় যাওয়ার উপায় ছিল না, গেলে কঠোর শাস্তি পেতে হ'ত। এই সব বর্বরতা দূর করবার জন্যে ফরাসী দেশের তৎকালীন সমাজে দাবি জানালো চাষীরা, সমর্থন পেলো তারা সহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে—ফরাসী বিপ্লবের আগুনে সব অত্যাচার পুড়ে ছাই হয়ে গেলো।

সমাজ তার চলার বাধা এমনি করেই দূর ক'রে নেয় যুগে যুগে। সমাজের মোড়লরা যে সব বাধা সৃষ্টি করে জনসাধারণের সুখ সুবিধার বিরুদ্ধে, সংঘাতের দ্বারা, মোড়লদের সেই শ্রেণীগত স্বার্থপরতাকে চূর্ণ ক'রে এগিয়ে যাওয়ার পথ ক'রে নেয় সাধারণ মানুষ। এই হ'ল মানবসমাজের এগিয়ে চলার মূলসূত্র। কিন্তু এই এগিয়ে-চলার দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে জনসাধারণের চাহিদা মেটানোর দিক। এই চাহিদাগুলি মিটলেই জনসাধারণ খুসি—তার বেশি তারা চায় না। তাদের চাহিদাগুলির সীমা ছাপিয়ে আর যে কিছু দাবি থাকতে পারে এ বোধও জনসাধারণের নেই। তাই সংঘাতের সময়, বিপ্লবের সময় যে সাহিত্য সাধারণত গড়ে ওঠে তার মধ্যে সমাজের মোড়ল শ্রেণীর বিরুদ্ধে সমাজের অন্য শ্রেণীদের অভিযোগ ও দাবির ফিরিস্তিই সব জায়গা জুড়ে থাকে ; ততঃ কিম্—তার পরে কি?—তার ইঙ্গিত বা নির্দেশ কিছুই থাকে না সেই সাহিত্যে। শুধু থাকে না যে তাই নয়, যদি কোনো সাহিত্যিক তার লেখায় এইসব চাহিদার জয়গান করা ছাড়া আরো কিছুর কথা বলে, বলে যে এই চাহিদাগুলির সীমানা বা গণ্ডি পার হয়ে মানব সমাজের একটি পরিণতি আছে, তারই নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে জীবনের নানা দিক থেকে, তা হলে জনসাধারণ ও তাদের যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁরা সেই সাহিত্যকে প্রতিক্রিয়াশীল ও জনস্বার্থবিরোধী সাহিত্য বলে জাহির করতে কুণ্ঠিত হন না। ফরাসী বিপ্লবের সময়েও তাই হয়েছে, রুশীয় বিপ্লবের সময়েও সেই একই অবস্থা।

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে এক ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল যেগুলিকে চাষীদের ও মধ্যবিত্তদের সব অভাব অভিযোগের লম্বা ফর্দ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস অনুশীলনের পক্ষে সেগুলি মূল্যবান হলেও তাদের কোনো সাহিত্যিক মূল্য আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেই একই কালে কিছু প্রবন্ধ, নাটক, গান ও ছবি সৃষ্টি হয়েছিল যেগুলি সেই কালের সীমা অতিক্রম ক'রে চিরকালের এলাকায় আপনার স্থান ক'রে নিল।

রুশীয় বিপ্লবের যুগে শ্রমিক-সাহিত্য নামধেয় নানা ধরনের বই প্রকাশিত হ'ল। সেগুলিতে মজুরদের অর্থনৈতিক দাবিগুলিকে নানাভাবে তুলে ধরা হ'ল আর যারা মজুরদের সব দাবিগুলি মানতে রাজী নয়, কিম্বা মজুরেরা যা করছে তা সবই সোশালিজমের অনুকূল নয় বলবার সাহস করেছিল তাদের বুর্জোয়া বলে নরকে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হ'ল। কয়েক বছর আলুর চাষ ভালো হয় নি, তাই কি ক'রে আলু চাষ বাড়িয়ে আলুর ঘাটতি কমানো যায় সে সম্বন্ধে আর রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপর কবিতা লিখে দিমিয়ান বিয়েদনি উঁচু দরের কবি বলে প্রশংসা লাভ করলো স্টালিনের আমলে। তার মানসী প্রিয়ার কপোল দুটিতে আপেলের রঙ আর তার আঙ্গুলগুলি আগুনের শিখা এই কল্পনার জন্য একজন কবি 'বুর্জোয়া' বলে নিন্দিত হল, কেন না শ্রমিক-নারীর কপোল আর হাতের আঙ্গুল কখনো এ রকম হতে পারে না। শ্রমিক-সাহিত্যের সমর্থকরা বলেন যে কবি নিশ্চয়ই কোনো বুর্জোয়া মেয়ের প্রেমে পড়েছে।

তাই, শ্রমিক-সাহিত্য বলে যা চললো রাশিয়ায় সেটাতে জীবনের আসল ছবি পাওয়া গেলো না, পাওয়া গেলো দৈনিক পত্রিকার নানা সাময়িক খবর কবিতার রূপে আর শ্রেণীগত স্বার্থের চশমা পরে পৃথিবীকে ও মানুষকে দেখা ফলস্বরূপ যে প্রবন্ধ, গল্প, নাটক বা উপন্যাস লেখা হ'ত, সেগুলিকে সাহিত্য বলে চালিয়ে দেওয়ার করুণ ও ব্যর্থ প্রয়াস। যে বাস্তবটা পথে ঘাটে রোজ চোখে পড়ে সেটাকে হুবহু ধ'রে দেওয়ার কাজ সংবাদপত্রের লেখকের, আর এই বাইরের ঘটনাগুলির অন্তরে যে সূত্রটুকু আছে, যে শক্তিগুলি কাজ করছে সেগুলিকে ধ'রে দেওয়া হচ্ছে সাহিত্যিকের কাজ। বাইরের বাস্তবকে বাদ দিতে কিম্বা এড়িয়ে যেতে বলছি নে আমি আদবেই। বাইরের বাস্তবকে একটি বিশেষ শ্রেণীর বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে তাকে সর্ব মানুষের সমস্যায় পরিণত করবার কথা বল্‌ছি। আর নতুন জগৎ গড়ে তোলবার কল্পনার ও প্রয়াসের সঙ্গে তার যে নিবিড় যোগ আছে সেটাকে দেখিয়ে দেওয়ার কথা বলছি।

এই ধরনের সাহিত্যও যে কিছু সৃষ্টি হয় নি সোভিয়েত রাশিয়ায় তা নয়। গর্কিকে বাদ দিয়ে বল্‌তে হয় কেন না গর্কি সোভিয়েত্ রাশিয়ার মানসমৃত্তিকা-জাত নন, তিনি বিশ্ব-মানসপুত্র। সোভিয়েত্ রাশিয়ায় যাঁরা এই ধরনের কাব্য কিম্বা উপন্যাস রচনা করেছিলেন তাঁরা প্রশংসা তো পানই নি, বরঞ্চ নিন্দিত ও নিগৃহীত হয়েছেন সোভিয়েত্ সমাজে।

সমকালীন সমাজে একটি নতুন দেবতার আবির্ভাব হয়েছে—সেই দেবতা হচ্ছে গণদেবতা। এই দেবতার জৈবিক ক্ষুধার দাবি আমি মানি ও সেগুলি মেটাবার প্রয়োজন আমি স্বীকার করি, কিন্তু চাহিদাকে যারা কথায় গেঁথে 'সাহিত্য' আখ্যা দিচ্ছে আর দাবি করছে আধুনিকত্বের, তাদের সেই দাবি আমি আদবেই স্বীকার করি না।

এই গণদেবতা সম্বন্ধে লেনিনের কিন্তু একেবারেই কোনো মোহ ছিল না। 'কি করণীয়' (What Is To Be Done) নামক তাঁর বইতে লেনিন লিখেছেন যে, জনসাধারণের আন্দোলনের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে অর্থনৈতিক ফয়দা ওঠানোর দিকে, সোশালিজমের দিকে নয়। কিছু সুবিধে পেলেই তারা খুশি। মানবসমাজের পুরণো কাঠামো ভেঙ্গে নতুন কাঠামো

রচনা করবার কোনো ধারণা তাদের নেই। সোশালিজমের আদর্শ ও ভাবধারা তাই জনসাধারণের মধ্যে বাইরে থেকে আমদানী করতে হবে। এই ভাবধারার বাহক যারা তারা হবে মানব-ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তার গতির নির্দেশ সম্বন্ধে সচেতন, শুধু অর্থনৈতিক নয়, সমাজনীতিক ও ব্যক্তিসত্তাভিত্তিক পরিবর্তনের মূল কোথায়, সে বিষয়েও তারা হবে স্বচ্ছধারণাসম্পন্ন।

জনগণের অর্থাৎ সমষ্টিগত মানুষের ধারণা, ভাব ও অনুপ্রেরণা তাই সমকালীনতার চৌহদ্দির মধ্যেই আটক থাকে, সেই চৌহদ্দি অতিক্রম করবার ধারণা তাদের নেই। জনসাধারণের জীবনে সে ধারণা এনে দেয় সোশালিজমের জ্ঞান আছে যাদের মানবসমাজের গতি সম্বন্ধে চেতনাসম্পন্ন সেই ব্যক্তিরা। এই কারণেই জনসাধারণের দাবিদাওয়া নিয়ে লিখলেই সে সাহিত্য 'আধুনিক সাহিত্য হবে এই ধারণা সত্য নয়। সে সাহিত্য সমকালীন সাহিত্য বলে নিজেকে জাহির করলে আপত্তি করবার কোনো কারণ থাকে না, কিন্তু আধুনিকতার দাবি করলে সে দাবি মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সৃষ্টিশীল বিপ্লবসত্তা ব্যক্তির লক্ষণ, সমষ্টির নয়। মজুর মাত্রেই বিপ্লবী নয়, সে বিদ্রোহী হতে পারে ; বিপ্লবী নয়। যে অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে সে বাস করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাবে খুবই স্বাভাবিক কিন্তু সেটাকে বিপ্লবী মনোভাব বল্‌লে ভুল করা হবে। বিদ্রোহ হচ্ছে সমকালীন সমাজের কাঠামো বদল না ক'রে সেই কাঠামোর মধ্যেই কতকগুলি বিশেষ অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়াস। বিপ্লব হচ্ছে ভবিষ্যতের সমাজের রূপ কি হবে, কোন মানবীয় আদর্শের উপর সেই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই মতবাদের উপর ভিত্তি ক'রে সমাজের কাঠামো বদলের সংগ্রাম।

সাহিত্যের সমকালীনতার সঙ্গে সাহিত্যের আধুনিকতার প্রভেদ এইখানেই। সমকালীন সাহিত্যে তৎকালীন জনসাধারণের চাহিদা গুলিকে আদর্শ বলে ধ'রে নেওয়া হয় ও সেই চাহিদাগুলিকেই সাহিত্যের রূপ প্রকাশ করাই হ'ল তার উদ্দেশ্যে। সে সাহিত্য অধিকাংশক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তার বিরুদ্ধ, সমষ্টি-সমর্থক ও দল-সমর্থক সাহিত্য। ফরাসী বিপ্লবের কথা আগেই বলেছি। তখনও দু জাতের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল—সমকালীন সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য। সমকালীন সাহিত্যে ফরাসী দেশের চাষীদের আর মধ্যবিত্তদের অভাব অভিলাসের কথা রূপায়িত হয়েছিল আর সেই সময়ের আধুনিক সাহিত্যে শ্রেণীর দাবি সর্বমানবীয় দাবির রূপ নিয়ে খণ্ডকালের বাঁধন কাটিয়ে চিরকালের দরবারে আপনার স্থান ক'রে নিয়েছিল। একটা সাহিত্যে ধ'রে দেওয়া হ'ল গ্রামের চাষীদের ও শহরের মধ্যবিত্তদের দাবি। আর একটা সাহিত্যে রণিত হ'ল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার সুর, ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশের দাবি, তার স্বাধীনতার ও একচ্ছত্র অধিকারের কথা। আর একটি সাহিত্যে একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীর কথা প্রকাশ পেলো, তার সাহিত্যিক রূপ শ্রেণীর চৌহদ্দি ছাপিয়ে গিয়ে বিশ্ব-মানবত্ববাদের এলাকায় নিজের স্থান ক'রে নিতে পারলো না। বিশেষ কাল, বিশেষ-গোষ্ঠী এই সাহিত্যকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রেখে দিল। আর অন্য সাহিত্য বিশেষ কাল ও সেই বিশেষ কালের মানুষদের একেবারেই উপেক্ষা না করে কিম্বা আদবেই তাদের পাশ কাটিয়ে না গিয়েও, তাদের মধ্যে যে চিবকালের মানবীয় সত্তা আছে সেটিকে প্রকাশ

করেছে। আর এই ভাবে সে সাহিত্য স্থান ক'রে নিল চিরকালের মানবহৃদয়ে। বিপ্লব এমনি ক'রে ব্যক্তিসত্তাকে মুক্তি দিল সামাজিক শৃঙ্খলের বাঁধন থেকে। এই মুক্ত বাঁধনহারা ব্যক্তি সত্তার আবির্ভাব হ'ল ফরাসী সাহিত্যে। বিচার স্থান নিল নির্বিচার ভাবালুতার, মুক্তি দিল জীবনকে সব রকম অন্ধ রহস্যময়তার ও আচারের নিগড় থেকে।

রুশীয় সাহিত্যেও এই দুমুখী ধারারই প্রকাশ দেখতে পাই। রোম্যানটিসিজম্ এসে অতীতের বাঁধন থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করলো। পুসকিন এলেন, রুশীয় কবিতা ব্যক্তিসত্তার জয়গানে মুখর হয়ে উঠলো। নতুন সম্ভাবনা, নতুন দিগন্ত খুলে গেলো রুশ দেশের মানুষের সামনে। ভাষা, ভাব, চিন্ত সব একটি বিরাট ভবিষ্যতের স্বপ্নে মশগুল হ'ল, রাঙিয়ে উঠলো তার রঙে। তলস্তয় এসে ব্যক্তির সত্তার নানান্ ধারার সঙ্গে সমাজের সংঘর্ষের খবর দিলেন আমাদের, দস্তইয়েভ্স্কি এসে ব্যক্তিসত্তায় চেতন-অবচেতন যে মিশ্রণ আছে তার বিচিত্র বুনুনি খুলে দেখালেন আমাদের। আনুষ্ঠানিক এক ধর্মীয় তার শ্বাসরোধী প্রাণখর্বকারী আবহাওয়া থেকে মুক্তির আলোকের ঘ্রাণ পেলো জীবন। রুশীয় জীবনে আধুনিকতা নিয়ে এলো এই সব সাহিত্য।

তার পরে এলো বিপ্লবের যুগ রাশিয়ায়। তখন যে সাহিত্য সৃষ্টি হতে লাগলো তার মধ্যে জনতার কোলাহল, শ্লোগান-চীৎকার, তাদের সমষ্টিগত দাবি, মিছিল—সব এলো, কিন্তু ব্যক্তিসত্তা নিন্দিত হ'ল, প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা পেলো রুশীয় সাহিত্যে বিপ্লবের যুগে। অথচ মানবসমাজের ইতিহাসে প্রতিটি দ্বন্দ্বের, সংঘাতের ও বিপ্লবের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির সত্তাকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দান। ব্যক্তি-স্বাধীনতার অছিলা ক'রে ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির সত্তাকে খর্ব করবার, পীড়ন করবার ও বিনষ্ট করবার দানবীয় লীলা চলেছে আর সংস্কৃতির দাবিকরনেওয়ালারা সেই জঘন্যতাকে অম্লান চিত্তে সানন্দে উপভোগ করছেন। সেই মেকী ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ইতিহাসের আবর্জনাকুণ্ডে নিক্ষেপ ক'রে ব্যক্তিসত্তার প্রকাশকে সত্য, ব্যাপক ও গভীর করার নিরন্তর প্রয়াস ক'রে চলেছে মানুষ যুগযুগান্তর ধ'রে। ঝুটো ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বর্জন করতে গিয়ে ব্যক্তিসত্তার বিরুদ্ধে অভিযান চালালো সোভিয়েত রাষ্ট্রের মোড়ল-অনুশাসিত এই সাহিত্য। তবুও সাহিত্যের সত্যসাধকদের অভাব ঘটে নি এই যুগে সোভিয়েট রাশিয়ায়। রাষ্ট্রের শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, কিছু কবি, কিছু ঔপন্যাসিক যেমন আলেক্‌জান্দার সোল্‌ঝনিৎসিন্, সমকালীন সাহিত্যিক রেওয়াজের প্রবল দাবিকে অস্বীকার ক'রে আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি করলেন। তাঁরা নিগৃহীত হলেন, নির্বাসিত হলেন কিন্তু তবুও রাশিয়ার অতুলনীয় সাহিত্যধারাকে রাষ্ট্রের ও সমষ্টির হুকুমবরদারির কাজে লাগাতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। তাঁরা সাহিত্যের সমকালীনতার কাছে নতি স্বীকার ক'রে সাহিত্যের চিরদিনের আধুনিকতাকে বিসর্জন দিতে রাজী হলেন না।

যে আধুনিকতার কথা এতক্ষণ ধ'রে বার বার উল্লেখ করেছি তার প্রকৃত অর্থ কি সেটি এবারে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

সমকালীনতার কথা আগেই বলেছি। প্রত্যেক যুগে কতকগুলি তৎকালীয় সমস্যা থাকে যেগুলি তখনকার সমাজের মানুষ সমাধান করবার চেষ্টা করে। যারা সেই সমস্যাগুলির যথার্থতা স্বীকার করে না, সমাজের স্থিতিশীলতাকেই রক্ষণীয় বলে মনে করে তারা এক

ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করে আর যারা সমাজের স্থানুত্বকে আঘাত হেনে, সমাজের কাঠামোর সংকীর্ণতা দূর ক'রে তাকে গতিশীল করতে প্রয়াসী তারা এক ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে। এই দু'ধরনের সাহিত্যই কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমকালীনতার বেড়ার মধ্যেই থেকে যায়। সাময়িক সমস্যাগুলিকে চিরকালের মানুষের সমস্যার রসে জারিয়ে নিতে না পারলে ও চিরন্তন মানবসমস্যার রূপে প্রকাশ করতে না পারলে সে সাহিত্য সমকালীন সাহিত্যের গণ্ডি পেরিয়ে কখনো আধুনিক সাহিত্যের এলাকায় পৌঁছতে পারবে না। আধুনিক সাহিত্য হচ্ছে তাই বিশেষ কালের শীলমোহর-অঙ্কিত সাহিত্য নয়। সে কালোত্তীর্ণ সাহিত্য। তার গর্ব নয় যে সে একটি বিশেষ কালের ফরমাসখাটা সাহিত্য, তার গর্ব যে সে একটি বিশেষ কালের মানুষদের সুখ দুঃখ, প্রেম, হিংসা, মানবতা, নীচতা—তাদের সত্তার বিচিত্র ভাবগুলিকে চিরকালের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছে। মানবতার ধাপে সাহিত্যকে পৌঁছে দিতে না পারলে সাহিত্য আধুনিকতার দাবি করতে পারে না।

আধুনিকতার দাবি সেই সাহিত্যই করতে পারে যে সাহিত্যে মানুষের মানসিক সংঘাতের ইতিহাস আছে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে তার প্রকাশ আছে, আচার ও অনুষ্ঠানের নিগড় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে মানুষের নিরন্তর প্রচেষ্টায় ও বিদ্রোহের হদিশ আছে ও নতুন সমাজ সৃষ্টির আবেগ যে সাহিত্যে পরিস্ফুট এবং সমষ্টির দাবির যথার্থতার বিচার আছে যে সাহিত্যে। ব্যক্তির পরিপূর্ণ মুক্তির ব্যাকুলতাকে ও চেষ্টাকে ও ব্যক্তিসত্তাকে জীবনের ও সমাজের কেন্দ্রীয় শক্তিহিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার অশ্রান্ত প্রয়াসকে যে সাহিত্য চিরন্তন মানবতার রূপ দিয়ে চিরকালের হাতে সঁপে দিতে পারে, যে কালেই সেটি সৃষ্টি হয়ে থাকুক না কেন, সেই সাহিত্যই আধুনিক সাহিত্য। কোনো কালই তাকে বর্জন করবে না, চিরকালের মানুষ তাকে তাদের আত্মার আত্মীয়, অন্তরের আপন জন বলে ভালোবেসে গ্রহণ করবে। সমষ্টির অত্যাচার থেকে ব্যক্তিকে যত দিন না বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে ততদিন মানুষের পরিত্রাণ নেই। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে এই সমষ্টির অত্যাচার ছিল, অধুনা ধনতান্ত্রিক সমাজেও এই সমষ্টির অত্যাচার চল্‌ছে, চলছে তথাকথিত সোশালিষ্ট দেশগুলিতেও সমষ্টির অত্যাচার ব্যক্তির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। শুধু সমষ্টির শ্রেণীগত আধারের তারতম্য ঘটেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ছিল জমিদারদের সমষ্টি, ধনতান্ত্রিক সমাজে মূলধনের মালিকদের সমষ্টি আর সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনে রাষ্ট্রের পরিচালক আমলাদের সমষ্টি। তাই সমষ্টির হাতে ব্যক্তির নিপীড়ন সর্বকালে চলে আস্‌ছে। সেই সব নিপীড়ন দূর করবার জন্যে বিদ্রোহও গর্জে উঠেছে যুগে যুগে। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর হাতে অ-ব্রাহ্মণদের নিগ্রহ ও তার বিরুদ্ধে ব্যক্তির সামাজিক ও আত্মিক অধিকারের জন্যে ব্রাত্যদের ও বুদ্ধদেবের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহকে বুদ্ধদেব শুধু তৎকালীন সামাজিক বিধিগুলির গ্লানি দূর করবার রূপ দিলেন না, সর্বকালের মানুষের মুক্তির পন্থা রূপে তাকে প্রকাশ করলেন বুদ্ধদেব। খ্রীষ্টদেবও তাই করলেন। ইহুদী সমাজের তৎকালীন ক্লেদ ও অনাধ্যাত্মিক আচারবদ্ধতার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা তিনি করলেন, সে বিদ্রোহকে মানবত্বের এমনি একটি উঁচুসুরে বাঁধলেন যে আজও সেই সুর মুক্তিপিয়াসী ব্যক্তিকে বিদ্রোহের শক্তি যোগাচ্ছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

কবীর, গুরুনানক, চৈতন্যদেব, রামমোহন—এঁরা সবাই আধুনিক ও এঁদের বাণী আধুনিক কেন না এঁরা ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার প্রয়াস করেছেন সমষ্টির অত্যাচার থেকে। এই কারণেই বলা যেতে পারে যে আধুনিকতা সেই জাতের মানসিকতা যেটি সর্বকালের। তাই যে সব গুণ থাকলে একটি রচনা সাহিত্য হতে পারে তার আলোচনা না ক'রেও বলা যেতে পারে যে সামাজিক বিধির বিরুদ্ধে ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহের ছবি নেই যে সাহিত্যে, কিম্বা ব্যক্তির মানসিক উপাদানগুলির মধ্যে সংঘাতের পরিচয় নেই যে সাহিত্যে সে সাহিত্য আধুনিক সাহিত্য নয়। সমষ্টির মানসিকতায় তৎকালীনতার ছাপ আছে, চিরকালের মূল্যায়নের কোনো ছাপ নেই। তাই মজুরদের চল্‌তি দাবি—রুটি চাই, কাজ চাই—মিছিলের সহস্র-মুখে বেজে ওঠে, কিন্তু নয়া দুনিয়া তৈরি করার কথা, অধিকাংশ মানুষকে মূক ক'রে রাখার বেদনার কথা ব্যক্তিগত মজুরের মুখ থেকে শোনা যায়, মিছিলের মজুর-সমষ্টির মুখ থেকে কখনো নয়। তাই চাষীশ্রেণীর বা মজুর শ্রেণীর সাময়িক চাহিদাকে ব্যক্ত ক'রে কিম্বা তাদের সমষ্টিগত রূপ অঙ্কিত ক'রে কোনো সাহিত্য কখনো নয়। তাই চাষীশ্রেণীর বা মজুর শ্রেণীর সাময়িক চাহিদাকে ব্যক্ত ক'রে কিম্বা তাদের সমষ্টিগত রূপ অঙ্কিত ক'রে কোনো সাহিত্য কখনো সমকালীনত্বের সীমানা পেরিয়ে চিরকালীনতার এলাকায় প্রবেশ করতে পারে না। আর মানবতার চিরকালীনতাকে বাদ দিয়ে আধুনিকতা সম্ভব নয়।

১৯৩১ সালে ম্যাক্সিম্ গর্কির সঙ্গে যখন সোভিয়েত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করি তখন শ্রমিক-সাহিত্য নিজেকে বিপ্লবধর্মী সাহিত্য বলে যে দাবি জানাচ্ছে সেটি সঙ্গত কি না সেই প্রশ্ন উত্থাপন করি। অমি গর্কিকে বলি যে শ্রমিক-সাহিত্য যে স্বভাবত বিপ্লবধর্মী সাহিত্য হবেই এমন কোনো কথা নেই। শ্রমিকের লেখা বলেই যে তার রচনা বিপ্লবধর্মী হবে এ ধারণা আমার মতে অত্যন্ত ভুল। শ্রমিক সাহিত্যিকের চেতনা কোন স্তরের, সে সাহিত্যিক শুধু তার শ্রেণীর অভাব অভিযোগ ও দাবি জানিয়েই ক্ষান্ত, না, তার শ্রেণীর দাবিগুলিকে মানবতার দাবির পৈঁঠায় উন্নীত করতে পেরেছে—তার উপর নির্ভর করবে সেই সাহিত্য বিপ্লবধর্মী সাহিত্য কিনা তার নির্ধারণ। তা ছাড়া সব মানুষের মন একটি বিশেষ রঙে ছোপানো নয়। অর্থনীতির বিচারে এক শ্রেণীভুক্ত হলেও ব্যক্তিসত্তার বিচারে এক চাষীর সঙ্গে আর এক চাষীর, এক শ্রমিকের সঙ্গে আর একটি শ্রমিকের প্রভেদ অপরিসীম। ব্যক্তিকে তার বিশেষত্ব-বর্জিত ক'রে সমষ্টির অন্তর্গত ক'রে দেখে বিজ্ঞান আর ব্যক্তির অনন্যতা ও তার স্বকীয়তার প্রকাশ সাহিত্যে। তাই কোনো একটি সাহিত্যকে শ্রমিক-সাহিত্য সংজ্ঞা দেওয়া আমার মতো ভুল। কেন না লেখক কোন শ্রেণীভুক্ত তার নির্ধারণের সঙ্গে সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। লেখক কোন মানসিকতা নিয়ে জগৎকে দেখছেন তার বিচারের উপরই সে সাহিত্যের বিচার।

সাহিত্য তার কালের মানুষের গোলাম, না পথপ্রদর্শক, তার কালের মানুষদের তৎকালীনতার দাবির খাঁচায় তাদের মন-জোগানো চিন্তার ও ভাবের খোরাক জোগাচ্ছে সেই সাহিত্য, না সেই খাঁচার বাইরে যে বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত সমাজের গতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন, সেটি ধরে দিচ্ছে ও সেই ভবিতব্যতার দিকে অগ্রসর হওয়ার ডাক দিচ্ছে—এই

মানদণ্ডে বিচার ক'রে একজন সাহিত্যিক আধুনিক কিম্বা সমকালীন ও গতানুগতিক আমরা তার বিচার করবো।

গর্কি আমার মতের সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে শ্রমিক-সাহিত্য নামটি সাহিত্যের বিচারে অসঙ্গত, তবুও সোভিয়েত্ রাশিয়ার বিশেষ অবস্থার বিচার ক'রে সাহিত্যসৃষ্টির কার্যে জন-সাধারণকে উৎসাহ্ দেওয়ার জন্যে সাহিত্যের এই্ বেঠিক নামও বরদাস্ত করবার দরকার আছে। তবে মজুর-সাহিত্য বলে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হ্চ্ছে সোভিয়েত রাশিয়ায় তার অধিকাংশই্ যে সাহিত্য নয়, সেগুলি যে খবরের কাগজের রচনার সমগোত্রীয়, সে বিষয়ে গর্কির কোনো সন্দেহ্ ছিল না।

১৯২৪ সালে লেখক কন্‌ষ্টান্‌টিন্ ফেডিনকে লিখলেন গর্কি—'সম্প্রতি আমি চাদায়েভের বই 'মামুলি ঘটনার মধ্যে' পড়লুম। এটা শিল্পসৃষ্টি একেবারেই্ নয়। এটা হ্চ্ছে খবরের কাগজের সংবাদ স্তুপ।'

'I recently read Chadayev's book 'In The Midst Of The Common Place'. This is not art. it is newspaper items.'

শিল্পী কে? এই সম্বন্ধে ১৯১২ সালে গর্কি লিখলেন ষ্টানিস্লাভ্‌স্কিকে—'সেই্ হ্চ্ছে শিল্পী যে তার ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলিকে ও তার উপলব্ধিকে কাজে লাগাতে জানে, তাদের মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারে এবং যে তার এই্ উপলব্ধিকে যথাযথ রূপ দিতে পারে। মানুষের সামনে রয়েছে তার নিজেকে আবিষ্কারের কাজ—জীবন, মানুষ ও ঘটনা সম্বন্ধে তার নিজের মনের ধারণার সুস্পষ্ট অনুভূতি ও সেগুলিকে তার নিজস্ব সৃষ্টির রূপ দেওয়া নিজের ভাষায় প্রকাশ করা।'

'The artist is the man who knows how to make use of his personal, subjective impressions and to find in them the common denominator—the objective—and who knows how to put his ideas into their appropriate form.'

'Man is confronted with the task of finding himself, his own subjective attitude to life, to people, to a given fact, and of clothing it in forms of his own, in words of his own.'

এর থেকে সুস্পষ্ট যে গর্কি খবরের কাগজের সংবাদগুলিকে সাজিয়ে ধরাকে সাহিত্য আখ্যা দিতে রাজী ছিলেন না, আর ব্যক্তির বিশেষ অনুভূতি ও বিশেষ উপলব্ধির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশকেই্ রূপসৃষ্টি বা সাহিত্যসৃষ্টি বলে মনে করতেন।

সমকালীন শিল্পকলা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গর্কি ১৯২৫ সালে ফেডিনকে লেখেন—'মনে রাখা ভালো যে এ রকম যুগ আগেও কখনো ছিল না। মহোত্তম শিল্প ও সাহিত্য সমকালীনত্বের মার্কামারা শিল্প বা সাহিত্য নয়। 'যুদ্ধ ও শান্তি' (War And Peace) যে যুগে লেখা হয়েছিল, সে কি সেই যুগের সমকালীন সাহিত্য? আর 'ফাউষ্ট' আর 'ডন্ কিওটে'?

'One has to remember that there has never been such a time before and that the greatest works of arts almost always not contemporary. Was 'War

And Peace' contemporary to the years when it was written? And Faust? Don Quixote?'

কোনো মহৎ সাহিত্যই সমকালীনতার সংকীর্ণ বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ নয়। মহৎ সাহিত্য কালোত্তীর্ণ সাহিত্য, চিরকালের সাহিত্য এ হচ্ছে সেই সাহিত্য, চিরকালের সাহিত্য এ হচ্ছে সেই সাহিতত্য যাতে শাশ্বত আধুনিকতা আছে।

এই কথাই গর্কি বিশ্ববিখ্যাত রুশীয় লেখক বুনিনকে লেখেন ১৯১২ সালে—'তোমার বিশাল হৃদয় শুধু রুশীয় জীবনের দুঃখগুলিকে আলিঙ্গন ক'রে ক্ষান্ত হয়ে নেই, তোমার হৃদয় পৃথিবীর সর্বদেশের ও সর্বকালের মানুষের অন্তরের কামনাগুলির খবর রাখে—আনন্দ-প্রত্যাশী সেই সৃষ্টিশীল কামনাগুলি পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণা যোগায়।'

একেই রূপ দিয়েছেন বুনিন, তাই গর্কি বুনিনকে শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানিয়ে বলেছেন—'তোমাকে, সেই কবিকে আমরা পাঠকেরা অভিনন্দিত করছি তার সৃষ্টিশীল সাহিত্যরচনার জন্যে।'

'Your great heart embraces more than just the sorrows of Russian life—it has known 'the longing of all countries and all times'—the great creative longing for happiness which inspires the progress of the world.... We, your readers, with respect and affection greet you, the poet 'who devoted his life to creative writing.'

এই সৃজনধর্মী সাহিত্যরচনা কখনো তার কালের মন যুগিয়ে চলে না। গর্কির নিজের কথায়—'Tendentiousness in art, a concession to the demands of the time.'

'শিল্পে একটি বিশেষ মতবাদ-প্রবণতা, সেই কালের দাবিকে মেনে নেওয়ার সামিল।' এলিয়ট্ বলেছেন[১] যে—'নিজের কালের প্রতিনিধিত্ব করার মানে সেই কালটাকে বুঝতে সাহায্য করা যিনি প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি সেই কালের মানুষদের সমস্যাগুলির ও যে ভাষায় তারা সেই সমস্যাগুলির আলোচনা ক'রে থাকে সে সব কিছুতেই অংশ গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি সেই সব সমস্যার চল্‌তি সমাধানগুলিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারেন। যে মানুষ তাঁর দেশবাসীদের 'প্রতিনিধি' তিনি তাদের কঠোরতম সমালোচক হতে পারেন ও তারা তাঁকে একেবারে একঘরে ক'রে সরিয়ে দিতে পারেন। এই 'প্রতিনিধি' তাঁর কালের সব প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধ হতে পারেন।'

অধুনা বাঙলা সাহিত্যে যে ধারা বইছে, সেটি হচ্ছে সমষ্টির কাছে ব্যষ্টিকে বলি দেওয়ার হালফ্যাশানী ধারা। এটি সম্পূর্ণ পুরাতন রেওয়াজ, বহুকাল থেকে এইটেই চলে আসছে মানবসমাজে। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই, আধুনিক মননের ও ভাবের প্রকাশও এই সাহিত্যে কোথাও নেই। এই সাহিত্যের স্রষ্টারা ধ'রেই নিয়েছেন যে ব্যক্তিসত্তা হচ্ছে

১ "The man who is a 'representative' of his people may be the severest critic of his people and an outcast from it ; the man who is 'representative' of his time, may be opposition to the most widely accepted belief of his time."—T. S. Eliot

মানবসমষ্টির কল্যাণের পরিপন্থী, ব্যক্তিসত্তাকে সমষ্টির খাঁচায় আটক করতে না পারলে মানুষের কল্যাণ নেই। অথচ সমস্যাটি ঠিক এর বিপরীত। সমষ্টিগত মানুষকে ব্যক্তিসত্তার অধিকারী ক'রে তোলাই হচ্ছে আমাদের কালের মহোত্তম ব্রত। সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে মানুষ যে সুরে কথা বলে, যে আচরণ করে, ব্যক্তি হিসেবে সেই মোটা সুরের কথা বল্‌তে কিম্বা ক্রূর আচরণ করতে সে নিঃসন্দেহে লজ্জা পায়। ব্যক্তিগত মানুষকে সমাজগত মানুষের অন্ধ কারায় বন্দী ক'রে রাখাই হচ্ছে প্রতি যুগে সমাজপতিদের একান্ত উদ্দেশ্য ও প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। ব্যক্তির চেতনাকে প্রবৃত্তির শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে, চেতনাকে কোনো মতো উদ্ভাসিত হতে দেওয়া হবে না। মানুষকে তার সৃষ্টিশীল হতে দেওয়া হবে না। মানুষ নির্মাণ করবে, সৃজন করবে না—এই হচ্ছে সমাজের মোড়লদের অভিপ্রায়। যেখানে মানুষ নির্মাতা সেখানে সে সমষ্টির প্রত্যেকের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা বাইরের বন্ধনে, যেখানে মানুষ স্রষ্টা সেখানে সে সকলের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা বিশ্ব মানবত্বের সমাদর্শের আত্মিক বন্ধনে।

তাই সমষ্টির যান্ত্রিক ঐক্যের বন্ধন থেকে ব্যক্তি-সচেতনতার আত্মিক ঐক্যের স্তরে মানুষ-যাত্রীকে পৌঁছতে হবে—এই ধারণাই হচ্ছে আধুনিক ধারণা, এর প্রচেষ্টাই হচ্ছে আধুনিকতার লক্ষণ—সমন্বিত প্রচেষ্টা। তাই সমাজ-কেন্দ্রিক মানসিকতার তুচ্ছতা ও জড়তার বিরুদ্ধে অভিযান হচ্ছে আধুনিকতার প্রাণবায়ু। প্রতিটি মানুষকে ব্যক্তি ক'রে তুল্‌তে হবে, তা হলে মানুষ যথার্থ ঐক্য খুঁজে পাবে সব মানুষের সঙ্গে। তবেই বর্তমান কালের সংখ্যা-অপদেবতার উৎপীড়ন ও মানবত্বের ঐক্যের নামে একাকারত্বের বীভৎসতা চিরদিনের মতো লুপ্ত হবে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের যে বিরোধ দেখা দিয়েছে সে বিরোধের মূলেও রয়েছে ব্যক্তির চেতনার স্ফুরণকে তার জ্ঞানের পরিধির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যে চেষ্টা মানুষ করছে তাকে বাধা দানের মধ্যে। ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির গোষ্ঠীপতিরা আচার, রীতি ও অনুষ্ঠানকে মানুষের ক্রমবর্ধমান বিশ্বজ্ঞানের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলতে বাধা সৃষ্টি ক'রে চলেছে। ধর্মের বাইরের মহলের জিনিসগুলি যেগুলি মানবসমাজের ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাসের নানা যুগের চিহ্নে চিহ্নিত সেগুলিকে ধর্মের অন্তরের আসল বস্তু, ধর্মের স্বলক্ষণ, তাই অপরিবর্তনীয়—এইটি জাহির ক'রে তারা ধর্মের সর্বকালীন রূপকে ম্লান ও তার চিরন্তন রসকে বিস্বাদ ক'রে দিচ্ছে। আসলে ধর্মের গোষ্ঠীপতিরাই হচ্ছে ধর্মের শত্রু। আবার যারা ধর্মকে, তার মানব-অন্তরের আসন থেকে জোর ক'রে ঠেলে ফেলে দিয়ে সেখানে বিজ্ঞানকে বসাবার চেষ্টা করছে তারাও বুদ্ধির বড়াই ক'রে বিচারের সাফাই গেয়ে তাদের বিচারশক্তির দীনতার পরিচয় দিচ্ছে। প্রতিটি বস্তুর উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখানোর দায়িত্ব নিয়েছে বিজ্ঞান। একটি বিশেষ বস্তুকে বোঝাবার পক্ষেও তার বিশেষ প্রকৃতি জানবার জন্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য। কিন্তু এই বিভিন্ন বস্তুগুলির বিচিত্র প্রকাশ ও স্বভাবকে একটি ঐক্যসূত্রে বাঁধবার যে শক্তি ও সাধনা সেটি বিজ্ঞানের এলাকার ও বিজ্ঞানের ক্ষমতার বাইরে। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের অন্তরে যে কোথাও একটি গভীর ঐক্য আছে, এই বৈচিত্র্য যে ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত ও সেই ঐক্য উপলব্ধি করতে

না পারলে যে ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়, এই বোধই হচ্ছে ধর্মবোধ। এই ধৃতিশক্তি, এই বিচ্ছিন্নতা-বিরুদ্ধ শক্তি ও চেতনা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। এই কারণে আচার, প্রথা ও অনুষ্ঠানের বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কুসংস্কারকে দূর করার যত প্রয়োজন ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে, প্রকৃত ধর্মকে এই সব কুসংস্কারের পৃষ্ঠপোষক আনুষ্ঠানিক ধর্মপালকদের অন্ধতার আবরণ-মুক্ত করার প্রয়োজন ঠিক ততই। আধুনিক মানসিকতার সার্থকতা এইখানে—সে নির্বিকারে সব কিছু গ্রহণ করে না, নির্বিচারে সব কিছু বর্জন করে না। মানবসমাজের ঐতিহাসিক ধারার মধ্যে যেখানে গোষ্ঠীর বালির চর দেখা দিয়েছে ব্যক্তির গতিকে স্তম্ভিত করতে ও রুদ্ধ করতে, এই মানসিকতা সেখানেই ব্যক্তিসত্তাকে অবাধগতি দেওয়ার জন্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে গোষ্ঠিগত প্রাধান্যের বিরুদ্ধে।

তাই বিজ্ঞানের এলাকায় একটি বস্তুর বিশেষ বুনুনির ও তার বিশেষ ধাতুগুলির বিশ্লেষণের যে সাধনা চল্‌ছে তার জ্ঞানলাভ করা যেমন প্রয়োজন, এই অসংখ্য বিশেষ বস্তুগুলির মধ্যে ঐক্যস্থাপন করবার জন্যে মনের আর একটি এলাকায় যে নিরন্তর সাধনা চলেছে সেটি সম্বন্ধে সচেতনতাও তেমনি প্রয়োজন। তবেই ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের আপাত-বিরোধ ঘুচে যাবে। মৃত আনুষ্ঠানিকতা ও জড় আচারবদ্ধতাকে আমি ধর্ম বলে স্বীকার করতে নারাজ। অসংখ্য বিশেষকে ঐক্যসূত্রে বিধৃত করবার শক্তিকে আমি ধর্ম বলি।

এই বস্তুবিশ্লেষণের ও বস্তুগুলির মধ্যে ঐক্যসাধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে ও বোঝে যে মানসিকতা তাকেই আধুনিক মানসিকতা বলা যেতে পারে।

খাঁচা নয়, আকাশ হচ্ছে পাখির আশ্রয়, মানুষের মনেরও আশ্রয়-ভূমি সমাজের আচারবদ্ধতার খাঁচায় নয়, মুক্তির আকাশে। এই মুক্তিলাভের জন্যে মন বিদ্রোহ করে সমাজের গতিরুদ্ধকারী আনুষ্ঠানিকতার ও আচারবদ্ধতার বিরুদ্ধে। কিন্তু এই বিদ্রোহ শুধু ভাঙনের মত্ততা নয়, সৃষ্টির আবেগই এই বিদ্রোহের প্রাণশক্তি। তাই ভাঙনের জয়গান তারই মুখে শোভা পায় যে সৃষ্টিশক্তির অনন্ত বীর্যের অধিকারী, যা ভাঙতে চলেছে তার জায়গায় কি রচনা করবে, কি দিয়ে সেই শূন্যতা ভরবে, তার সম্বন্ধে যার মন মানবসমাজের যুগ-যুগান্তরব্যাপী পথ-চলার ইতিহাসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও যে মন অতীতের ধারার সঙ্গে বর্তমানের ধারার মিলন সাধনের সূত্রটি জানে ও সেই ধারাকে ভবিষ্যতের খাতে প্রবহমান করবার অসীম শক্তি রাখে, শুধু সেই মনই ভাঙনের ডাক দেওয়ার অধিকারী, নইলে সৃষ্টিশক্তিতে দেউলে মানুষ ধ্বংসস্তূপ রচনা করাকেই নতুন সৃষ্টি বলে চালিয়ে দিয়ে ঘুমন্ত, গণমনকে প্রবঞ্চিত করতে পারে, যেমন অধুনা ঘটছে আমাদের দেশে ও আরো অনেক দেশে।

এই ভাঙন-সর্বস্ব মন 'আধুনিক' বলে নিজেকে জাহির ক'রে চলেছে সমকালীন সমাজে, বাহবাও লুটছে হাটে বাটে মাঠে, কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে কেন এই যে কালাপাহাড়ী মন সব যুগেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, বিচারহীন ভাঙনের ধূলোয় মানবজীবনকে ধূসর করেছে ও সেই ধূলোর আঁধিতে কিছু কালের জন্যে মানুষের শ্বাস রুদ্ধ করেছে, কিন্তু সৃষ্টিশক্তির দীনতাহেতু এই ধরনের কালাপাহাড়ের দল ক্ষণিক মত্ততার ঝড় তুলে ভাঙনের

ধূলোর তলায় মিলিয়ে গেছে। মানবসমাজ যেখানে ছিল, যে অবস্থায় ছিল, সেখানেই, সে অবস্থাতেই থেকে গেছে, এক পাও সে এগিয়ে যায় নি এই নিরর্থক ভাঙনের লীলাখেলায়। কিন্তু যেখানে ভাঙনের পিছনে সৃষ্টির ধারণা, মনন ও কল্পনাশক্তি কাজ করেছে সেখানে মানবসমাজ নিঃসন্দেহে এগিয়েছে নেতৃত্বের শত ত্রুটি ও অক্ষমতা সত্ত্বেও,—যেমন ফরাসী বিপ্লবের ও রুশীয় বিপ্লবের পথ ধ'রে বিশ্ব-মানবসমাজের অগ্রগতির প্রমাণ আমরা পাই।

ফরাসী বিপ্লবের বীজ বপন করেছিলেন ফরাসী জাতির মানস-মৃত্তিকায় একদল দার্শনিক, চিন্তাবিদ, সমাজবিজ্ঞানবিদ মনীষিরা প্রায় এক শতাব্দী ধ'রে। তারই ফসল ফল্‌লো ফরাসী বিপ্লবে। রাশিয়াতেও চারনিসেভ্‌স্কি, হার্তসেন থেকে শুরু ক'রে প্লেখানভ্‌, লেনিন, ট্রটস্কি প্রভৃতি মনীষিরা ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনেব জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে ও বিপ্লবের সৃজনীশক্তির সুস্পষ্ট ধারণায় শক্তিমান হয়ে রুশদেশের জনমানসকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করেছিলেন। তাই ভাঙনের জন্যেই ভাঙন যেটি আজ আধুনিক মনের পরিচায়ক বলে স্বীকৃতি পাচ্ছে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত—এই তিন জাতের লোক দিয়ে তৈরি পাঁচমিশালী জনতার কাছে, সেটি অতি-পরিচিত, অনেককেলে, নিষ্ফল ও সৃষ্টিশক্তিহীন মন। বদ্ধ পঙ্কিল ডোবার নদীত্বের দাবির মতোই হাস্যকর এই ভাঙনপন্থীদের আধুনিকত্বের দাবি।

বাঙলা দেশের ইতিহাসে এই আধুনিকতার প্রথম মশালবাহী পথিক হচ্ছেন রামমোহন। যা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তার সমগ্র ধারণা অন্তরে ধারণ ক'রে সমাজজীবনের অব্যবহার্য, যুগ-অযোগ্য অংশগুলিকে অপসারিত ক'রে তাদের জায়গায় তিনি এমন সব বস্তুর সংযোগ করলেন যেগুলি যে শুধু তখনকার সমাজের অভাব দূর করলো তা নয়, ভাবীকালের সমাজের দিকে তৎকালীন সমাজের গতির নির্দেশও দিলো। অতীতের মানবমনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে বিচারহীন ইতিহাস-বিরুদ্ধ মানসিকতার দ্বারা একেবারে বাতিল না ক'রে দিয়ে, যা অচল তাকে বর্জন ক'রে, যা গতিশীল তাকে রক্ষা ক'রে, যে অভিজ্ঞতার মধ্যে খণ্ডকালের সীমা-অতিক্রমকারী সুদূরপ্রসারী ধারণাশক্তির পরিচয় আছে, সেই অভিজ্ঞতাকে সমকালীন মানবসমাজের কাজে লাগিয়ে সমন্বয়-সাধক রামমোহন আধুনিক মনের পরিচয় দিলেন। পুরাতনপন্থী মন যা অতীতের সব কিছুতেই আঁকড়ে পড়ে থাকে আর নতুন-কিছু-করো-র পাগলামিতে অস্থির মন যা অতীতের সব কিছুকেই বাদ দিতে চায়—এই দুই জাতের মনই অসুস্থ মন, এদের দিয়ে না সৃষ্টি সম্ভব, না সমন্বয়-সাধন সম্ভব। অথচ এই সমন্বয়-সাধন ব্রতী মনই আধুনিক মন, কেননা এই মনই মানবসমাজকে নতুন ক'রে ঢেলে সাজাতে পারে ও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

আধুনিক যুগের সিংহদ্বার খুলে দিলেন রামমোহন। বাঙালীর জীবনের নানা দিকে নানা ধরনের আধুনিকতার অবদান নিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ। আরো অনেকে এলেন। ধর্মকে, শিক্ষাকে, সমাজকে, অর্থনীতিকে, ভাষাকে ও সাহিত্যকে এঁরা অতীতের সব জড় বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে এমন গতি সঞ্চার করলেন এঁদের অন্তরে যে চিন্তার স্বাধীনতার আলোকে ও গভীর ভাবরসের ঐশ্বর্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা দেশ অপরূপ মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠলো,

ও এই মননের ও ভাবের প্রবাহ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঁধ ছাপিয়ে বিংশ শতাব্দীর আধাআধি পর্যন্ত আমাদের মানসকে প্লাবিত করলো। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের আবির্ভাব থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ রবীন্দ্রনাথের তিরোধান পর্যন্ত এই একশো ঊনসত্তর বছর হ'ল আধুনিকতার যুগ বাংলা দেশের। যেমন বুদ্ধির প্রখর সজাগতা ও সব কিছুকে যাচাই ক'রে নেওয়ার অদম্য প্রবণতা তেমনি শুধু ভারতের বিচিত্র চিন্তা ও ভাবধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবার আগ্রহ নয়, বিশ্বের ভাবধারার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের অসীম আগ্রহ, জাতগুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আল-বাঁধা মনোভাবগুলিকে সব আল ভেঙে জাতীয় ভাবে পরিণত করবার একান্ত প্রচেষ্টা ও এই জাতীয় ভাবকে বিশ্বাত্মবাদের সার্বভৌমত্বের অধীনতায় নিয়ে আসবার জন্য বিপুল সাধনা—প্রায় দু'শতাব্দী ধ'রে বাঙলার জীবনকে আধুনিকতার পলি দিয়ে এমনি উর্বর ক'রে দিল যে মানবিকতার সর্বানুভূতিতে ও সৃজনী শক্তির বিস্ময়কর প্রকাশে বাঙলা যে শুধু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশগুলি থেকে কয়েক শতাব্দী এগিয়ে গেলো তা নয়, চিন্তার ও ভাবের আধুনিকতায় পৃথিবীর বহু দেশকে ছাপিয়ে গেলো ও শীর্ষ স্থানীয় দেশগুলির কাছাকাছি পৌঁছে গেলো।

কৃষকদের উপর জমিদারদের অকথ্য অত্যাচার নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন ও অক্ষয় দত্ত যা লিখলেন ও পরবর্তীকালে লিখলেন রবীন্দ্রনাথ, সমকালীন যুগের লেখকেরা তাঁদের আধুনিকতার দাবি করেও এঁদের গভীর বিশ্লেষণ ছাপিয়ে বিন্দুমাত্র এগিয়ে যেতে পারেন নি। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন খাজনার ব্যাপারে চাষীদের সঙ্গে জমিদারদের এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেছিলেন ও ইংরেজ গভর্মেন্টের কাছে এই দাবিও জানিয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত চাষীদের দুর্দশার সম্বন্ধে যেসব প্রবন্ধ প্রায় একশো বছর আগে লেখেন তেজস্বিতায় ও গভীর মানবতাবোধের আলোয় সেগুলি ভাস্বর।

টোলের প্রাণহীন শিক্ষাপদ্ধতির বদলে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্তনের জন্য রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন তা অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্তন করেন সত্তর বছর আগে সেই শিক্ষাপ্রণালীকে য়ুরোপও ছাপিয়ে যেতে পারে নি আধুনিকতায়— সোভিয়েত্ রাশিয়াও নয়। নারীদের মানবীয় অধিকার দেওয়ার জন্যে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যা করেছেন তার তুলনায় য়ুরোপ তখনও পেছিয়ে ছিল আর যে কালে তাঁরা সেটা করেছেন তখন স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন য়ুরোপে অজানা ছিল। বাঙলা ভাষার উন্নতি সাধনের দিক থেকে, তাকে সংস্কৃত ভাষার কড়া শাসন থেকে মুক্ত ক'রে নিজস্ব রূপ নিতে সাহায্য করেছেন রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। বাঙলা ভাষাকে পণ্ডিতি সাধুভাষার অত্যাচার ও আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্ত করতে সর্বপ্রথমে এগিয়ে আসেন প্রমথ চৌধুরী, তার পরে রবীন্দ্রনাথ। যুক্তাক্ষর বর্জন ক' : শব্দের বানান সোজা ক'রে দিয়ে বাঙলা ভাষাকে জনসাধারণের দরজায় পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন রবীন্দ্রনাথ।

এইভাবে সৃজনধর্মী আধুনিকতা প্রায় দুশো বছর ধ'রে কাজ করেছে বাঙলা দেশে। প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার আছে স্বাধীন চিন্তায়, ভাবের, রস উপভোগের ও মুক্তি লাভে—

সমষ্টির মুক্তির আতঙ্কে ও পীড়নে ব্যক্তি মূক হয়ে থাকবে না, সে বিদ্রোহ করবে সমষ্টির অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এই বাণী প্রচার করেছেন এই মহান আধুনিকেরা।

বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রথম আভাস পাওয়া গেলো বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসে। সনেটের সূচনা বাঙলা কাব্যে করলেন মাইকেল মধুসূদন ও লিরিকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুভূতি তার জায়গা ক'রে নিল বাঙলা কাব্যে। তারপরে আধুনিকতার বিরাট স্রোত নিয়ে এলেন আধুনিকতার ভগীরথ রবীন্দ্রনাথ। লিরিক কবিতায় বাঙলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লিরিকের পর্যায়ে স্থান ক'রে নিল, ছোটো গল্পের সূচনা হ'ল, ধর্মের আনুষ্ঠানিকতায় আঘাত হেনে ধর্মকে মানুষের ধর্মের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করলেন রবীন্দ্রনাথ, ব্যক্তিসত্তার জয়গানে মুখর হ'ল বাঙলা সাহিত্য। এ যুগের সব উৎপীড়ন ও শোষণের জন্যে জাতীয়তাবাদকে দায়ী ক'রে রবীন্দ্রনাথ, ব্যক্তিসত্তার জয়গানে মুখর হ'ল বাঙলা সাহিত্য। এ যুগের সব উৎপীড়ন ও শোষণের জন্যে জাতীয়তাবাদকে দায়ী ক'রে রবীন্দ্রনাথ ভারতের বিশ্বাত্মবাদের কথা শোনালের সারা বিশ্বকে। সোশালিজমের কথা তিনি সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ ক'রে এসে বল্‌তে শুরু করেন নি ; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অঙ্কেই তিনি সোশালিজম্ সম্বন্ধে সহৃদয় মন্তব্য করেছেন। মনে রাখা ভালো যে তখন সোশালিজম্ হালফ্যাশানী হয়ে ওঠে নি। সর্বাঙ্গীণ মুক্তির শুদ্ধ ও সবল ভূমির উপর মানুষের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, মানুষের প্রতি গভীর প্রেম ব্যক্তির ও জাতির চিত্ত থেকে উৎসারিত করতে হবে ও মানবীয় সত্তাকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে পূর্ণ বিকশিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ দান করতে হবে—এই সুগভীর ও সুমহান সুর বাঙলা সাহিত্যের আকাশ জুড়ে রণিত হ'ল।

সদ্য সদ্য কিছু পাওয়ার তৃপ্তিতেই এই আধুনিকতা আপনার সমাপ্তি ঘোষণা করে নি, পাওয়ার বিরাট সম্ভাবনার আশা জাগিয়ে তার সুগভীর আকুলতায় বাঙালীর জীবনকে ভরপূর ক'রে তুলেছে। এই আধুনিকতা মহতী সম্ভাবনার আশা জাগালে আর সেই আশা পূরণ করবার জন্যে সৃষ্টি-প্রতিরোধকারী সব সামাজিক বিধি ও আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝড় তুল্‌লো বাঙালীর মনে। তাই শুধু বিচারশীলতা, পুরাতন আচার ও কাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহই একমাত্র লক্ষণ নয় আধুনিকতায়, অন্তরের মধ্যে একটা মহোত্তর ভবিষ্যতের নিশ্চয়তার অনুভূতিও আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ। এই ধরনের ভাবময়তা প্রত্যেক সৃষ্টিশীল ব্যক্তিমানসের ও যুগমানসের লক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের গোরা. ঘরে বাইরে ও চতুরঙ্গ আধুনিকতার চরম নিদর্শন বঙ্গসাহিত্যে—এই উপন্যাসগুলিতে একটি বিশেষ কালের ও বিশেষ সমাজের সমস্যাগুলির সর্বকালের মানব-সমস্যার সার্থক রূপ নিয়ে আমাদের হৃদয়কে অধিকার করেছে। শরৎচন্দ্রের কয়েকটি ছোটো গল্প ও শেষ প্রশ্ন, গৃহদাহ, দেবদাস প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাস সমকালীনতার বেড়া ভেঙ্গে আধুনিকতার প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটো গল্প ও কবি প্রভৃতি উপন্যাসগুলির, বনফুলের ছোটো গল্পগুলি ও শৈলাজানন্দের কয়লাকুঠি জাতীয় ছোটো গল্পগুলি নিঃসংশয়ে আধুনিক।

একেবারে হালে বাঙলা সাহিত্যে যে সব উপন্যাস বা গল্প বের হচ্ছে তাদের মধ্যে

অধিকাংশই সমাজের জনসমষ্টির মন যোগাতে এতই ব্যস্ত ও ব্যক্তিসত্তার দাবিকে সমষ্টির দাবির কাছে বলি দেওয়াকে পরম আদর্শ বলে এমনি নির্বিচার সোয়াস্তির সঙ্গে সাব্যস্ত ক'রে নিয়েছে যে ব্যক্তিসত্তাকে হত্যা করবার পুরনো রেওয়াজটাকেই এরা বজায় রেখেছে সানন্দে শুধু সেটাকে চালু করেছে নতুন নাম দিয়ে। তাই অতীতের লীলা পুরাপুরি বজায় রেখে, শুধু সেই লীলার নতুন নামকরণ করেছে তারা—আধুনিকতা। সংখ্যা-অপদেবতা এ যুগের উপাস্য-অপদেবতা—সমকালীন সমাজের এই বিকারগ্রস্থ বিশেষত্বকে মেনে নিয়ে তার স্তবগানে এই সাহিত্য মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। সমষ্টির অত্যাচার থেকে ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, ব্যক্তিকে সমষ্টির পশুশক্তির দ্বারা চূর্ণ করাটার সাফাই গাওয়াই এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। কোনো মহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত কিম্বা মুক্তির ইঙ্গিত এই সাহিত্যে নেই। এই সাহিত্য বল্‌ছে—দেখো জীবন ঘিরে এই অন্ধকার, দেখো এই কুশ্রীতা ও অশ্লীলতা লক্ষ লক্ষ জীবনের আশ্রয়। এখানেই তাদের সৃষ্টিতে যবনিকা পড়েছে। এই কুশ্রীতা ও অশ্লীলতা উপভোগ করানোটাই এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য—এই সমকালীন সাহিত্যে কুশ্রীতা ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নেই, আছে এদের প্রতি আসক্তি জাগানোর একটা সুস্পষ্ট প্রয়াস। তাই উৎকট যৌন-গন্ধদুষ্ট হচ্ছে এই সমকালীন সাহিত্যের বহু গল্প ও উপন্যাস। এই সাহিত্য মানবমনের জটিল বুনুনি ও তার মনের আলো-অন্ধকারের দ্বন্দ্ব—এ সবকে উপেক্ষা ক'রে সমস্যাটিকে একপেশে ক'রে সহজ করে নিয়েছে। মনটি নয় সম্পূর্ণ সাদা, নয় সম্পূর্ণ কালো। আর এই কালোর দিকটাকেই স্ফীত ক'রে দেখাবার চেষ্টাকে আধুনিকতা বলে প্রচার করছে এই সাহিত্য। এই এক পেশত্বর জন্যে মানুষ সম্বন্ধে এরা যা বল্‌ছে সেটি সত্য নয়। এই কারণেই এই সমকালীন সাহিত্য সত্যভ্রষ্ট সাহিত্য। বস্তির মানুষ স্থূল কথা, অশ্লীল কথা বলে থাকে অন্যদের চেয়ে বেশি, তাই জন্যে বস্তির মানুষের চরিত্র আঁকতে গেলে তার মুখ দিয়ে অশ্লীল কথার কালো ঝরণা বহাতে হবে—এটা যথার্থ বাস্তবতা নয়, তাই আধুনিকতাও নয়। বস্তির যে মানুষ অশ্লীল কথা বলে, স্থূল মনের পরিচয় দেয়, সে মানুষটির কালো মনের অবকাশ থেকে সময়ে সময়ে কালোর পর্দা সরে যায় ; শুভ্র মেঘ ও সোনালি আলোয় ধোয়া নীলাকাশও দেখা যায় তার অন্তরে। তারও মনের মধ্যে থেকে আর একটি মানুষের দেখা পাওয়া যায়, যে মানুষ ব্যথা পায়, ভালোবাসে, চোখের জল ফেলে। এই সবটা নিয়ে সেই অশ্লীলভাষা-প্রয়োগকারী বস্তির মানুষটি মানুষ—এইটেই আসল বাস্তবতা। আর সাহিত্যের বাস্তবতার কাজ হচ্ছে এই গোটা মানুষটিকে দেখানোর কাজ, আংশিক মানুষটিকে নয়। 'দেবদাস' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র এই গোটা মানুষটিকে দেখিয়েছেন দেবদাসের চরিত্রে। সমকালীনতার বাহাদুরী হচ্ছে মানব-চরিত্রের একটি বিশেষ অংশকে দেখানোর চেষ্টায়, আধুনিকতার কাজ হচ্ছে সমগ্র মানুষটিকে দেখানোতে।

আর মনের যে অংশটুকু সমকালীন সাহিত্য দেখাবার নেশায় মেতেছে সেটি হচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্যহীন বিকারগ্রস্থ মানসিক অংশ। এরি মধ্যে নাকি মানুষের যথার্থ পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে। বিশ্ব-মহাযুদ্ধের বিভীষিকা-অভিশপ্ত মানুষ দেহের ও মনের স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেছে অস্বাভাবিক সামাজিক অবস্থার মধ্যে। অসুস্থ দেহ ও মন নিয়ে মানুষ যে আচরণ

শুরু করে সে আচরণ সাময়িক, যে সুরে সে কথা বলতে শুরু করছে সে সুরে পেশীর ব্যবহার নজরে পড়ে, চিন্তার বা গভীর ভাবের পরিচয় নেই তাতে। অসংযত প্রবৃত্তি তো বিচারহীন স্থূল বুদ্ধি যার প্রাবল্য সহজেই চোখে পড়ে সমষ্টিজীবনে তারই স্তুতি শুরু হয়েছে সমকালীন জীবনে ও সাহিত্যে।

১৯৩৪ সালে নাট্যকার আইসাক্ বেবেল্-কে ম্যাক্সিম গর্কি একটি চিঠি লেখেন তাঁর নাটক সম্বন্ধে। সেই চিঠিতে গর্কি লেখেন—

'What repels me, personally, more than anything else is the Baudelaire-like passion for bad meat. All the characters...have gone sour, have an evil smell, and almost all of them are, as it were, infected with or enslaved by a belligerent sensuality. Perhaps it is the sensuality of despair of people who when dying, endeavour to leave a mould behind on the floor and walls in memory of themselves and to avenge themselves.

The task of great art is to reveal people in all their complexity...'

'যেটি সবচেয়ে বেশি আমার মনকে বিতৃষ্ণায় ভরে দিচ্ছে সেটি হচ্ছে পচা মাংসের উপর তোমার বোদ্‌লেয়র্ সুলভ টান। তোমার নাটকের সব চরিত্রগুলো টকে গেছে, তাদের দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, আর তারা প্রায় সকলেরই একটা উদগ্র ইন্দ্রিয়-প্রবণতার রোগে ভুগছে অথবা এই ইন্দ্রিয়প্রবণতার কারাগারে বন্দী। হয়তো এটা হচ্ছে মরতে বসেছে যে সব লোক তাদের ইন্দ্রিয় প্রবণতা। মরবার আগে তারা চেষ্টা করছে ঘরের মেঝেতে আর ঘরের দেওয়ালগুলোতে তাদের জীবনের ছাপ রেখে যাবার—তাদের স্মৃতি রেখে দেওয়ার জন্যে আর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে।

মানুষকে তার স্বভাবের সব জটিলতা নিয়ে দেখানোই হচ্ছে মহৎ শিল্পের কাজ।'

অসাধারণ এই কটি লাইন দিয়ে গর্কি সমকালীন সাহিত্যের চরিত্রের যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন। পচা মাংসের উপর এই সাহিত্যের লোভ অপরিমেয়, যে চরিত্রগুলি আঁকা হচ্ছে সেগুলি বিকারগ্রস্থ ও দুর্গন্ধময়, আর অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-প্রবণতার রোগে তারা অভিশপ্ত। এ সবই ধ্বসে পড়া মানুষের ইন্দ্রিয়-প্রবণতার ছবি। এই মরতে বসা মানুষদের চরিত্রের এটি কিন্তু একটি দিক মাত্র। নানা ভাবের বুনুনি যে মানুষ, জটিল যে মানুষ তার যথার্থ পরিচয় এতে নেই—এটা নেহাৎই একপেশে পরিচয় মানুষের।

তাই গর্কি বেবেল্-কে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে সব মহৎ শিল্প মানুষকে তার স্বভাবের সব জটিলতা নিয়ে তাকে ধ'রে দেয় সকলের সামনে। যুগের সমস্যাগুলির ফিরিস্তি দেওয়াটাই যে সাহিত্য তার শ্রেষ্ঠ কৃতি বলে মনে করে সেই সমকালীন সাহিত্যকে গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট সাহিত্য বলে অভিহিত করে এলিয়ট বলেছেন যে, 'এই সাহিত্যে জীবনের মূল্যগুলির কিছু বাদ দিয়ে আর কিছু স্ফীত ক'রে দেখানোর ফলে তাদের বিকৃতি করা হয়। আর এই বিকৃতির কারণ হচ্ছে এই যে একটি সুনির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা হয়েছে সেই অভিজ্ঞতাকে মানবজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে যাচাই করবার কাজে লাগানো। তার ফলে যেটি অপ্রয়োজনীয় সেটিকে প্রয়োজনীয়ের সঙ্গে আর যেটি সাময়িক

সেটিকে চিরন্তনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়।'

বাঙালীর সমকালীন জীবনে ও সমকালীন সাহিত্যে জীবনের এই স্থূল, একপেশে অতএব অসত্য প্রকাশ প্রকট হয়ে উঠেছে। আধুনিকতার কোনো চিহ্ন আপাতত তার জীবনে নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা আগাছা ফসলের ক্ষেতের প্রতিবাদ শুরু করেছে।' আশা করা যাক যে সমকালীনতার হালফ্যাশানি ব্যাধি-মুক্ত হয়ে বাঙালীর সত্ত্বা তার যেটি স্বধর্ম ও মৌলিকত্বের জন্যে সে অনন্য, শুধু ভারতবর্ষে নয়, সে বিশ্ববন্দিত, সেই চিরন্তন আধুনিকতার পথে সে আবার অগ্রসর হবে। সৃষ্টিশীল আধুনিকতা বাঙালীর প্রাণবায়ু, সমকালীনতার বিষাক্ত গ্যাস তাকে কোনো মতেই নাশ করতে পারবে না, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

"Jistortion of values, the exclusion of some and the exaggeration of others which springs from applying standards acquired within a limited area, to the whole of human experience, which confound the contingent with the essential, the ephemeral with the permanent."—Eliot

নারীমুক্তি প্রসঙ্গে

একদা প্রকৃতির জীবনের সঙ্গে মানুষের জীবন একেবারে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে ছিলো, মানুষের সমাজের ধারা প্রকৃতির ধারা থেকে আলাদা হয়ে নিজস্ব একটি ধারা তখনো সৃষ্টি করেনি। প্রকৃতির অচেতন নিয়মের যে সুরে জীবজন্তু পশুপক্ষীর জীবন বাঁধা ছিলো, সেই একই সুরে বাঁধা ছিলো সেদিন আদিমযুগের মানুষের জীবন। প্রকৃতির জগত থেকে স্বতন্ত্র মানুষের জগৎ তখনো সুরু হয়নি। বনের পশুর মতই মানুষ আহার অন্বেষণ ক'রে বেড়িয়েছে, প্রকৃতির অন্ধ তাড়নায় বনের পশুদের মতই নরনারী প্রাকৃতিক ঋতু পরিবর্তনের ফলে যৌনমিলনে মিলিত হয়েছে আর পশুদেরই মতো ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের যৌন আকাঙ্খা নির্বাপিত হয়েছে।

মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীতে এসেছে তখন জীবজন্তুর মতো সেও একান্তভাবে প্রকৃতির রাজ্যের প্রজা। প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে যে জগৎ মানুষ তৈরী ক'রেছে মানুষের সেই নিজস্ব জগৎ তখনও সুরু হয়নি। নরনারীর পারস্পরিক সম্বন্ধের সমস্যা তখনো দেখা দেয়নি কেন-না নরনারী সেদিন জীবজন্তুরই মতো প্রকৃতির ক্রীতদাস ক্রীতদাসী ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতি তখনও নরনারীর যৌনসম্বন্ধের মধ্যে শুধু তার প্রাপ্যটুকু—জীবজগতের ধারাবাহিকতা—পূরণ ক'রে নিচ্ছিল। নরনারীর যৌনসম্বন্ধ তখনও নিছক প্রকৃতির কাজ আদায়ের উপায় মাত্র, সেটা নরনারীর নিজস্ব কিছু নয়। তাদের দেহ তখন সত্যি ক'রে তাদেরই নয়, ওটা প্রকৃতির, মন তখনও জাগেনি। প্রকৃতির জগৎ থেকে মানুষের জগতের স্বতন্ত্রতা বোধ অঙ্কুরিত হয়নি মানুষের মনে, মন দেহ সবই তখন প্রকৃতির জড় নিয়মের ক্লেদে আচ্ছন্ন।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই ক'রতে ক'রতে যখন মন জেগে উঠলো তখনই মানুষের সমাজ সত্যি ক'রে সুরু হলো। প্রকৃতির যে বাঁধা নিয়মে পশুরা খায় ঘুমোয় সন্তান উৎপাদন করে তার বিরুদ্ধে মানুষের অভিযান চল্‌লো। মানুষের বিশেষ চেতনা প্রকৃতির রাজ্যের বেড়া ভেঙ্গে নিয়ে গেলো মানুষকে তার বাইরে আজানা এক লোকে—মানুষের নিজস্ব এক জগৎ সৃষ্টি ক'রতে। তখনই নরনারী নিজেদের দেহকে সত্যি ক'রে নিজেদের দেহ হিসেবে পেলো, তার আগে ওটা ছিলো শুধু প্রকৃতির এলাকা। তারি সঙ্গে নরনারীর সম্বন্ধ নূতন রূপে দেখা দিলো, দেহের মিলনের সঙ্গে প্রাণের মিলনের মালা বদল হোলো, ভালোবাসা এলো, বিরহ উঁকি মারলো মনের কোণে। নরনারীর মিলন বিরহকে ঘিরে কাব্য, শিল্প, গান সব সৃষ্টি হোলো। নরনারীর সম্পর্কটা তাই শুধু প্রাকৃতিক নিয়মের বিধি

অনুযায়ী সম্পর্ক নয়। ওটা মানুষের সমাজের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের অভিব্যক্তি, ওটা মানুষের চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত মন ও দেহের সম্পর্ক।

দেহকে মন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখার মধ্যেই পুরুষ ও নারীর যৌন সম্পর্কের সমস্ত সর্বনাশ লুকিয়ে আছে। প্রথম যুগের নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে দেহ থেকে মনকে আলাদা ক'রে দেখার কোনো প্রশ্নই ছিলো না। কেননা সেদিন যৌনসম্বন্ধ ছিলো শুধু প্রকৃতির হুকুম তামিলের নামান্তর।

যখন মন জাগলো, প্রেমের কিশলয় ছেয়ে গেলো মনের বনে তখন নরনারীর যৌনসম্বন্ধ প্রকৃতির অন্ধনিয়মের আনুগত্য আর স্বীকার করলো না। দেহকে মনের ছন্দে বেঁধে নিলে মানুষ। দেহকে মনের ছন্দে বাঁধার নামই সংস্কৃতি, এরই সাধনা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ করে চলেছে। মন জাগবার পরেও পুরুষ কিন্তু নারীকে নিছক দেহ হিসেবে দেখার লালসা থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রতে পারনি। দেহকে মন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার নামই কুলটাবৃত্তি। পুরুষের মনই সত্যি করে কুলটা মন, তাই নারীকে সে শুধু দেহ হিসেবে দেখতে অর্থাৎ কুলটা বানাতে দ্বিধা করেনি। নারী প্রিয়া হোলো না, হয়ে রইলো শুধু ভোগ্যা।

আজও নারী মুখ্যতঃ ভোগ্যাই, সে প্রিয়া নয় এবং অন্য সমস্ত ভোগের সামগ্রীর মতই নারীও ভোক্তার একচেটিয়া সম্পত্তি; যতদিন ভোগলালসাকে পরিতৃপ্ত করে ততদিন আদরণীয়া, পরে উপেক্ষিতা ও বর্জিতা।

এই নিদারুণ অপমান সমাজের সব স্তরের নারীকে সহ্য করতে হয়। ধনীর ঘরের ঘরণী থেকে গরীবের ঘরের মেয়ে পর্য্যন্ত সবারই এক অবস্থা। ধনীর ঘরের ঘরণীরা যে হীরেপান্নায় সাজেন সেই হীরেপান্না তাঁদের ধনীপুরুষের ভোগের বস্তু বলে প্রচার করে ও তাঁদের নারীত্বকে ধিক্কার দেয়। ধনী পুরুষ তার ভোগের সামগ্রী নারীকে হীরেপান্নায় সাজিয়ে তার সম্পত্তি হিসেবে সকলের কাছে জাহির করে। ধনীদের মধ্যে রেষারেষি চলে কে তার নারীকে অন্যদের চেয়ে বেশী করে সাজিয়ে ধরতে পারে সবার সামনে। সাজানোটা হোলো ধনীর বিজ্ঞাপন, তার ভোগের সামগ্রীর মহার্ঘতার প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। যেদিন এক নারী তার লালসার ইন্ধন আর যোগাতে পারেনা তখন তাকে দেওয়া গহনাগুলো কেড়ে নিয়ে অন্য নারীকে সাজাতে পুরুষের একটুও বাধে না।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় নারীকে পুরুষের ভোগ্য হয়ে থাকার অপমান যুগ যুগ ধরে সহ্য ক'রে আসতে হচ্ছে; বেদনার কথা হচ্ছে এই যে মেয়েরা পুরুষের ভোগ্যা হয়ে থাকার অপমান অনুভব তো করেই না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গর্ব অনুভব করে অমুকের স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে। অথচ প্রত্যেক মেয়ে অমুকের স্ত্রী এই পরিচয়ই তার পক্ষে যথেষ্ট সম্মানের ব'লে বোধ করে। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের নামের পদবী বদলের মধ্যে পুরুষের সম্পত্তি হয়ে যাবার যে কুৎসিত ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে সে সম্বন্ধেও মেয়েরা আশ্চর্য রকম উদাসীন।

আসল কথা মেয়েদের মন জাগেনি। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মেয়েদের মনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে নানা উপকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। যে মেয়েদের মন ওরি মধ্যে একটু নড়ে উঠলো তারাও ভাবলে ড্রয়িংরুমে সোফায় এলিয়ে যখন সুখস্বাচ্ছন্দ্যে দিন

কাটছে তখন কি দরকার আরামের শয্যা ত্যাগ ক'রে জীবনের বন্ধুর পথে বের হবার কিম্বা নিজের মনটিকে জাগাবার।

সুবিধাবাদী চতুর পুরুষ নারীর মনের এই দ্বন্দ্ব ধ'রতে পেরে সাহায্য তো করলোই না মেয়েদের এলিয়ে পড়া মনকে মনুষ্যত্বের দিকে উদ্বুদ্ধ ক'রতে—উল্টে মেয়েদের মনের পলতেতে যেটুকু আলো জ্বলে উঠেছিল, সেটুকুও নিভিয়ে দেবার জন্য কলুষ-মাখানো আমোদের ফেণায় মেয়েদের দেহমন ভ'রে দিয়ে তাদের জানতেই দিলো না যে কখন আলো নিভে গেছে।

আমাদের কালের শিক্ষিতা আধুনিকাদের জীবন এই ট্রাজেডির একটি সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি। কুলটা মনওয়ালা পুরুষ সস্তা খোসামুদী ও আধুনিকতম মনোবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ ঝুটো টীকা দিয়ে আধুনিকাদের ভুলিয়ে দেহ দেহ আর মন মন, দুটোকে আলাদা রেখে দুটোকেই চরিতার্থ করা যায় এই সর্বনেশে মিথ্যাকে বিশ্বাস ক'রতে শিখিয়েছে, ও আজও শেখাচ্ছে। তার ফলে বর্ত্তমান কালে কুলটাচিত্তবৃত্তির যতো পুরুষ ও নারী দেখা যায় এমন আর কোনো দিনও ছিলো না মানব সমাজে।

এই অপরিসীম দুঃখের অবস্থা থেকে মেয়েদের বাঁচতে হ'বে আর বাঁচবার ভার তাদের নিজেদেরই নিতে হবে। জীবনের সমস্যাগুলিকে বুঝতে হবে ও সাহসের সঙ্গে ধূসর জীবনের পথে এসে দাঁড়াতে হবে সমস্যাগুলির সমাধান ক'রতে। পুরুষ ইচ্ছে করে বদ মতলবে নানা জট পাকিয়ে দিয়েছে মেয়েদের মনে। পুরুষদের নিজেদের সুবিধেগুলোকে শাশ্বত রূপে সাজিয়ে তারি গাঁঠ দিয়ে বেঁধেছে মেয়েদের দেহ ও মনকে। সংসারের এই গাঁঠ ও জট ছাড়াতে হবে সজাগ ও সংযত বুদ্ধির আঙ্গুলি দিয়ে।

অর্থনৈতিক মুক্তি চাই, দেহে ও মনে পুরুষের ক্রীতদাসী মেয়েদের সর্বাঙ্গীন মুক্তি চাই। এই মুক্তি কিন্তু সম্ভব হবে না যদি মেয়েরা একটি আদর্শের স্বচ্ছ ধারণার রঙে নিজেদের মনকে অনুরঞ্জিত না করে। যে সংস্কার ত্যাগ ক'রছে সেটা কেন ত্যাগ করছে, কি পাবে তার বদলে, যে শূন্যটি সৃষ্টি হবে মনের ভিতর থেকে সংস্কারের মাকড়সার জাল সাফ ক'রে দিলে—সেই শূন্য ভরবে কি দিয়ে, একধরণের মাকড়সার জালের জায়গায় অন্যধরণের মাকড়সার জাল যেন না সৃষ্টি হয়, সত্যি যেন আলো দেখা দেয় যেখানে আগে অন্ধকার ছিলো,—এগুলো সব সুস্থ সবল চিত্তে ভেবে দেখতে হবে মেয়েদের। অর্থনৈতিক মুক্তি খুবই জরুরী কিন্তু সে মুক্তি শুধু প্রথম পথনির্দেশক এই যাত্রা, তার চেয়ে একটুও বেশী সে নয়, সেটা মনে রাখতে হবে। অর্থনৈতিক মুক্তি গোটা মানুষটার মুক্তির প্রথম সূচনা মাত্র। এইটে মনে রেখে পূর্ণ আদর্শ মনে আঁকড়ে ধরে মেয়েদের এগিয়ে যেতে হবে।

কম্যুনিজম ও বিবর্তবাদ

আমাদের জগৎ এখনও স্বাভাবিক পরিণতির মৌলিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। এই দুনিয়ায় যদিও ব্যষ্টি নিজস্ব সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজকর্ম কোরে থাকে তবুও অগণিত ব্যষ্টি বিরোধী ইচ্ছার সংঘর্ষের ফল এমন হোয়ে দাঁড়ায় যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যষ্টির ইচ্ছার পরিপন্থী এবং অনভিপ্রেত। এঙ্গেলস বলেন—"ব্যষ্টির ইচ্ছার এবং কর্মের সংঘর্ষের ফলে সামাজিক জগতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যার সঙ্গে অচেতন প্রাকৃতিক জগতের বেশ তুলনা চলতে পারে। কর্মের উদ্দেশ্য মানুষের আছে কিন্তু কর্ম থেকে প্রকৃত যে পরিণতি লাভ হয় তা মানুষের আকাঙ্খিত নয়, অথবা আকাঙ্খিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে পরিণতির যতটা সাদৃশ্য আছে তা অবশেষে অভীপ্সিত ফলাফল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করে।"[১]

মানুষের সামাজিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে সর্বস্পর্শী এবং সর্বব্যাপী সমষ্টিগত সামাজিক চৈতন্য নেই, আছে কেবল ব্যষ্টির ইচ্ছার একক। এই সব ঐকিক ব্যষ্টির ইচ্ছা নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন, সকলের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন নয়। নিজেদের মধ্যে কোন সম্পর্ক না থাকায় এরা বন্য পশুর মত উগ্রভাবে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ চালায় এবং পরিশেষে নিজেরাই অসহায় ভাবে অচেতন প্রকৃতির নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সাধারণভাবে প্রকৃতির নিয়ম মনুষ্য সমাজের সঙ্গেও খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু বিশেষভাবে বলতে গেলে তা নয়। চেতনা একক হিসাবে অর্থাৎ বিবর্তনের ডায়েলেকটিক ধারায় মানুষের সচেতন কর্মধারা (চেতনা সম্বন্ধে কল্পনা অথবা আধ্যাত্মিক চিন্তা নয়) প্রথমে মানুষের সমাজে দেখা দেয়। নতুন বিষয় হিসেবে জগতে চেতনার আবির্ভাব কি মনুষ্য সমাজকে প্রকৃতির নিয়ম থেকে স্বাধীন কোরে দিয়েছে? না, স্বাধীন কোরে দেয় নি, সমাজ প্রকৃতির মৌলিক নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন। প্রাকৃতিক নিয়মের আভ্যন্তরীণ পরিচালন সম্বন্ধে জ্ঞান, এ সম্বন্ধে মানুষের চেতনা, মানুষকে প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে, সমাজের উপকার সাধনের জন্যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে আয়ত্বাধীন আনতে সাহায্য করে। এই সচেতন, পরিচালন, সমাধান এবং নিয়ন্ত্রণ সমাজকে প্রাণীজগৎ অথবা উদ্ভিদ জগতের বিপরীত দিকে অচেতন প্রাকৃতিক নিয়মের আয়ত্বের বাইরে বিশেষভাবে স্থাপিত কোরেছে। এই সচেতন প্রয়োজনীয়তা এবং প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে জীবনের সচেতন মীমাংসাই হচ্ছে স্বাধীনতার একমাত্র এবং পরম অর্থ। এইখানেই মানব জগৎ প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগৎ থেকে নিজগুণে পৃথক। প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগৎ প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে সচেতন মীমাংসার স্বাধীনতা উপভোগ করে না; তারা প্রাকৃতিক নিয়মের ক্ষুব্ধ ঢেউয়ের ওপর ঝড়ের মুখে

পাল ছেঁড়া নৌকার মত অসহায় ভাবে ভাসতে থাকে।

"এরূপ ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অর্থ এছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে সামাজিক মানুষ, সহযোগী উৎপাদক প্রকৃতির সঙ্গে তাদের আদান প্রদান যুক্তি-যুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে, অন্ধ শক্তির মত প্রকৃতির দ্বারা চালিত হবার পরিবর্তে প্রকৃতিকে নিজেদের আয়ত্বাধীনে আনবে এবং মানব শক্তি যতটা সম্ভব কম ব্যয় করে এবং মানব প্রকৃতির সর্বতোভাবে উপযুক্ত ও যোগ্য অবস্থায় মানুষ তাদের কর্তব্য সম্পন্ন করবে। কিন্তু প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র সর্বদাই থেকে যায়। তারপর থেকে শুরু হয়ে যায় মানুষের শক্তিয় ক্রমোন্নতি; প্রকৃত স্বাধীনতার ক্ষেত্রই হচ্ছে মানুষের ক্ষমতার উদ্দেশ্য। এই প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রকে ভিত্তি কোরেই শুধু স্বাধীনতা পরিবর্দ্ধিত হোতে পারে।"[২]

দুর্ভাগ্যবশতঃ ডিটারমিনিজম সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এনে দিয়েছে।এই ভুল ধারণা কেবল যে মার্কসবাদ সম্বন্ধে অজ্ঞ, মুর্খ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই আছে তা নয়, এমন সব বহু অর্দ্ধ পক্ক মার্কসবাদীর মধ্যেও এরূপ ধারণা আছে যাদের মার্কসবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান কেবল কতকগুলি অর্থহীন শব্দ আওড়ানো এবং শ্লোগান মুখস্ত করাতেই রয়ে গেছে। বর্তমানে এই তত্ত্ব নিয়ে পরিষ্কারভাবে কিছুটা আলোচনা করা সঙ্গত হবে বলে মনে করি।

ডিটারমিনিজমের ব্যাখ্যা তারা এইভাবে কোরে থাকে। মানুষের সমাজ যদি প্রকৃতির একটা অংশ হোয়ে থাকে তা হলে প্রকৃতির বাইরে তার কোন বিশিষ্ট অস্তিত্ব নেই; প্রকৃতির নিয়ম ত্যকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, তার নিজের কোন বিশিষ্ট নিয়ম নেই। এরা ডিটারমিনিজমকে প্রকৃতিবাদে পর্যবসিত করেছে। প্রকৃতিবাদীর মতে প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগৎ যেমন প্রৃকতির অংশ, মানুষের সমাজও তেমনিভাবে প্রকৃতির অংশ এবং সামাজিক নিয়মগুলি প্রকৃতির নিয়মছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতিবাদ উভয়তঃ ডায়লেকটিকহীন এবং অনৈতিহাসিক। প্রকৃতিবাদ ডায়লেকটিক বর্জিত, কারণ তা সমাজের বিশিষ্ট নিয়মকে অস্বীকার করে এবং যান্ত্রিকভাবে তাকে সাধারণের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। সুতরাং প্রকৃতিবাদ মানুষের সমাজের বিবর্তন ও পরিবর্তনশীল প্রকৃতির ব্যাখ্যা করতে পারে না, কারণ প্রয়োজনীয়তা ও স্বাধীনতা এই দুই বৈপরিত্যের অস্তিত্ব এবং মানুষের সমাজে এই দুটির ডায়লেকটিকাল ঐক্য সম্বন্ধে কোন ধারণা তার নেই। মার্কসবাদ প্রকৃতিকে মানুষ থেকে স্বাধীন বাহ্যিক বাস্তবতা হিসাবে মোটেই অস্বীকার করে না, প্রকৃতির আয়ত্বের বাইরে প্রকৃতির নিয়মের প্রভাবহীন একক হিসাবে মানুষের সমাজকে জাহিরও করে না। সেখানে নির্গুণকে (absolute) অস্বীকার করা হয়নি, কিন্তু আপেক্ষিকতাকেও ধরা হয়েছে, সাধারণকে পরিত্যাগ করা হয়নি কিন্তু বৈশিষ্ট্যকেও গ্রাহ্য করা হয়েছে।

মানুষের আবির্ভাবের পূর্বেও প্রকৃতি ছিল, এখনও তেমনি আছে কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রকৃতিকে বিচার করা হয়েছে। মানুষের আবির্ভাবের পূর্বেকার প্রকৃতি আর তার পরের প্রকৃতি এক নয়। মানুষের কর্মের জন্য প্রকৃতির পরিবর্তন এবং রূপান্তর হয়েছে। এও জেনে রাখা দরকার যে প্রকৃতির পরিবর্তনে প্রযুক্ত মানুষের শিল্প মানুষকেও প্রকৃতির চেয়ে বেশি পরিবর্তিত করেছে। সমাজ এবং প্রকৃতির পরিবর্তনে মানুষের কর্ম নতুন বিষয়রূপে দেখা দিল।

প্রকৃতির অংশ হলেও মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের অত্যাচারের বিরুদ্ধে চিরন্তন বিদ্রোহ ঘোষণা করে এসেছে। প্রকৃতিকে জয় করার জন্য প্রকৃতির জগৎ থেকে মানুষের জগৎকে ক্রমশই পৃথক করবার জন্য এবং অন্ধ প্রকৃতির নিয়মের শৃঙ্খল থেকে মানুষের জগৎকে মুক্ত করার জন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ চিন্তাকে সেই দিকে চালিত করেছে।

এই জন্যই প্রকৃতির অংশ হলেও মানুষের সমাজ বিশিষ্টভাবে প্রকৃতির অংশ নয়, প্রাকৃতিক নিয়মদ্বারা নিঃসন্দেহভাবে নিয়ন্ত্রিত হলেও প্রকৃতির নিয়ম থেকে "স্বাধীন" এবং তার নিজের নিয়ম—মানুষের সমাজের নিয়ম—প্রকৃতি ও সমাজে প্রযুক্ত মানুষের সচেতন কর্মধারার নিয়ম দ্বারা সমাজ পরিচালিত।

একথা আমরা পরিষ্কারভাবে না বুঝলে ডায়লেকটিকাল এবং ঐতিহাসিক মার্কসীয় ডিটারমিনিজমের সঙ্গে সম্পর্কহীন স্থূল, ডায়লেকটিকস-বর্জিত অনৈতিহাসিক, প্রকৃতিবাদী ডিটারমিনিজমের কবলে পড়ে যাব। মার্কসীয় ডিটারমিনিজমের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞতা আরও নানা দিক থেকে বিপত্তি এনে দেবে। এই অজ্ঞানতা আমাদের অদ্বৈতবাদের সঙ্কীর্ণতায় পরিচালিত করবে, ডিটারমিনিজম'এর ধর্মতত্ত্ব-বিরোধী বৈপ্লবিক তাৎপর্যকে নষ্ট করে দেবে এবং তাকে যান্ত্রিক অদৃষ্টবাদে পর্যবসিত করবে।

বিবর্তবাদ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ডিটারমিনিজমের প্রসঙ্গ তুলেছি কেন? কারণ, আমার মনে হয়, প্রকৃতিবাদ এবং এই ধরণের প্রকৃতিবাদী ডিটারমিনিজম হচ্ছে বিবর্তবাদের প্রধান দার্শনিক কারণ, প্রকৃতিবাদ এবং প্রকৃতিবাদী ডিটারমিনিজমের অর্থ হচ্ছে এইভাবে সমাজকে প্রকৃতির একান্ত অধীনস্ত অংশে পর্যবসিত করা। মানুষের সচেতন কর্মধারার উগ্রতা ও অজ্ঞতার মধ্যেই বিবর্তবাদের বীজ নিহিত আছে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বিস্তৃতি বিবর্তনবাদের জন্ম দিয়েছে। মানুষের সচেতন কর্মধারা যত প্রবলভাবে সমাজের মধ্যে বর্তমান ভৌতিক প্রাকৃতিক নিয়মের স্থান দখল করবে ততশীঘ্র এবং নিশ্চিতভাবে বিবর্তবাদ নিশ্চিহ্ন হতে থাকবে।

এই কারণেই আমি বিবর্তবাদ ডিটারমিনিজমের প্রসঙ্গ তুলেছি।

"জীবনের যে সব নিয়মাবলী মানুষকে বেষ্টন কোরে আছে এবং যা এতদিন মানুষকে পরিচালিত করে এসেছে, সেগুলি এখন মানুষের আয়ত্তে এবং কর্তৃত্বাধীনে এসে পড়বে। মানুষ এই প্রথম প্রকৃতির প্রকৃত এবং সচেতন প্রভু হয়ে দাঁড়াবে, কারণ এখন সে তার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কর্তা। নিজের যে সব সামাজিক কর্মধারার নিয়ম এতদিন ধরে অজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়ম বলে মানুষের সামনে দাঁড়িয়েছিল এবং তাকে বশীভূত কোরে রেখেছিল, তা এখন তার নিজের কর্তৃত্বাধীনে সচেতনভাবে ব্যবহৃত হবে। মানুষের যে নিজস্ব সামাজিক সংগঠন এতদিন ধরে ইতিহাস এবং প্রকৃতি কর্তৃক আরোপিত প্রয়োজনীয়তা হিসাবে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল, তা এখন তার নিজের স্বাধীন কর্মধারার ফল স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। এতদিন যে সব অজ্ঞাত বাহ্যিক শক্তি ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে সেগুলি মানুষের নিজস্ব আয়ত্বাধীনে এসে পড়বে। কেবলমাত্র তখন থেকেই মানুষ ক্রমশঃ সচেতনভাবে তার নিজের ইতিহাস রচনা করবে, কেবলমাত্র তখন থেকেই মানুষ যে সব সামাজিক কারণ রচনা করবে, সেগুলির ফল প্রধানতঃ এবং ক্রমবর্দ্ধমান মাত্রায়

তার ইচ্ছার অনুরূপ হবে।"৩

প্রাকৃতিক নিয়ম এবং মানুষের জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সম্পর্কে এঙ্গেলস তাঁর 'ফয়েরবাখ' নামক পুস্তকে নিম্নলিখিত সারগর্ভ কথাগুলি বলেছেন ঃ

"একদিক থেকে প্রকৃতি হতে সামাজিক পরিবর্ধনের ইতিহাস মূলত ভিন্ন। প্রকৃতির উপর মানুষের কর্মধারার প্রতিক্রিয়ার কথা না ধরলেও প্রকৃতির মধ্যে কতকগুলি অন্ধ, অচেতন বাহন রয়েছে—এই বাহনগুলি পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং এদের পারস্পরিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে সাধারণ নিয়মগুলি নিজেদের জাহির করে। যাই ঘটুক না কেন তা সচেতনভাবে অভীপ্সিত উদ্দেশ্য হিসাবে ঘটে না। অপরপক্ষে, সামাজিক ইতিহাসে সচল বাহনগুলির চেতনা রয়েছে; এই বাহনগুলি হচ্ছে মানুষ, যারা চিন্তা এবং তীব্র অনুরাগ নিয়ে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজ কোরে যায়। সচেতন সংকল্প, অভীপ্সিত উদ্দেশ্য ছাড়া কিছু সংঘটিত হয় না। ঐতিহাসিক গবেষণার জন্যে এই প্রভেদের মূল্য থাকলেও তা কখনও এ কথার পরিবর্তন করে না যে ইতিহাসের ধারা সাধারণ নিয়ম মেনে চলে।"৪ সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে সচেতন ধারণার অর্থ প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে স্বাধীনতা নয়, এই সচেতন ধারণা প্রাকৃতিক নিয়ম আয়ত্বাধীন করাকে সম্ভব করে তোলে। চেতনা অথবা সচেতন ইচ্ছা কখনো আমাদের ইনডিটারমিনিজমের আধ্যাত্মিক জগতে নিয়ে যায় না। সাধারণতঃ যে সব যান্ত্রিক ডিটারমিনিষ্ট ডিটারমিনিজমকে বিকৃত প্রকৃতিবাদে পর্যবসিত করে তাদের মধ্যে এই ভুল ধারণাটি রয়ে গেছে।

কিন্তু যে সব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আমাদের মনে আসে সেগুলি হচ্ছে এই ঃ বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক কতকগুলি সচেতন ব্যষ্টিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন দেখতে পাই যে প্রকৃত পরিণতি অভীপ্সিত উদ্দেশ্য থেকে বিভিন্ন? যুগের পর যুগ ধরে মানুষের ইতিহাসে সচেতন ব্যক্তিগত ইচ্ছার সুনিশ্চিত অস্তিত্ব থাকা সত্বেও কেন এখন পর্যন্ত সমষ্টিগত সচেতন ইচ্ছার বিকাশ হয়নি? ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লক্ষ লক্ষ সচেতন ইচ্ছার ব্যষ্টিক একক থেকে এই সমষ্টিগত সামাজিক চৈতন্যের বিকাশ এবং পরিবর্দ্ধনের, এক কথায় সমষ্টিগত সামাজিক চৈতন্যের বিবর্তনের পথে কি বাধা দিচ্ছে?

আমার মনে হয় এই প্রশ্নগুলি বর্তমান জগতের কতকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রসঙ্গ তুলে ধরে এবং এই প্রশ্নগুলির উত্তর বর্তমান জগতের গঠন কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সাহায্য করে।

প্রকৃত ফলাফলগুলি কেন ব্যষ্টির অভীপ্সিত উদ্দেশ্য থেকে ভিন্নরূপ ধারণ করে? যখন থেকে অন্যপ্রকার সমাজ ব্যবস্থা "আদিম কমিউনিজমের" স্থান অধিকার করল তখন থেকে মানুষের একাঙ্গিভূত সমাজ শতধা বিভক্ত হয়ে গেল। তখন থেকেই সমাজ খন্ড-বিখন্ড, বিভিন্ন ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত এবং বিবদমান শ্রেণী সমূহে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। "আদিম কম্যুনিস্ট" সমাজের একাঙ্গিভূত সমষ্টিগত চেতনা, তা সে যতই আদিম হোকনা কেন,ভেঙ্গে গিয়ে বিবদমান শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজের শ্রেণী-চেতনায় পর্যবসিত হলো। এটা অবিশ্যি খুবই সত্য যে এতে সমাজের ডায়লেকটিকাল গতি আরও অগ্রসর হয়ে গিয়েছে, কিন্তু বিশিষ্ট ফল হয়েছে এই যে "আদিম কম্যুনিস্ট" সমাজের মানুষের স্বচ্ছ সামাজিক ঐক্য,

শ্রেণীবিভক্ত, ব্যষ্টির শতধা বিভক্ত শ্রেণী স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রবল বন্যায় লুপ্ত হয়ে গেল।

সমাজের সমষ্টি অধিকৃত উৎপাদনশীল ও বন্টনশীল ব্যবস্থা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে লক্ষ লক্ষ ব্যষ্টির মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ল। সহস্র সহস্র বিভিন্ন উৎপাদক সমাজের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেবল ব্যক্তিগত লাভের জন্যেই উৎপাদন করে চলল। যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত উৎপাদক উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করবার জন্য বাজারে এসে না জমায়েত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বতন্ত্র উৎপাদক জানতে পারেনা যে অন্যান্য উৎপাদকরা কি পরিমাণে এবং কি ধরণের জিনিষ উৎপন্ন করছে। উৎপাদন-প্রণালীতে উৎপাদকেরা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন, সর্বপ্রকার সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের উৎপাদন শ্রম যেমন সামাজিক তেমনিই এই পণ্য-উৎপাদনশীল সমাজেও যে তাদের উৎপাদন-শ্রম সামাজিক তা বাজারের অচেতন এবং মৌলিক গঠন-কৌশলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। পণ্য-উৎপাদনশীল সমাজে কেবলমাত্র বাজারেই উৎপাদনকারী সামাজিক প্রকৃতি প্রমাণিত হয়। ব্যষ্টির মধ্যে সম্পর্ক পণ্যের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি ধারণ করে। মানুষের কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে, তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্যে একটা "স্বাধীন" অথচ অচেতন ও নির্বাক পণ্য-জগৎ যেন মনুষ্য-জগৎকে শাসন করে চলেছে।

অচেতন প্রাকৃতিক জগৎ আবার মনুষ্য জগৎকে গ্রাস করে ফেলে। এই হচ্ছে বিবর্তবাদের জগৎ। এই জগতে বস্তু আসলে যা নয় তাই বলে মনে হয়। ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, ভুল ও আপাতঃ বাস্তবতার আড়ালে সামাজিক বাস্তবতা ঢাকা পড়ে যায় এবং প্রাকৃতিক নিয়ম যেন মানুষের সচেতন সামাজিক নিয়মগুলিকে অস্তিত্বহীন করে দেয় এবং মানুষের সামাজিক জীবনকে মৌলিক পাশবিকতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে বলে মনে হয়।

"এখানে মানুষের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক তাদের চোখে বস্তুগত সম্পর্কের কাল্পনিক রূপ ধারণ করে। সুতরাং উপমা দিতে গেলে আমাদের ধর্মের কুয়াশাচ্ছন্ন জগতের আশ্রয় নিতে হবে। সেই জগতে মানুষের চিন্তার সৃষ্টিকে স্বাধীন জীবন্ত প্রাণী বলে ধারণা করা হয় এবং তারা যেন নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ও মনুষ্য জাতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। তেমনি যে জগতে মানুষ স্বহস্তে জিনিষ প্রস্তুত করে সেই পণ্য জগতেও একই অবস্থা। একে আমি বলছি বিবর্তবাদ। উৎপাদন শ্রমের ফল যখনই পণ্যরূপে দেখা দেয় তখনই বিবর্তবাদ তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে, সুতরাং পণ্য উৎপাদন থেকেও তা অবিচ্ছিন্ন নয়।"[৫] পণ্য উৎপাদনশীল ক্যাপিটালিস্ট জগৎ হচ্ছে বিবর্ত জগৎ। মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ বস্তুগত সম্বন্ধরূপে প্রতীয়মান হয়, বাজার নিয়ন্ত্রণকারী স্বৈরাচারী নিয়মাবলীর অচেতন, স্বতশ্চল, স্বেচ্ছাচারী পেষণের দ্বারা মানুষের প্রকৃত মূল্য (সামাজিক মূল্য) ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

উৎপাদক বিশেষ কখনো জানতে পারেনা যে, তাদের উৎপন্নের দাম এবং প্রকৃত মূল্য সমান হবে কিনা। সমাজ প্রাকৃতিক নিয়মের দানব বিশেষ যে বাজার তা বিভিন্ন সচেতন পণ্য-উৎপাদক অর্থাৎ সচেতন ব্যষ্টির ইচ্ছার আয়ত্বের বর্হির্ভূত কৌশলের মধ্য দিয়ে পণ্যের দাম এবং প্রকৃত মূল্যের একটা মীমাংসা কোরে দেয়। এই কারণেই উদ্দেশ্য ব্যষ্টির সচেতন

ইচ্ছার দ্বারা অভীপ্সিত হলেও ফলাফল ভিন্নরূপ ধারন করে।

উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতির উপর গঠিত এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজে বিবর্তবাদ দেখা দিতে বাধ্য এবং সমাজে বাজারের প্রক্রিয়ার (প্রকৃতির মৌলিক নিয়ম) জন্য ব্যষ্টির সচেতন ভাবে অভীপ্সিত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

সমাজের উৎপাদন যন্ত্রে সমাজের সমস্ত লোকের সমষ্টিগত অধিকার থাকবে, শ্রেণীভেদ যখন লুপ্ত হয়ে যাবে এবং সামাজিক উৎপাদন যখন সচেতন ভাবে পরিচালিত হবে তখনই কেবল বিবর্তবাদ দূর হয়ে যাবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যষ্টির সচেতন ভাবে অভীপ্সিত উদ্দেশ্য ও প্রকৃত ফলাফলের মধ্যে যে অসমন্বয় রয়েছে তা অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

"বাস্তব উৎপাদন ধারার ভিত্তির ওপর গঠিত সমাজের জীবনধারা (life process) মায়াজাল ছিন্ন করতে পারে না। যতক্ষণ না এই জীবনধারা স্বাধীন সহযোগী মানুষের উৎপাদন হিসাবে পরিগণিত না হবে এবং যতক্ষণ না তা স্থিরীকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে।"[৬] এই বিবর্তবাদ সমাজের উৎপাদনশীল জীবনে যখন একবার দেখা দিল তখন সামাজিক জীবনের সংস্কৃতি সংগঠনের ভেতরেও দেখা দিতে বিব্রত হোলো না। মানব সমাজের উৎপাদনশীল এবং বন্টনশীল জীবনে বিবর্তবাদের অস্তিত্ব ধর্মজগতে তার স্বাভাবিক প্রতিচ্ছায়া বিস্তার করল। ধর্মের ভিতরে বহু বিবর্তবস্তু রয়েছে। প্রকৃতির লীলা, উৎপাদনশীল ও বন্টনশীল জগতে, বস্তুতঃ মানুষের সমস্ত সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা এবং অব্যবস্থার কোন ব্যাখ্যা না দিতে পেরে মানুষ হতাশায় ধর্ম সৃষ্টি করল; এই ধর্মে মানুষের (শ্রেণীর) সামাজিক কার্যকলাপের উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করা হল এবং সামাজিক কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করার জন্যে একটা অলৌকিক 'বাস্তবতা' তৈরি করা হোলো। আধ্যাত্মিক বিবর্তবস্তু (metaphysical fetish) অর্থাৎ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করা হোলো এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ভেতর দিয়েই কেবল বিভিন্ন ব্যষ্টির যে সম্পর্ক রয়েছে তা স্থাপিত করা হোলো।

এছাড়া আর অন্য কিছুই হতে পারে না, কারণ "ধর্মজগৎ বাস্তব জগতের প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়"[৭] এবং "দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সম্পর্ক যখন মানুষের সামনে তার স্বজাতি এবং প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ বোধগম্য এবং যুক্তিযুক্ত সম্পর্ক উপস্থাপিত করবে কেবলমাত্র তখনই বাস্তব জগতের প্রতিচ্ছায়া ধর্মজগৎ লুপ্ত হয়ে যাবে।"[৮]

প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে এবং উৎপাদন ও বন্টনের সামাজিক গঠন কৌশলের উপর মানুষের সম্পূর্ণ আয়ত্বের মধ্যে দিয়ে অজ্ঞতা ও ভয় থেকে উদ্ভূত ধর্মের এই বিবর্তবাদ অবলুপ্ত হতে বাধ্য। ইন্দ্রীয়হীন পদার্থ (inorganic matter) থেকে ইন্দ্রীয়বান পদার্থ (organic matter), প্রাণহীন পদার্থ থেকে প্রাণবান পদার্থ, নিম্নতম সম্ভব চেতনা-সম্পন্ন প্রাণী (organic) থেকে উচ্চতম সম্ভব প্রাণী, যেমন মানুষ, এইভাবে পদার্থের বিবর্তন চলে এসেছে। মানব সমাজেও আদি থেকে আজ পর্যন্ত নিশ্চিত ও ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধন আমরা দেখতে পাই। প্রকৃতির উপর মানুষ ক্রমাগত তার অক্লান্ত আক্রমন চালিয়েছে, এবং অল্প অল্প করে প্রকৃতির রাজ্য অধিকার কোরে তাকে মানুষের রাজ্যে পরিবর্তিত করেছে। উৎপাদন শক্তিগুলিও ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং প্রকৃতির সঙ্গে

এই সংগ্রাম এবং সামাজিক উৎপাদনের পরিবর্দ্ধন ও বন্টন-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা মানুষের চেতনার সীমা বিস্তৃত করে দিয়েছে এবং যুগের পর যুগ ধরে এই চেতনাকে সুগভীর কোরে তুলেছে। এইভাবে ইতিহাসকে এই বলে বর্ণনা করা যেতে পারে যে, এটা হচ্ছে নিম্নতর চেতনা থেকে উচ্চতর চেতনার দিকে মানুষের বিরামহীন এবং কঠোর গতি।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব, আর্থিক থেকে কৃষ্টিজীবন পর্যন্ত সামাজিক জীবনের সমস্ত অংশগুলির ওপর সচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অভাব, ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সামাজিক নিয়ম বলে স্বীকার করার জন্যে সামাজিক ঐশ্বর্য্য কতিপয় ব্যক্তির অধিকারে আসা, বাজারের গঠন কৌশলের মধ্য দিয়ে পার্থিব ও সংস্কৃতিমূলক উৎপাদন সামাজিক-প্রকৃতি স্থাপনের মৌলিক পন্থা—এই সমস্তই বুর্জোয়া সমাজে 'চেতনা' বলে পরিচিত ব্যষ্টিক আধ্যাত্মভাবের (egoism) পরিবর্তে সামাজিক চৈতন্যের, হৃদয়াবেগের প্রাবল্যের পরিবর্তে যুক্তির, ধর্মের পরিবর্তে বিজ্ঞানের পরিবর্দ্ধনের পথে এখন পর্যন্ত ও প্রবল বাধার সৃষ্টি করছে।

বিবর্তবাদ অর্থাৎ বিকৃত মূল্য অথবা অলীক মূল্য বস্তুর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, মানুষ তার নিজের সৃষ্টির দাস হয়ে পড়েছে। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে হলে, মানুষের ওপর বস্তু-জগতের মরীচিকার অবসান চিরতরে ঘটাতে হবে। এরূপ করতে হলে, বিবর্তবাদের ইন্দ্রজাল ছিন্ন করতে হলে একটা নতুন কেন্দ্রবে ঘিরে অর্থাৎ প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিবর্তনের দ্বন্দ্ব-পরিণতিমূলক ভৌতিক ধারণার ভিত্তির উপর জীবনের ধারণাকে গঠন করতে হবে। জীবনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আপাত-বিরোধের স্থান দখল করবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ পারস্পরিক সম্পর্ক। সমাজের সচেতনভাবে পরিকল্পিত উৎপাদনশীল জীবন আমাদের সম্পূর্ণতা (totality) সম্বন্ধে জ্ঞান এনে দেবে। আত্মাকে (spirit) আদি কোরে যে আধ্যাত্মিক সম্পূর্ণতা সে সম্পূর্ণতা, নয়, সমাজের উৎপাদনশীল জীবনকে আদি কোরে এবং মানুষের সৃষ্টিশীল জীবনের সমস্ত বিভিন্ন অংশগুলিকে ব্যপ্ত কোরে যে ভৌতিক (material) ও সামাজিক সম্পূর্ণতা, এটা হচ্ছে তাই।

সামাজিক জীবনের গোড়াতে অর্থাৎ সমাজের উৎপাদনশীল জীবনে এইরূপ সচেতন নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা ছাড়া বুর্জোয়া সমাজের এই বিবর্তবাদমূলক প্রকৃতি দূরীভূত হবে না। "বাস্তব উৎপাদন ধারার ভিত্তির ওপর গঠিত সমাজের জীবনধারা মায়াজাল ছিন্ন করতে পারে না যতক্ষণ না এই জীবনধারা স্বাধীন সহযোগী মানুষের উৎপাদন হিসাবে পরিগণিত না হবে, এবং যতক্ষণ না তা স্থিরীকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত না হবে।"[৯]

বুর্জোয়া সংস্কৃতির এই অধঃপতনের যুগে বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা যে সব নানা প্রকার বিবর্তবাদ পুনরুত্থাপিত করেছেন সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বস্তুর সারাংশ (essence of things) ব্যাখ্যার পক্ষে অনুপযুক্ত বলে যুক্তি ও যৌক্তিক ধর্মকে (reason and rationalism) তীব্র আক্রমণ করা হচ্ছে। প্রভুত্বের পরিবর্তে মানুষের

ঐক্যের বন্ধন বলে, স্বাধীন জনসমাজের চিহ্ন বলে যুক্তি আজ পদদলিত হচ্ছে। নাৎসী দর্শনবিদ হেইসার বলেন, "আমাদের কর্তব্য হচ্ছে বিচারশীল বুদ্ধির শক্তিকে খর্ব করে দেয়া, এই বিচারশীল বুদ্ধি সহজ জাতিবোধকে সক্রিয়ভাবে নষ্ট কোরে দিচ্ছে। সহজাত জাতিবোধকে বাঁচাতেই হবে।" যুক্তি কোন কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে না, পারে শুধু দৃশ্যমানতার ব্যাখ্যা করতে, অনুভূতিই কেবল বস্তুর গভীরতা মাপতে পারে। যুক্তি নয়—অনুভূতি, ভাগ্য, নিয়তি প্রভৃতিই কেবল মানুষের অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং করা উচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'back to nature' এবং নিয়তির পক্ষ নিয়ে যৌক্তিক ধর্মের প্রতি, ভোল্টেয়ারের যৌক্তিক ধর্মের প্রতি রুশোর যে আক্রমণ এটা একরকম তারই পুনরাভিনয়। যুক্তি থেকে মুক্ত ও অনাবদ্ধ অনুভূতি শাসন করবে। যুক্তির স্থান অধিকার করবে 'আত্মা', মানুষের চিন্তায় অযৌক্তিক বিশ্বাস আপনাকে জাহির করবে। স্পেঙ্গলার, থমাসম্যান, কোগস, বার্গস প্রমুখ বহু বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা এই নিয়েই ব্যস্ত। মানবজগতে অধিষ্ঠিত দেবতার স্থান দখল করার জন্যে নিগূঢ়তত্ত্বের বোধকে আহ্বান করা হচ্ছে। "আমরা যে সুন্দরতম বস্তু অনুভব করি তা হচ্ছে নিগূঢ়। ...যার মধ্যে আমরা প্রবেশ করতে পারি না, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে গভীর যুক্তি ও দীপ্তিমান সৌন্দর্যের প্রকাশ, যা অতি মৌলিক আকারে আমাদের যুক্তির বোধগম্য। আমাদের জ্ঞান এবং অনুভূতি প্রকৃত ধর্মের উষ্ণতা সৃষ্টি করেছে, এই অর্থে কেবলমাত্র এই অর্থেই আমি অতি ধর্ম বিশ্বাসী।" (আইনস্টাইন ঃ The World as I see it.)

এতে প্রমাণ হচ্ছে যে বিরাট মনীষী, বিজ্ঞান জগতের মনীষী আইনস্টাইন দর্শনে কিরূপ অসহায়। নিগূঢ়তত্ত্বের আবরণে আইনস্টাইন ঈশ্বরকে, আধ্যাত্মিক বিবর্তবাদকে নিয়ে এসেছেন।

স্পেঙ্গলার প্রমুখ বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা যুক্তি এবং যৌক্তিক ধর্মকে সরিয়ে দেবার জন্য এবং বিশ্বাসকে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা হিসাবে বসাবার জন্য কৃতসঙ্কল্প।

উদারনৈতিক এবং ফ্যাসিষ্ট এই উভয় দলের বুর্জোয়া চিন্তাবিদরাই বাহ্য বিষয়তার (objectivity) বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালিয়েছেন। বর্ণ-নিগূঢ়তা (race mysticism) একটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক অসম্ভব সিদ্ধান্ত। বর্ণ সম্বন্ধে একটা আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত তৈরী করা হয়েছে। বর্তমান যুগের রক্ত রহস্যে বিশ্বাসী আদিম যুগের মানুষেরা (blood mystic primitives) অর্থাৎ ফ্যাসিস্টরা রক্ত সম্বন্ধে রহস্যময় ধারণা আবার প্রচার করছে; আমরা জানি যে আদিম যুগের মানুষের চিন্তায় এই ধরণের ধারণা বাসা বাঁধতো। ফ্যাসিস্টদের মতে বর্ণ (race) এবং রক্ত একই এবং রক্তকে এখানে শরীর বিজ্ঞানের দ্বারা বিচার করা হয় নি, হয়েছে অর্ন্তর্বিষয় (subjectively) হিসাবে আধ্যাত্মিকভবে। বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি হচ্ছে এই রহস্যময় রক্তের ফল, এই রক্ত থেকেই উদ্ভাসিত হয়েছে ন্যায় সত্য এবং জ্ঞান। সত্য এবং জ্ঞানের কোন বাহ্য বৈষয়িক বাস্তবতা নেই। বর্ণ এবং জাতি এক হওয়ায় জাতির ধারণাও অন্তর্বৈষয়িক হয়ে পড়ছে। ফ্যাসিস্ট পণ্ডিত উইলহেলম স্টেপলারের মতে সাম্রাজ্য হচ্ছে, "দানবের মতকর্মশীল" জাতির অন্তর্বৈষয়িক পরিপূর্ণতা। এই নতুন অন্তর্বিষয়তার বাহ্য-বৈষয়িক বাস্তবতা অস্বীকারের একটি মাত্র উদ্দেশ্য থাকতে

পারে। বাহ্য-বিষয়তা নির্ভুল নির্দেশ দিচ্ছে যে বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। এই নতুন অন্তর্বিষয়তা হচ্ছে ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ, শোষণ ও নির্যাতন, শাসক শ্রেণীর পবিত্রীকৃত হিংসাকে সমর্থন করবার জন্য ও বজায় রাখবার জন্য একটা অদ্ভুত এবং হাস্যকর প্রচেষ্টা। এটা হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক এবং রহস্যময় উপায়ে বর্তমান অবস্থাকে বজায় রাখাবার চেষ্টা।

মানুষের সচেতন কর্মধারা এবং সামঞ্জস্যমূলক যৌক্তিক ধর্ম তীব্রভাবে আক্রান্ত এবং পদদলিত হচ্ছে; কারণ এইসব বুর্জোয়া শাসনের সমর্থকেরা সঠিক অনুভব করতে পেরেছে যে মানুষের সচেতন কর্মধারা এক্ষেত্রে যা শ্রমিকগণের শ্রেণীদ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয়; আত্মিক জগৎ বিশ্বাস, নিয়তি, ভাগ্য, অনুভূতির জগৎকে এক কথায় বুর্জোয়া জগৎকে, নিশ্চয় ধ্বংস করে দেবে। সুতরাং এঁরা বুর্জোয়াদের বিবর্ত জগৎকে বজায় রাখবার চেষ্টাই শুধু করে না আরও নব নব বিবর্ত মতবাদ ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টি করে বুর্জোয়া জগতের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করবার চেষ্টার কোন ত্রুটি করে না।

প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে সমাজের ঐতিহাসিক ও সামাজিক সম্পর্কের যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায় এবং সেই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঈঙ্গিত দেয়।

এই জন্যই অনুভূতি, নিয়তি, ভাগ্য, 'আত্মা' এবং বিশ্বাসের তমসাচ্ছন্ন মৌলিক ও স্বেচ্ছাচারী দেবতারা এই পরিবর্তনের পথে বাধা জন্মায়। ইতিহাসের বর্তমান যুগে এই পরিবর্তন হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা থেকে কমিউনিস্ট-সমাজে পরিবর্তন। স্পেঙ্গলারের 'ভাগ্য' আইনস্টাইনের 'নিগূঢ়তত্ত্ব' বার্গসর 'elan vital', রবীন্দ্রনাথের 'King of the Dark Canmber', তাঁর নিজস্ব ঈশ্বর ও গীতি পদ্যের মনুষ্যরূপী ঈশ্বর, অরবিন্দের ঊর্দ্ধ-চৈতন্য' (supra-consciousness), গান্ধীর 'অন্তরের আলো'—এ সমস্তই হচ্ছে ধর্ম ও ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক বিবর্তের কুয়াসাচ্ছন্ন আবরণ দিয়ে জগৎকে আবৃত রাখবার চেষ্টা।

বাহ্য-বিষয়তার দিক থেকে এঁদের চিন্তাধারা ব্যষ্টি সমূহের মধ্যে সচেতন এবং জ্ঞান সম্পন্ন সম্পর্ক স্থাপনের পথে বাধা জন্মাছে; সুতরাং বিবর্ত বুর্জোয়া জগৎ রক্ষণে সহায়ক হিসাবে এঁদের প্রতিক্রিয়াশীল বলে গণ্য করতে হবে।

উৎপাদন যন্ত্রে সামাজিক সম্পত্তি-প্রথার প্রবর্তন করে, শ্রেণী এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথা অবলুপ্ত করে, পরিকল্পিত উৎপাদন ও সামাজিক উৎপন্নের বন্টন প্রবর্তন করে এবং এই উপায়ে ধনতান্ত্রিক সমাজের এবং প্রত্যেক পণ্য-উৎপাদনশীল সমাজের উৎপাদন এবং বন্টনের সামাজিক সমন্বয়ের কৌশল নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে কম্যুনিজম শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিভাগগুলিকেও অবলুপ্ত করে দেবে।

চেতনার যুগ অর্থাৎ সচেতন সামাজিক কর্মধারার যুগ আসবে বিবর্তবাদ এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক রহস্যময় বুলি আওড়ানোর ধ্বংসের বাজনা বেজে উঠবে। কম্যুনিজম প্রয়োজনীয়তার কারাগার, প্রাকৃতিক জগতের কারাগার থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে স্বাধীনতার সচেতন জগতের পথে মানুষকে নিয়ে যাবে। এই স্বাধীনতার উপযোগী সংগ্রাম এবং দুঃখ কষ্ট থাকবে, কিন্তু সেগুলি হবে উচ্চতর স্তরের; আজকে মানুষ যে করুণ পাশবিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে তা আর থাকবে না। মার্ক্স বলেছেন, "কম্যুনিজমের আমলে মানুষ

পশুর মত দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে না, মানুষের মত দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে।"

বিবর্তবাদের ক্লেদময় এবং পৈশাচিক জগৎ থেকে সচেতন কর্মধারা ও সচেতন কষ্ট ভোগের জগৎ এই হচ্ছে কমিউনিজমের একটা মৌলিক তাৎপর্য।

পাদটীকা

১। ফ্রিডরিথ এঙ্গেলস ঃ লুভউইক ফয়েরবাখ (ইংরাজি সংস্করণ মস্কো, ১৯৪৬) পৃ.৫৭।

২। কার্ল মার্কস ঃ ক্যাপিটাল, ৩য় খন্ড (সরস্বতী প্রেস সংস্কর[ং].), পৃ, ৬৫২।

৩। ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস ঃ সোশ্যালিজম কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক (ইংরাজি সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৫), পৃ. ১১৪।

৪। ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস ঃ প্রাগুক্ত পৃ. ৫৬-৫৭।

৫। কার্ল মার্কস ঃ ক্যাপিটাল ১ম খন্ড (মস্কো) পৃ. ৭২।

৬। ঐ পৃ ৮০।

৭। ঐ পৃ ৭৯।

৮। ঐ পৃ ৭৯।

৯। ঐ পৃ ৮০।

কম্যুনিজম ও সাহিত্য

পাঁচিল দিয়ে ঘেরা উপরে ছাউনি করে এক টুকরো জমিতে কেউ যদি ফুলের চাষ করে তাহলে ফুল হয়তো ফোটাতে পারে কিন্তু সে ফুলের রঙ হবে ফ্যাকাশে, তাতে মাটির রসের অভাব ধরা পড়বে, সূর্য্যের অপ্রাচুর্য্য হেতু পান্ডুতার কলঙ্ক থাকবে। সেইজন্য গ্রীনহাউসের ফুল হচ্ছে অরকিড, পরগাছা যারা অন্য গাছের রস পান করে ফোটে। তার রঙের বাহার যথেষ্ট আছে বটে কিন্তু সে রঙ যেন একটু ফ্যাকাশে, তার মধ্যে সতেজ প্রাণের স্পন্দন নেই, সরসতা নেই। বনে যে ফুল ফোটে, সমস্ত মাটির কোলে বুকে যারা মানুষ, সমস্ত আকাশের আলো ও অন্ধকারে আলিঙ্গন যারা পায় তারা প্রাণের স্পন্দনে কাঁপতে থাকে, সুন্দর সহজ স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্যে।

সাহিত্য হচ্ছে জীবনের ফুল ও ফল এক সঙ্গে। তা'র মধ্যে ফুলের সৌরভ আছে আর ফলের রসপ্রাচুর্য আছে। সমস্ত জীবনের রঙ আর সমস্ত জীবনের রস বুকের মধ্যে তোলপাড় হতে থাকে। শেষে একদিন বুকের পাঁজর ভেঙ্গে বের হয়ে আসে ঝড়ের ঝাপটায়, ফুল যেমন করে বৃন্ত থেকে ছিন্ন হয়ে উড়ে যায় গাছের বাঁধন থেকে। সাহিত্যের জন্মদাতা হচ্ছে রক্তের মধ্যের ঝড় আর ঢেউ। বুর্জ্জুয়া জগতে আর্ট হচ্ছে পরগাছার ফুল। এই ফুল ফোটানোর মাটি টবের মধ্যে জড় করা হয়, তা'র মধ্যে জীবনের এক অংশের অন্যদের প্রাণ গুঁড়ো করা সার অপর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। সেইজন্যে এই মাটির পরে যে সব ফুল ফোটে তাতে ভোগের গন্ধ থাকে। সে সকল ফুলের গন্ধে শুধু লালসার তীব্রতাই আমরা পেতুম যদি না নীল আকাশের আলো এসে সেই পাপকে কিছুটা শোধন না করত। সেই ফুলের যেটুকু সৌন্দর্য্য আছে, গন্ধ আছে তার জন্যে দায়ী হচ্ছে আলো আর বাতাস যারা সমস্ত পৃথিবীর রস ও গন্ধ ফুলের মুখেতে বুলিয়ে দিয়ে যায়। জীবনের এই অংশের মাটিতে যারা সম্পূর্ণ দখল করে বসে আছে সেই উপরতলাার লোকেরা আর্ট ও সাহিত্যকে শুধু তা'দের জীবনের সীমানার মধ্যে বদ্ধ রাখতে চায়। শুধু তাই নয় তা'রা ডগমার সৃষ্টি করেছে তা'দের সুবিধের জন্যে, সেই অনুযায়ী আর্ট হচ্ছে শুধু ফুলের, হাসির, ভোগ বিলাসের সব; অন্ধকার, ব্যথা, কান্না নিয়ে আর্টের কোন কারবার নেই। কোন কোন ব্যথা ও চোখের জলের ছবি তা'রা আর্টের নিষিদ্ধ রাজত্বের মধ্যে প্রবেশ করতে দিতে রাজী আছে যা'র মধ্যে উপরতলার লোকের বিলাসের ব্যথা কিম্বা মায়াঁ কান্নার চোখের জল। তা'দের সীমার বাইরে যেখানে বিরাট ক্ষেত্র পড়ে আছে, যেখানে জীবনের আনন্দ হাসি প্রতিদিন চোখের জলে ধৌত হচ্ছে, সেই জীবনের সম্বন্ধে কোন

কথা বলা এই বুর্জ্জুয়াদের আর্ট ও সাহিত্যের নিষিদ্ধ বস্তু। খুব একটা গভীর আধ্যাত্মিকতার ভাণ করে বুর্জ্জুয়ারা বলে থাকে যে ব্যথা কিম্বা দুঃখের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নেই, কারণ ব্যথা আর দুঃখ হচ্ছে দুর্ব্বলতা, পাপ। সেই পাপের গুরুভারে মানুষের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলা অন্যায়। মানুষকে টানতে হবে আনন্দের দিকে, তা'কে আনন্দের আকর্ষণে সুস্থ করে তুলতে হবে। অতএব গাও কসে শুধু বকুল ফুলের গান, বসন্তের দিনের ফুরফুরে বাতাসের গান, আর যারা এ বকুল ফুল আর বসন্তের বাতাস অপর্য্যাপ্ত ভোগ করে করে অপদার্থ হয়ে পড়েছে তাদের জীবনের সম্বন্ধে মেয়েলি ছড়া বানাও, এবং তাদের পোকা-পড়া ঘুণে-ধরা প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ে "সাইকোলজি" চর্চ্চা করো। বুর্জ্জুয়াদের ডগমার পেয়াদা আর্ট আর সাহিত্যের কাণ ধরে বুকলগাছের চারপাশে ঘোরাচ্ছে আর তাদের কাণে মন্ত্র জপছে, "আর্ট আর সাহিত্য, তোরা হচ্ছিস উপরতলার জীব তোরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবি আর যখন আকাশ থেকে চোখ নাবাবি তখন বকুলগাছের দিকে তাকাবি। ডাইনে বাঁয়ের অন্ধকারের দিকে মরলেও তাকাবি না।" আর্ট ও সাহিত্য সেই কারণে এতদিন পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ বুর্জ্জুয়া শ্রেণীর নাগপাশ বাঁধনে বাঁধা রয়েছে। আমরা কম্যুনিস্টরা আর্ট ও সাহিত্যকে বকুল ফুলের ঘানির চারপাশে নিরন্তর ঘুরে মরার ক্লান্তি ও অসহায় পঙ্গুতা থেকে বাঁচাতে চাই। আমরা আর্ট ও সাহিত্যকে জীবনের অসীম বিস্তৃতির উপর মুক্তি দিয়ে তার ক্লীবত্ব থেকে উদ্ধার করতে চাই। আমরাও অন্ধকারের সঙ্গে মানুষের মনকে বেঁধে রাখতে চাই না। কিন্তু অন্ধকারের ভয় থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করতে গেলে তাকে সে অন্ধকার দেখাতে হবে। অন্ধকারের পাপে তার মনকে অভিভূত করবার জন্য নয়, অন্ধকারকে বোঝবার জন্যে, তাকে ধ্বংস করবার জন্যে অন্ধকার দেখাবার প্রয়োজন আছে। বুর্জ্জুয়ারা যে 'এসথেটিকের ঢঙ করে, আধ্যাত্মিকতার ভাণ করে জীবনের অন্ধকার অংশের দিকে একেবারেই নজর দিতে চায় না সেটা তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার অভিপ্রায়ে। বুর্জ্জুয়া শ্রেণী অন্ধকারকে ধ্বংস না করে বজায় রাখতে চায়, সেইজন্য তারা অন্ধকারকে পাশ কাটিয়ে চলে, অন্ধকারের বুকের উপর আলোর খড়্গ বিঁধিয়ে দিতে চায় না।

বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশীয় লেখকেরা আর্ট ও সাহিত্য সম্বন্ধে উপরি উক্ত ডগমার দোহাই দিয়ে সাহিত্যকে উপরতলার লোকদের সেবাদাসীতে পরিণত করেছিলেন। 'সিম্‌বলিজম্' আর 'রোমানটিসিজমের' একটানা যুগ চললো। সাহিত্য নির্জ্জীব হয়ে পড়ল অনবরত সিমবলিজম ও রোম্যানটিসিজমের আরকে ভিজে। টুর্গেনিভ হলেন সে যুগের অভিজাত সম্প্রদায়ের রাজা। তাঁর সৃষ্ট নরনারীরা সবাই হচ্ছে উপরতলার প্রাণী, তাঁর ভাষা হচ্ছে পালিশ করা গিল্টিকরা ভাষা। জারের আমলের 'ফিউডাল আরিসটোক্রাটির'র লেখক ছিলেন টুর্গেনিভ। ডসটয়েভস্কি দেখা দিলেন ঝড়ের রূপে কিন্তু দেখা গেল যে সেই ঝড় আগে থেকেই আপনার নিষ্ফলতা জেনে বসে আছে। সেই ঝড় পর্দ্দা উড়িয়ে দিয়ে আমাদের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল অন্ধকারের রাজ্যে যেখানে মানুষের লক্ষ লক্ষ বেদনা স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করছে। মনে হল সেই ঝড় বুঝিবা উপরতলার জগতের মিথ্যো হাসি, এই চুরিকরা আলোকে ধ্বংস করবে। কিন্তু ঝড় যে আগে থেকেই আপনার

পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে তাই সে বিরাটরূপে দেখা দিল বটে কিন্তু শেষে ফুলের সঙ্গে প্রেমাভিনয় সুরু করল। ডসটয়েভস্কি হচ্ছেন 'পেসিমিজমের' অবতার। তাঁর অবস্থা কাঁকড়াবিছের মত যে শরীরের মধ্যে বিষের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে হাতের কাছে কাউকে না পেয়ে নিজেকেই নিজে দংশন করে মারে। ডসটয়েভস্কি পর্দ্দা সরিয়ে আমাদের অন্ধকারের রাজ্য দেখালেন তারপরে আবার তার উপর পর্দ্দা টেনে দিয়ে বললেন, "অন্ধকার ওখানে চিরকালই থাকবে। ওকে মারবার উপায় নেই।" একটা ভয়ঙ্কর প্রবল পেসিমিজমের স্রোতে মানুষকে ডুবিয়ে দিয়ে ডসটয়েভস্কি চলে গেলেন। কাব্য জগতে লেরমন্‌টভ, পরবর্ত্তী যুগে ব্রুসভ প্রভৃতি কবি পেসিমিজমের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে না পেরে 'সিমবলিজমে'র শরণাপন্ন হয়ে পেসিমিজমকে ছন্দবদ্ধ কবিতায় প্রকাশ করলেন। বুর্জ্জুয়া ও বুর্জ্জুয়াপ্রভাবাপন্ন লেখকদের হাতে পড়ে সিমবলিজম শুধু একটা নৈরাশ্য ও দুর্ব্বলতার বস্তুতে পরিণত হল। সিমবলিজমের মধ্যে যে ধ্বংসের শক্তি আছে সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হোল। বিপ্লবের আগে পর্য্যন্ত এই সিমবলিজম রুশীয় সাহিত্যে একাধিপত্য করেছিল। বিপ্লব এল, নৈরাশ্য ও দুর্ব্বলতা ধ্বংস হয়ে গেল, অন্ধকার রাজ্যের পর্দ্দা ছিঁড়ে ফেলে বের হ'ল লক্ষ লক্ষ লোক যারা এতদিন পর্যন্ত অন্ধকারের থাবার মধ্যে আটকা ছিল। জীবন বদলাল, তাই সাহিত্যও বদলাল অন্ততঃপক্ষে সাহিত্যের কাঠামো বদলাবার চেষ্টা হতে লাগলো। সাহিত্য এখন আর শুধু বকুল ফুলের গান কিম্বা উপরতলার লোকদের জীবন নিয়ে কারবার নয় এখন সারা জীবনের সৃষ্টি সাহিত্যের মধ্যে দেখা দিতে শুরু করল। জীবনের কোন অংশকেই আর্ট ও সাহিত্য অস্বীকার করল না। জীবনের একটি বিশেষ অংশের আর্টের রাজ্যে প্রবেশাধিকার আছে অন্য অংশের নেই এই হাস্যকর ক্লীব মনোভাব থেকে সাহিত্য পরিত্রাণ পেল। কিন্তু সৃষ্টি করতে চাই বললেই তো সৃষ্টি করা যায় না, নতুন জীবনের অনুভূতি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না প্রাণের কুলের কানায় ভরে ওঠে ততক্ষণ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। আমি আগেই বলেছি যে আর্টের ও সাহিত্যের জন্মদাতা হচ্ছে ঝড় আর ঢেউ। নতুন জীবনের, নতুন অনুভূতির ঢেউ যেই বুক ছাপিয়ে যায়, বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ভেঙ্গে পড়ে তখনই আর্টের জন্ম হয়। কিন্তু অনুভূতির ঢেউ বাইরে গিয়ে ভেঙ্গে পড়লেই আর্টের সৃষ্টি হয় না। বাইরে গিয়ে ঢেউ যদি ছড়িয়ে যায়, তাহলে সে ঢেউ ব্যর্থ হয়ে যায়। শ্যাম্পেনের বোতল খুললে যে শ্যাম্পেন ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে সেটা তো কোন কাজে আসে না, বোতল থেকে যে শ্যাম্পেন পেয়ালায় ঢালা হয় সেই শ্যাম্পেনই আনন্দ দেয় ও সার্থক হয়। শুধু অনুভূতির আবেগই সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়, বাইরের যে রূপ সেই অনুভূতি গ্রহণ করবে, যে রূপের পাত্রে সেই অনুভূতি ঢালা হবে সেটাও সৃষ্টির পক্ষে তেমনি প্রয়োজনীয় কথা। নতুন সাহিত্য, নতুন আর্ট সৃষ্টি করবার প্রসঙ্গে আমাদের আর্ট ও সাহিত্য সংক্রান্ত বহু জটিল সমস্যার সমাধান করতে হবে। বর্ত্তমান কালে সোভিয়েট-রাষ্ট্রে সাহিত্য জগতে নানা দল দেখা গেছে। সাহিত্যিকরা তাঁদের শ্রেণীগত উৎপত্তি হিসাবে দলে বিভক্ত হয়েছে। শ্রবিক-সাহিত্যিক দল, কৃষক-সাহিত্যিক সঙ্ঘ, চরমপন্থী সাহিত্যিক, এই সাহিত্যিকেরা প্রায় সবাই কম্যুনিস্ট ইত্যাদি। আমার মতে শ্রেণীগত উৎপত্তি হিসেবে সাহিত্যিকদের দলে বিভক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা

যখন কোন ব্যক্তিকে বুর্জ্জুয়া সাহিত্যিক বলি তখন কি এটা অবশ্যম্ভাবী সত্য বলে ধরে নিতে হবেই যে সেই লেখক বুর্জ্জুয়া শ্রেণীভুক্ত? অনেক অ-বুর্জ্জুয়ারাও যে বুর্জ্জুয়া সাহিত্যিক হয়ে গজিয়ে ওঠে তার প্রমাণের অভাব নেই। আর্ট ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে বুর্জ্জুয়ার ডগমাকে স্বীকার করে সেই হচ্ছে বুর্জ্জুয়া সাহিত্যিক, শ্রেণীগত উৎপত্তি তা'র যাই হোক না কেন। চিন্তার ধারা হিসাবে মানুষকে দলে ভাগ করা দরকার শ্রেণীগত উৎপত্তি হিসাবে নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে বুর্জ্জুয়া 'আইডিওলজি'কে যে শুধু বুর্জ্জুয়া শ্রেণীই স্বীকার করে তা নয় বহু শ্রমিকও স্বীকার করে। কম্যুনিস্ট আইডিওলজির প্রভাবাপন্ন কৃষক সাহিত্যিকদের রূপ অন্য রকম। কথা উঠতে পারে যে যদি বুর্জ্জুয়া শ্রেণীর একটি বিশিষ্ট মতবাদ থাকে তাহলে অন্য শ্রেণীরই বা থাকবে না কেন? এর উত্তরে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে বুর্জ্জুয়া শ্রেণীর যে একটি বিশিষ্ট মতবাদ আছে তার কারণ হচ্ছে শ্রে ণীগত স্বার্থকে পুষ্ট করবার জন্যে। সেই কারণে তার একটি বিশিষ্ট আইডিওলজির প্রয়োজন আছে শাসন করবার জন্যে। অন্য অন্য শ্রেণীগুলি হয় সেই সামাজিক মতবাদের বিরুদ্ধে যাবে নয় তাকে সমর্থন করবে। সেই বুর্জ্জুয়া সামাজিক মতবাদের বিরুদ্ধে যেতে গেলে তাদের কম্যুনিজমকে স্বীকার করতেই হবে। শ্রমিক যখন বুর্জ্জুয়া মতবাদকে স্বীকার করে তখন সে ফ্যাসিষ্ট হয়, সোশ্যাল ডেমোক্রাট হয়, যখন সে তার প্রতিকূলাচরণ করে তখন কম্যুনিস্ট হয়। আসল কথা হচ্ছে যে প্রধানতঃ দুটি মতবাদ আছে, সেটি হচ্ছে বুর্জ্জুয়া মতবাদ আর কম্যুনিস্টমতবাদ। এই দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ থেকে দুইটি পরস্পর বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়েছে। সাহিত্য জগতেও শ্রমিক-সাহিত্যিক, কৃষক সাহিত্যিক বলে কিছু নেই। আছে বর্জ্জুয়া সাহিত্যিক অথবা কম্যুনিস্ট সাহিত্যিক। মস্কোতে আমি বিভিন্ন দলের সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি। তথাকথিত কৃষক ও শ্রমিকদলের সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তাঁরা আপনাদের শ্রেণীগত উৎপত্তি হিসাবে দলবদ্ধ হয়ে ধারণা করেছেন যে ফ্যাক্টরীর জীবনের সম্বন্ধে কিছু লিখলেই কিম্বা প্রলিটারিয়ান ডিকটেটরসিপ সম্বন্ধে গুটি কয়েক বুলি আওড়ালে সেটা শ্রমিক সাহিত্য হলো, শ্রমের কথা বললেই গ্রামের ছবি আঁকলেই সেটা কৃষক-সাহিত্যিকদের সাহিত্য হোল। ফলে নতুন আর্ট নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করবার কথা দূরে থাকুক, বুর্জ্জুয়া সাহিত্যের ধারেও এদের সাহিত্য পৌছতে পারে নি। সাহিত্য ক্ষেত্রে অগুনতি লেখকের আবির্ভাব হয়েছে যাঁদের ধারণা কৃষক ও শ্রমিকের কথা লিখলেই বুঝিবা নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি হোল। ফলে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির কথা তো দূরে থাকুক অনেক সময় আদবে কোন সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে কিনা সন্দেহ। লিডিন আধুনিক কালের একজন প্রতিভাশালী লেখক। তিনি আমাকে বল্লেন যে কিছুদিন থেকে লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন কারণ বর্ত্তমান কালে সাহিত্য যে কী রূপ নেবে সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। এখন সোভিয়েট রাশিয়ার লেখকদের মধ্যে যাঁরা চরমপন্থী নামে খ্যাত তাঁদের একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। লেখকের নাম ট্রিচিকফ। পূর্ব্বে তিনি কবিতা লিখতেন এখন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে নাটক, প্রবন্ধ ও বায়স্কোপের জন্য প্লট রচনা করে থাকেন। তাঁর লেকা "রিচি কিতাই" (চীনের আর্ত্তনাদ) তখন মস্কো

থিয়েটারে উচ্চ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছিল। আমাদের কথোপকথন শুরু হল। রাশিয়ার বর্ত্তমান সাহিত্য সম্বন্ধে আমার কি ধারণা ট্রিচিকফ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বল্লাম যে আমার মতে বর্ত্তমান সাহিত্য এখনো পর্য্যন্ত কোন বিশিষ্ট আকার পায় নি। প্রয়াসের লক্ষণ দেখা দিয়েছে বটে তবে সেই প্রয়াস বড্ড এক পেশে হয়ে চলেছে বলে আমার মনে হয়। সাহিত্যকে শুধু দৈনন্দিন ঘটনার তালিকা করে তোলবার জন্যে একদল লেখক উঠে পড়ে লেগেছেন বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু সাহিত্য তো ঘটনার তালিকা নয়, সাহিত্য হচ্ছে সেই ফুল যাকে ঘটনার সুতো দিয়ে গাঁথা হয়। কেউ কি মনে করে যে মালার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সুতো, ফুল নয়! ট্রিচিকফ বললেন বর্ত্তমান সোভিয়েট সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যে এই ধারণায় পৌঁচেছি তাতে তিনি খুব আনন্দ লাভ করেছেন। কারণ তাঁর মতে বর্ত্তমান রুশীয় সাহিত্যের এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কিছুই হতে পারে না। প্রয়োজন সাধনই সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি সাহিত্যের লক্ষ্য নয়। তাঁর মতে constructivism যেখানে শেষ হয় aesthetism সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সেখান থেকে শুরু হয়। নতুন মানব সমাজ গড়ে তোলবার যে প্রয়াস চলেছে সেই প্রয়াসের পক্ষে সম্পূর্ণ হানিকর হচ্ছে এসথেটিজম্। তাঁর মতে দৈনিক কাগজ 'প্রাভদা'ই সমসাময়িক রাশিয়ার সব চেয়ে বড় সাহিত্য। আমি উত্তরে বল্লেম যে আমি প্রাভদার উপকারিতা বিন্দুমাত্র লঘু করতে চাই না। গ্রামে ও শহরে, শ্রমিকদের মধ্যে ও চাষীদের মধ্যে সোশালিষ্ট সমাজ গড়ে তোলবার যে বিরাট উপকরণ দরকার সেই উপকরণ সংগ্রহে 'প্রাভদা' যে কাজ করছে তা অবর্ণনীয় কিন্তু রাজনৈতিক সাহিত্যই তো একমাত্র সাহিত্য নয়, সাহিত্য শুধু এই সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকবে কি করে? বাস্তব ঘটনা যে সাহিত্যের অন্যতম মশলা সে কথা আমি একেবারেই অস্বীকার করি না কিন্তু আলু সেও যেমন বাস্তব, আলুর আগে ফুল ফোটে সেও তেমনি বাস্তব দৃষ্টান্ত। শুধু আলুর ক্ষেতকে বাস্তব বলে ধরে নেব আর ফুলকে বাস্তব বলে স্বীকার করব না এ কি রকম যুক্তি! আমার অভিযোগ হচ্ছে বর্ত্তমান রুশীয় সাহিত্যের কেবলমাত্র প্রয়োজনীয়তার ধারার বিরুদ্ধে। আমিও সৌখিন সাহিত্যের বিপক্ষে, কেননা আমার মতে এসথেটিজম্ হচ্ছে মরা সাহিত্যের লক্ষণ, শবের মুখে পাউডার ঘসে, ঠোঁটে গালে রঙ দিয়ে তাকে সুন্দর করতে চেষ্টা করলে যে ভয়ানক বিসদৃশ বীভৎস রসের অবতারণা ঘটে সেই রকমই বিভৎস ব্যাপার ঘটে যখন মরা প্রবৃত্তিকে, মরণশীল মনোভাবকে নিয়ে তাকে এসথেটিজমের দোহাই দিয়ে আমরা সাজিয়ে গুজিয়ে সকলের সামনে ধরি। সবল প্রাণবান মনোভাবকে সাজিয়ে তুলতে হয় না তারা আপনার প্রকাশের দ্বারাই আপনার সৌন্দর্য্যের পরিচয় দেয়। সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে আমার এস্থলে কোন মত বিরোধ নেই। আমার অভিযোগ বর্ত্তমান রুশীয় সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই যে, সেখানে শুধু আলুর চাষের খবরই আছে, ফুলের খবর একেবারে নেই। আমি সৌন্দর্য্য ও প্রয়োজনের মধ্যে কোনই বিরোধ দেখি না। ট্রিচিকফ বললেন যে প্রয়োজনের বাইরে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাকে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল এমন কি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বলে মনে করেন। একটু বিদ্রুপের হাসি হেসে তিনি বল্লেন যে, এ ক্ষেত্রে আমার মত আর ল্যুনাচারস্কির মত পুরোপুরি মেলে। ল্যুনাচারস্কি বলেন জাহাজ তৈরীর জন্যে শুধু

যে ইঞ্জিনীয়ার চাই তা নয়, আর্টিষ্টও চাই। ইঞ্জিনিয়ার যখন কাঠামোটা তৈরী করবে, তখন সেই কাঠামোটাকে সুন্দর করে তুলবে আর্টিষ্ট। এই উপায়ে প্রয়োজনের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের অবিচ্ছিন্ন মিতালি পাতানো হবে। ট্রিচিকফ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে, কেননা তাঁর মধ্যে এই সুন্দর করে তোলবার প্রয়াসের ফলে গঠনকার্য্যের (constructivism) ক্ষতি হয়। আমি বললেম যে ট্রিচিকফ খুব ঠিকই বলেছেন, এ বিষয়ে ল্যুনাচারস্কির মতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। সৌন্দর্য্যকে আমি গঠনের অন্যতম অঙ্গ বলে মনে করি। গঠনের মধ্যে যেখানে সৌন্দর্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়, সেখানে গঠনের আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যায় বলে আমার বিশ্বাস। এসথেটিজমকে অস্বীকার করলেও সৌন্দর্য্যকে গঠন প্রণালীর বহির্ভূত বলে মানতে আমি কিছুতেই রাজী নই। এই কথোপকথনের পর আমি বিদায় নিলেম। ট্রিচিকফ যত জোরের সঙ্গেই সাহিত্যকে কেবল প্রয়োজন সাধনের বস্তু করে তুলতে প্রয়াস পান, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি নিজেই সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না, কারণ তিনি যে সত্যি একজন আর্টিষ্ট, সেটা তাঁর সঙ্গে কথা কইলেই বোঝা যায়। কবিতাকে তিনি আফিমের সঙ্গে তুলনা করলেও সেই আফিমের কদর যে তিনি বোঝেন সেটা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। রঙের উপর তাঁর যে আন্তরিক টান আছে, সেটা ঘরের দেয়ালে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন মেরে অস্বীকার করতে চাইলেও সহজেই ধরা পড়ে। পলিটিক্যাল সাহিত্যের দরকার আছে, বিশেষ করে কম্যুনিস্টসাহিত্য বলার তো কোন হেতু দেখছি না। বুর্জ্জুয়া সাহিত্যিকরাও পলিটিক্যাল ঘটনা নিয়ে সাহিত্য রচনা করে। সে সাহিত্য কি তখন কম্যুনিস্ট সাহিত্য হয়ে ওঠে? পলিটিক্যাল ঘটনাকে আমাদের মতবাদ অনুযায়ী সাহিত্যের উপাদান করে গড়ে তুললেই কি তা'কে কমুনিস্ট সাহিত্য বলা যেতে পারে? কমুনিস্ট সাহিত্য হচ্ছে বিপ্লবমূলক সাহিত্য পলিটিকাল সাহিত্য নয়। বিপ্লবমূলক সাহিত্য বলতে বোঝায় সেই সাহিত্য যা মানুষের ব্যথাকে আগুন করে জ্বালায়, মাটিকে পুড়িয়ে সমাজের নতুন পেয়ালা তৈরী করে জীবনের সুরা ঢালবার জন্যে, অন্ধকারের পেসিমিজমের মধ্যে মনকে ডুবিয়ে রাখে না, আর শুধু মেরুদন্ডহীন হা হুতাশ নয়। বিপ্লবমূলক সাহিত্য ভবিষ্যতের যে অস্পষ্ট রেখা প্রত্যেক মানুষের বুকের মধ্যে আছে সেই অস্পষ্ট রেখাকে সুস্পষ্ট করে দেয় রেখার উপর আগুন বুলিয়ে। বিপ্লবমূলক সাহিত্য মানুষের অফুরন্ত মৃত্যুহীন সৃষ্টি; নিত্য প্রদীপ্ত সৃজনের ও সেই রূপের সুস্পষ্ট ধারণার ছবি। ঘাটে নোঙর করা যে নৌকা থাকে সে নৌকা দেখে আমরা যতই মুগ্ধ হই না কেন; কিন্তু যে নৌকা আমাদের ওপারে পৌঁছে দেয় সে নৌকা যে নোঙরের বাঁধন কাটিয়াছে সেটা ভুললে চলবে না। ডিমের খোলার মধ্যেই যদি পাখী আপনাকে আটকে রাখত, তাহলে আকাশে ওড়বার আনন্দ তার দুষ্প্রাপ্য হোত। পুরাণো সমাজের খোলার মায়ায় যে সাহিত্যিক শাবকেরা আপনাদের চলার আনন্দ বিসর্জ্জন করেছেন, তারা সেই খোলা ঠুকরে ঠুকরে সাহিত্যের যে উপাদান জোগাড় করেন, সেই উপাদান হবে শাবকদের জন্যে; ডানার জোরে যারা দূর আকাশে উড়তে পারে তাঁদের জন্যে নয়। বিপ্লবমূলক সাহিত্য তাই পুরানো সমাজের খোলা ঠুকরনো সাহিত্য নয়, আবরণকে ভেদ করে বেরিয়ে যে পাখী কোন দিকে উড়বে তার ঠিকানা করতে পারছে না, তারিই পথ নির্দ্দেশের সাহিত্য। এক

কথায় বলতে গেলে বিপ্লবমূলক সাহিত্য হচ্ছে অতি প্রবলরূপে (positive) অস্তিবাচক। নেতিমূলক কিম্বা সংস্কারমূলক (সংস্কারমূলক সাহিত্যও নেতিমূলক সাহিত্যেরই একটি অভিব্যক্তি) সাহিত্য নয়। সে সাহিত্য পথ তো দেখায়ই না, বরঞ্চ উল্টেপথ ঢেকে দেয়। পেসিমিজমের ধুলি-আবরণ দিয়ে কিম্বা অতীতের প্রতি একটা সেন্টিমেন্টাল রোম্যানটিসিজমের কুয়াশা দিয়ে। জীবনে বিপ্লবমূলক চিন্তার প্রয়োজনীয়তা সব সময়েই থাকবে, কিন্তু বর্ত্তমান এই যুগসন্ধিক্ষণে বিপ্লবমূলক চিন্তার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। কম্যুনিস্ট সাহিত্য তাই বিপ্লবমূলক সাহিত্য। সেই বিপ্লবমূলক সাহিত্যের মধ্যে পলিটিক্যাল জীবনের নিশ্চয়ই স্থান আছে, কিন্তু পলিটিক্যাল জীবনের ছবি তার সমস্ত জুড়ে নেই! বিপ্লবমূলক সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতা রাজনৈতিক সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতার চেয়ে অনেক বেশী। রাজনৈতিক সাহিত্য জীবনের একটি অংশের ছবি, বিপ্লবী সাহিত্য সমগ্র জীবনে ব্যাপ্ত। পলিটিক্যাল সাহিত্যের কাজ একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা, বিপ্লপ-মূলক সাহিত্যের কাজ সমস্ত জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এখন সোভিয়েট রাশিয়ায় যে সাহিত্য তৈরী হচ্ছে তার অধিকাংশই পলিটিক্যাল সাহিত্য, বিপ্লব মুলক সাহিত্য নয়। ট্রিচিকফ যে সাহিত্য সম্বন্ধে এত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, সেই সাহিত্য হল রাজনৈতিক সাহিত্য, আদবেই বিপ্লব-মূলকসাহিত্য নয়। আমার আপত্তি হচ্ছে এইখানে। বুর্জ্জুয়ারা সাহিত্যকে একপেশে করে রেখেছে তাকে জীবনের এক অংশের মধ্যে কয়েদ করে রেখে; আমরা সাহিত্যকে সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি দিচ্ছি না তাকে শুধু রাজনৈতিক সাহিত্য করে। এটা হয়তো মনে হতে পারে যে সাহত্যিকে এক পেশে করে আমরা তা'কে জোরালো করে তুলছি কন্তু সেটা অত্যন্ত ভুল। শরীর ও মন দুটোই স্বাস্থ্যের প্রধান লক্ষণ, এক অংশ অন্য অংশের সঙ্গে শক্তির সমতার ঐক্যতে বাঁধা। যেই সেই ঐক্যের ক্ষুণ্ণতা ঘটে আমনি রোগের সৃষ্টি হয়। কেউ যদি বলেন যে সে শুধু একটা দাঁত ব্যবহার করবে চিবোবার জন্যে অন্য দাঁতগুলোকে বেকার অবস্থায় রেখে, তাহ'লে চিবনোর কাজ তো ভালো করে সম্পন্ন হয়ই না, বরঞ্চ যে দাঁতটিকে অন্য দাঁতগুলো থেকে এই স্বতন্ত্রতার সম্মান দেওয়া হ'ল তাঁকে যথাসম্ভব শীঘ্রি অপটু করে তোলা হয়। বিপ্লবী সাহিত্য সমস্ত জীবনকে একই শক্তির সমতায় বাঁধে আর সেই শক্তির ঐক্য থেকে যে সৃষ্টি মূর্ত্তি গ্রহণ করে তা'তে শক্তির পরিচয় আছে কিন্তু অনর্থক কোন স্থান বিশেষের স্ফীতির দ্বারা অর্থহীন বাহুল্যের পরিচয় নেই! স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোন বিশেষ প্রত্যঙ্গের মাংসপেশী বাড়ানোর যে পার্থক্য আছে, একপেশে সাহিত্যের সঙ্গে বিপ্লব-মূলক সাহিত্যের সেই প্রভেদ। সোভিয়েট রাশিয়ার যিনি অফিসিয়াল 'কবি' সেই খ্যাতনামা ডিমিয়ান বিয়েদনি এই পলিটিক্যাল সাহিত্যের চরম দৃষ্টান্ত। তা'র লিখিত কবিতা প্রায়ই 'প্রাভদা'র শোভা বর্দ্ধন করে এবং শুনতে পাই নাকি জনসাধারণেরও আনন্দ বর্দ্ধন করে থাকে। ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকরা কার্য্যে অবহেলা করেছে, লেকার্ণো প্যাক্টে ক হোল, ইত্যাদি সংবাদ জড় করে ইন কবিতা লেখেন। ঘটনার একটা তালকা দিয়ে তার তলায় দু'চারটে কটুক্তি বসিয়ে দিলেই এই 'কবির' কবিতা রচনা সম্পন্ন হয়। জীবনের সমস্ত ঘটনার বিষয়েই মানুষ কবিতা লিখিতে পারে কারণ জীবনে এমন কোন অংশ থাকতে 'পারে না যার সম্বন্ধে মানুষ অনুভব করতে

অক্ষম। কবিতা হ'ল অনুভূতির সৃষ্টি। বুর্জ্জুয়া জগতে কবিরা অনুভূতিকে প্রাসাদের চুড়ার উপর রেখে দিয়েছেন, তাঁদের অনুভূতি এমন ঠুন্‌কো সে তাকে জীবনের সমস্ত পথের পরিচয় দিতে তাঁরা ভয় পান। কম্যুনিস্টদের সে ভয় নেই, কম্যুনিস্টরা অনুভূতি দিয়ে জীবনের সব কিছুকে স্পর্শ করে। এই কারণে জীবনের যে অংশটা পলিটিক্যাল সেই অংশ সম্বন্ধেও কবিতা লেখা যেতে পারে, কেন না তা'কে অনভূতি দিয়ে স্পর্শ করা যায়। কিন্তু যখন আমরা অনুভূতির রসের মধ্যে ঘটনাকে ডুবিয়ে সিক্ত করে তাকে রূপ দিই না, যখন আমরা ঘটনার ফর্দ্দ দিয়ে কবিতা রচনা করি তখন সেই সৃষ্টি কোন মতেই কবিতা হতে পারে না সেটা নিছক প্রবন্ধ। ডিমিয়ান বিয়েদনি হচ্ছেন প্রবন্ধ লেখক, যে প্রবন্ধকে তিনি এবং তাঁর ভক্তেরা 'কবিতা' বলে থাকেন। সুখের বিষয় পৃথিবীর অন্য দেশেও যা ঘটে থাকে এদেশেও তাই ঘটেছে, অর্থাৎ কিনা অফিসিয়াল কবি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিকৃষ্ট কবি। ইংলন্ডের পোয়েট লরিয়েটের তালিকায় একবার চোখ বুলালে অফিসিয়াল কবিদের নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকবে না। ব্লক, ইসেনিন, মায়কভস্কির দেশে ডিমিয়ান বিয়েদনির ঘটনার তালিকা যে কবিতা বলে চলতে পারে তা মনে করলেও আশ্চর্য্য হতে হয়। এই প্রসঙ্গে লিরিক কবিতাকে কম্যুনিস্টরা কি চোখে দেখেন সেটা আলোচনা করে দেখা যাক। সরকারী মতে 'লিরিক' কবিতা হচ্ছে বুর্জ্জুয়া সাহিত্যের অঙ্গ, কম্যুনিস্ট সাহিত্যে লিরিকের স্থান নেই কারণ লিরিক হচ্ছে 'সাবজেকটিভ' অতএব ব্যক্তিগত। সাবজেকটিভিটির সঙ্গে ইনডিভিডুয়ালিষ্টিকের যে অবশ্যম্ভাবী যোগাযোগ অনেক কম্যুনিস্টরা করে থাকেন, সেটা আমার কাছে আদবেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। প্রত্যেক অনুভূতিই হচ্ছে সাবজেকটিভ, আপনার বুক দিয়েই মানুষ অনুভব করে অন্যের বুক দিয়ে মানুষ অনুভব করে না। অনুভূতির বস্তু ফুল হোক কিম্বা বিপ্লব হোক, আলো হোক, কিম্বা অন্ধকার হোক, যা কিছু ব্যক্তি অনুভব করে সেটা হচ্ছে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু ব্যক্তি আপনার ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে বস্তুকে কিম্বা বিশেষ আবেগকে অনুভব করে বলেই যে সেই অনুভূতি ব্যক্তিগত হবেই, এর কোন কারণ দেখি না। যদি কেবল ঘটনার তালিকা দিয়ে কেউ একটা কবিতা লেখে 'বিপ্লবের পরে', তাহলে সেই 'কবিতা' জারনালিসম হতে পারে, কিন্তু যখন সেই একই বিপ্লবের ঘটনাকে ব্যক্তি আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে দিয়ে ডুবিয়ে নিয়ে আসে, তখনই ঘটনারাশি তরল আগুরেন মধ্যে দিয়ে জ্বলে উঠে একটা রূপ নেয়, কবিতার সৃষ্টি হয়। জীবনের প্রতি লিরিকাল এ্যাটিটুডের সঙ্গে সঙ্গে collectivism এর যে অবশ্যম্ভাবী বিরোধ থাকতেই হবে, তার কোন হেতু আমি দেখি না। মানুষ যেখানে স্রষ্টা সেখানে সে একক হলেও কলেকটিভ, ব্যক্তি যেটা অতি গভীর ভাবে অনুভব করে সেটা নিশ্চয়ই কালেকটিভও অনুভব করে, যদিও সমষ্টির সেই অনুভূতি সব সময়েই খুব তীব্র নয় কিম্বা সচেতন নয়। অন্ততঃ পক্ষে এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ব্যক্তি যখন নিজের সম্বন্ধে খাঁটি হয় তখন সে অন্যের সম্বন্ধেও খাঁটি। ব্যক্তির অনুভূতির কোন বিরোধ নেই যেখানে ব্যক্তি আপনার সম্বন্ধে খাঁটি। লক্ষ আঙ্গুর পেষণ করে যে সুরা তৈরী হয় সেই সুরা ঢালা হয় নীল পেয়ালায়, লাল পেয়ালায়। বাইরে থেকে দেখলে মদের রঙ দেখায় নীল, লাল, নানা বর্ণের কিন্তু মদের স্বাদ কি তাই বলে

বদলায়? নীল পেয়ালার আর লাল পেয়ালার মদের স্বাদে কি সেই একই লক্ষ আঙ্গুরের স্বাদ পাওয়া যায় না? ব্যক্তিত্ব হচ্ছে এই নানা রঙের পেয়ালাগুলির মত। এই পেয়ালাগুলিতে ঢালা সমষ্টির রস সুরা। সেই সুরা থেকে থেকে নানা রঙের দেখায় বটে কিন্তু সত্যি করে দেখতে গেলে লাল পেয়ালার আর নীল পেয়ালার সুরার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কবিতা যতদিন কবিতা থাকবে, কবিতা যতদিন না ডিমিয়ান বিয়েদনির 'কবিতা' হয়ে উঠবে, ততদিন ব্যক্তিত্বের রঙে রঞ্জিত হয়ে সমষ্টির প্রাণে কবিতায় বিকশিত হবে। তা'তে সমষ্টির প্রাণের বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণতা ঘটিবে না। ভবিষ্যতে কম্যুনিস্ট সমাজে কি গীতি-কাব্য থাকবে না? তখন কি সব কবিতাই ডিমিয়াম বিয়েদনির কবিতার মত 'জারনালিজম' হয়ে উঠবে, 'কবিতা' কি তখন ডিমিয়াম বিয়েদনির 'কবিতা'র অনুসরণ করে গাইবে "ট্রাকটর চালাও, এবছর ফসল কম হয়েছে, আসছে বছরে ফসল বেশী করতে হবে, বূর্জ্জুয়াদের মারতে হবে?" যারা এই রকম কবিতায় কালেকটিভের গন্ধ পায় কিংবা এই রকম কবিতা'কে কম্যুনিস্ট কবিতার আদর্শ বলে মনে করে, তা'রা কবিতার সম্বন্ধে আলোচনা না করলেই সব দিক থেকে ভালো। ভবিষ্যৎ কম্যুনিস্ট সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি যখন তা'র ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে বিকশিত করবার সুযোগ পাবে তখন লিরিক কবিতার যুগ সত্যি করে শুরু হবে, তখন বিভিন্ন রূপের মধ্যে দিয়ে একই রসের প্রকাশ সমষ্টিকে পুষ্ট করবে ঐক্যের চেতনায়। বর্ত্তমানকালে সত্যিকার গীতি-কাব্যের যে দুর্ভিক্ষ ঘটেছে, যে দৈন্য দেখা দিয়েছে, সেই দৈন্য ঘুচবে ভবিষ্যতের কম্যুনিস্ট সমাজে যখন ব্যক্তির ও কালেকটিভের মধ্যে যে অস্বাভাবিক দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান কালে দেখা যায় সেই দ্বন্দ্ব লুপ্ত হবে। এই অস্বাভাবিক দ্বন্দ্ব এখন রয়েছে বলেই গীতি-কাব্যের এত অভাব ঘটেছে। এই দ্বন্দ্বের অবসানে সাহিত্যে যথার্থভাবে গীতিকাব্যের যুগ শুরু হবে,। ভবিষ্যৎ কম্যুনিস্ট সাহিত্যে গীতি কবিতা সেই কারণে নিঃসন্দেহে সর্ব্বপ্রধান স্থান গ্রহণ করবে। গীতি-কাব্যের বিরুদ্ধে আর একটা যুক্তি হচ্ছে যে লিরিকের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের ও স্থানের ছোঁয়াচ নেই। লিরিক হচ্ছে সেই কারণে জীবনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে সেই দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। আমার মনে হয় যে লিরিকের বিরুদ্ধে এই যুক্তি আংশিকভাবে সত্যি হলেও এ যুক্তি সম্পূর্ণ সত্য নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে আর্ট ও সাহিত্যকে আমরা অনন্তের প্রতিবিম্ব করে তুলতে চেষ্টা করবার নাম করে জীবনের মধ্যে যে সব দ্বন্দ্ব রয়েছে, তা'কে আর্ট ও সাহিত্যের আসরে থেকে সরিয়ে এক ঘরে করে রাখি। আর্ট ও সাহিত্যকে অনন্তের প্রতিবিম্ব করে তোলার মানে এই নয় যে একটা বিশিষ্ট সময়ে জীবনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে তাকে অস্বীকার করা। একটা বিশিষ্ট সময়ে জীবনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব জেগেছে সেই দ্বন্দ্বের সমস্ত গভীরতাকে ফুটিয়ে তোলা হ'ল আর্ট ও সাহিত্যের কাজ। দ্বন্দ্বের কিম্বা যে কোন ঘটনার গভীরতাকে ফুটিয়ে তুলতে গেলেই সেই ঘটনাকে এমন একটা রূপ দিতে হবে, যা'তে সেই রূপের মধ্যে দিয়ে একটি বিশিষ্ট সময়ের সঙ্গে ঘটনা চিরকালের মত মানুষের মনকে নাড়া দেয়। যে অনুভূতি ব্যক্তিগত, তাকে যেমন ইমপারসনাল রূপ না দিলে সত্য আর্টের সৃষ্টি হয় না, তেমনি যেটা বিশিষ্ট খণ্ড সময়ের তাকে যদি না অখণ্ড সময়ের মধ্যে বিস্তার করে দিতে পারে, তা'হ'লে সাহিত্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। জীবনের সম্বন্ধে লিরিকাল এটিটুড হচ্ছে যে, প্রত্যেক ঘটনার ঢেউয়ের উপরের ফেনা সরিয়ে ঢেউ যেখান থেকে জাগছে সেইখানে

পৌঁছে সেই গভীরতা থেকে রূপের সৃষ্টি করা। সেই গভীরতা থেকে রূপ সৃষ্টি করা মানে এই নয় যে সাময়িক ঘটনাকে অস্বীকার করা বরঞ্চ তার বিপরীত। তার উদ্দেশ্য সাময়িক ঘটনাকে মানুষের বুকের আরো গভীর করে থিতিয়ে দেওয়া। কবি খণ্ড সময়ের সঙ্গে অনন্তের মালা বদল করে দেয়। লিরিকের সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার আছে কিন্তু বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবার ভয় আছে, আর পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি হবার আশঙ্কাও আছে। এস্থলে আমি শুধু এই কথাটুকু পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, লিরিককে অনেক কম্যুনিস্টরা যে আতঙ্কের চোখে দেখেন, সেই আতঙ্কেরই তো কারণ নেইই বরঞ্চ উল্টে কম্যুনিস্টদের লিরিককে সাদরে বরণ করে নেওয়া উচিত। কেন না কম্যুনিস্টরা জীবনের সমস্ত সমস্যাকে সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করে দেখেন, সমস্যার সীমান্ত অবধি তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন, যে প্রয়াস হ'ল জীবনের সম্বন্ধে লিরিকাল এটিটুডের ফল। কম্যুনিস্ট সাহিত্য কি রূপ নেবে, বুর্জ্জুয়া সাহিত্যের সঙ্গে তার রূপের কোথায় পার্থক্য ঘটবে সেই নিয়ে অনেক বাদ-বিতণ্ডা চলছে। রূপের সঙ্গে, যা'কে রূপ দিতে চাচ্ছি তার যেমন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে তেমনি অবশ্যম্ভাবী যোগ আছে আমাদের মনের কি ধারণা নিয়ে আমরা সেই বস্তুটিকে দেখি তার সঙ্গে। এই মানসিক এটিটুড রূপ নিয়ে করবার পক্ষে প্রধান সহায়। এমন যে একটা মামুলি কথা ভালবাসা, সেই ভালবাসাকে নিয়েও মানুষ যে সাহিত্যে নানা রূপ দিতে পেরেছে তার কারণ হচ্ছে যে এই ভালবাসাকে মানুষ বিভিন্ন মানসিক এটিটুড নিয়ে দেখেছে। বুর্জ্জুয়ারা এক মানসিক এটিটুড নিয়ে সম্পত্তিবে দেখে থাকে আর আমরা কম্যুনিস্টরা আর এক মানসিক এটিচুড নিয়ে সম্পত্তিকে দেখে থাকি; সেই কারণে বুর্জ্জুয়া সাহিত্যে সম্পত্তি যে রূপ পায় তার সঙ্গে আমাদের কম্যুনিস্ট সাহিত্যে সম্পত্তির যে রূপ আমরা দেখি তার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। আর্ট ও সাহিত্যকে কেতাদুস্তর (Formalistic) সমস্যা বলে গণ্য করা হ'ল পুরোপুরি বুর্জ্জুয়া ধারণা। সাহিত্য যদি শুধু গাছ, পাতা, ফুলের সাহিত্য হোত তাহলে হয়তো সাহিত্যকে নিছক কেতাদুস্তর সমস্যা বলে গণ্য করা যেতে পারতো কেনা ফুলকে কেউ হয় তো পরীদের ডানা বলতে পারতো, আর একজন হয় তো ফুলকে রাতের শিশির জমানো একটা কিছুর রূপ দিতে পারতো। এতে কোন আপত্তি থাকতো না কিন্তু সাহিত্য তো শুধু ফুলের খবরই দেয় না, সাহিত্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধেব ছবি থাকে, সাহিত্য মানুষের কামনা ও মানুষের ব্যথা মিশিয়ে ভবিষ্যতের রেখা আঁকে। বর্ত্তমানের এবং সুদূর ভবিষ্যতকে মানুষ যে রূপে দেখে মানুষ সেই রূপে তাকে আঁকে। রূপের সঙ্গে তাই মানসিক এটিটুডের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। যে বস্তুটিকে রূপ দিতে চাই সে বস্তুটির সঙ্গে তার বাহিরের রূপের যোগ আছে বৈকি, যেমন কান্নাকে তো আর হাসির রূপ দেওয়া যায় না, ফুলকে তো আর হাতীর রূপ দেওয়া চলে না কিন্তু এই কান্নাকে বিভিন্ন মানসিক এটিটুডের ফলে বিভিন্ন রূপ দেওয়া চলে। কান্নাকে প্রণয়ীর কান্না, অভিমানের কান্নার রূপ দেওয়া যেতে পারে, কান্নাকে মানুষের বুকের অশ্রুবিহীন কান্নার রূপ দেওয়া যেতে পারে, তাকে অগ্নি শিখার রূপ দেওয়া যেতে পারে। এই বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি কান্না সম্বন্ধে আমাদের মানসিক এটিটুড কি তা'র উপরে নির্ভর করে। এই কারণে যা'রা সাহিত্যকে, আর্টকে শুধু ফর্মালিষ্টিক সমস্যা বলে মনে করে তারা ফাঁকি দিতে চায়, কেননা এই মানসিক অবস্থার সঙ্গে রূপের যে সুদৃঢ় সংলগ্নতা আছে, সেটাকে অস্বীকার করে

অধিকাংশ স্থলে সাহিত্য ও আর্টের যে শ্রেণীগত ভিত্তি আছে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এ মানসিক দৃষ্টি সব ক্ষেত্রেই শ্রেণীগত উৎপত্তি: মানসিক দৃষ্টি যে সব সময়েই তা'র শ্রেণীগত উৎপত্তি সম্পন্ধে সচেতন তা নয়, বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে বেশীর ভাগ স্থলেই সে সচেতন নয়, অধিকাংশ স্থলেই মনের দেখা অচেতন সত্ত্বার রঙে রঞ্জিত হয়ে আসে। শ্রেণীর বেড়া দেওয়া মানুষের মনের একটুকরো জমি থেকে প্রায় বেশীর ভাগ মানসিক দৃষ্টির উৎপত্তি। তবুও এটা মানতেই হবে যে সব সৃষ্টিই যে বেড়া দেওয়া মনের একটুকরো জমি থেকে জন্মায় কিংবা জন্মাবে তার কোন মানে নেই। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি মানুষের যে মনোভাব তার মধ্যে শ্রেণী খুঁজতে গেলে একটু হাস্যকর রকমের বাড়াবাড়ি করা হবে। চাঁদ দেখে যখন কবির মন দুলে ওঠে, আর সেই দোলা থেকে যখন কবিতা সৃষ্টি হয় তখন সেই কবিতাকে টিপে টিপে কেউ যদি শ্রেণীর রূপ বের করতে যায়, তাহলে বাড়াবাড়িটা শুধু যে হাস্যকর বলে মনে হয় তা নয়, অসহ্য হয়ে ওঠে। সঙ্গীতেরও শ্রেণীগত উৎপত্তি থাকতে পারে, বড়লোকদের স্তব করে যে বহু সঙ্গীত লেখা হয়েছে ও হচ্ছে অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু তাই বলে লাভ কি অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি করে। এই শিশু সুলভ যুক্তি দিয়ে কি লাভ যে সব সঙ্গীতেই এই শ্রেণীগত মনের ছাপ আছে? বুখারিন তাঁর Historical Materialism-এ যদিও সঙ্গীতেও শ্রেণীর গত মনের ছাপ আছে তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে চেষ্টাটা যে সার্থক হয়েছে তা বলতে পারি নে। সাহিত্যের এই রূপ-প্রসঙ্গ আলোচনা করবার কালে একটি বিশেষ রূপের কথা আলোচনা করা দরকার। সাহিত্যের এই বিশিষ্ট রূপের নাম ভবিষ্যতবাদ (Futurism)। ক্যাপিটালিষ্ট ছন্দ নয়, এ ছন্দ মত্ততাক্রান্ত। বনবন শন্‌শন্‌ করে জীবনের চাকা ঘুরতে শুরু হয়েছে। সবাই দৌড়াচ্ছে। আহার, চিন্তা, ভালবাসা, সমস্তই এই দৌড়নের পথে মানুষ সারছে। আগেকার ফিউডাল সামাজিক জীবনের আলস্য মন্থর মন্দ মধুর গতি থেকে গিয়েছে, তার জায়গা দখল করেছে ধনতান্ত্রিক সমাজের দ্রুত যন্ত্রবৎ গতি। ধাবমান জীবনের গতিকে সাহিত্যের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে ফ্যুচারিজম। রূপের সঙ্গে গতির অভেদ্য সম্বন্ধ। সেইজন্যে রূপের চর্চা করতে গেলে গতির কথা বলতেই হয়। "মেঘৈমেদুরম্‌ অম্বরং" এই রূপের মধ্যে একটা গতির আভাস আছে, আর 'নমোশ্চক্র নমোশ্চক্র"র রূপের মধ্যে থেকে আর একটা গতির স্পন্দন আমাদের বুকে এসে লাগছে। জীবনের রূপ বদলে গিয়েছিল কিন্তু সাহিত্যের রূপ বদল হয় নি, ফিউডাল (Feudal) জীবনের টিমিয়ে-চলা তালকে ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের জীবন বেতালা করে চলে গেল বটে, কিন্তু সাহিত্যে সেই টিমিয়ে-চলা তাল বাজতে লাগল। ফ্যুচারিজম তাই চেষ্টা করল ক্যাপিটালিষ্ট সামাজিক জীবনের দ্রুতগতি (Tempo) সাহিত্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে, সাহিত্যকে জীবনের সঙ্গে একতালা করে তুলতে। ক্যাপিটালিষ্ট সমাজ জীবনের ক্ষিপ্ত 'টেম্পো' যথার্থ, তাকে কম্যুনিস্ট অস্বীকার করে। আমাদের কম্যুনিস্ট সমাজে এই ছন্নছাড়া টেম্পোর স্থান নেই। মানুষ মাত্রেই পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্যকে, নিজের জীবনের সমস্ত মাধুর্যকে, অনুভূতিকে চাকার মত নিজের জীবনটাকে নিয়ে ঘুরবার কালে, কোন রকমে যেমন তেমন করে দেখা যাবে, এই মিথ্যাকেআমরা স্বীকার করি না এবং ভবিষ্যৎ কম্যুনিস্ট সমাজে আমল দিই না। জীবনে আমরা যে বস্তুটিকে অস্বীকার করি, সাহিত্যেও আমরা সেই বস্তুটিকে অস্বীকার করবো, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কম্যুনিস্ট সাহিত্যের একটা প্রধান লক্ষণ এই গতিকে অস্বীকার করা। দ্রুতগতিকে অস্বীকার করার মানে এই নয় যে ফিউডাল জীবনের ঢিমিয়ে -চলা গতিকে স্বীকার করে নেওয়া। ধনতান্ত্রিক সমাজের গতিকে অস্বীকার করবার মানে মানুষ যে যন্ত্রবৎ গতিতে নিজের জীবনকে দৌড় করাতে বাধ্য হয়েছে, ক্যাপিটালিজমের সেই জোর জবরদস্তি দৌড় করানো থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া। এই জোর জবরদস্তির দৌড় থেকে মুক্তি পেলে মানুষ জীবনকে ইচ্ছামত গতি দেবে, সে গতির রূপেতে যান্ত্রিক রূপ থাকবে না, গতির রূপ থাকবে। সামাজিক জীবনে আর সাহিত্যে বুর্জ্জুয়া গতির অস্বীকার আমরা একই সঙ্গে করে থাকি। বর্তমান সোভিয়েট সাহিত্যকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি কম্যুনিস্ট সাহিত্য বলে স্বীকার করতে পারি না, কারণ এই সাহিত্য পলিটিক্যাল বটে কিন্তু বিপ্লবমূলক নয়, আর এই সাহিত্যে বেশীরভাগ স্থলে ফ্যাচারিজমের প্রয়াস দেখা যায় যেটা সাহিত্যের সম্পূর্ণ বুর্জ্জুয়া রূপ। চিত্র ও ভাস্কর শিল্পে ভাব ও রূপের এই একই বুর্জ্জুয়া অনুকরণের দৈন্যতা চোখে পড়ে। "আ-খ-র" বলে মস্কোতে সোভিয়েট শিল্পীদের যে প্রতিষ্ঠান আছে তার এক প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। আমার মতে এই প্রদর্শনী চিত্রগুলি যে টেকনিক হিসেবে নীচু দরের তা নয়, শিল্পনৈপুণ্যে চিত্রগুলি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ামূলক। বুর্জ্জুয়া দেশে ভাব চিত্রকরেরা হিন্ডেবুর্গের, পঁয়কারের তাহাদের সেনাপতিদের ছবি এঁকে থাকেন আর সেই ছবিগুলোর উদ্দেশ্য এই সব লোকদের ব্যক্তিত্বকে বড় করে দেখিয়ে জনসাধারণের মনকে অভিভূত করা। শিল্পপ্রণালী এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যে ব্যক্তিগত পথ ধরে। কম্যুনিস্টরা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে। আমরা ব্যক্তিত্বকে আদবেই অস্বীকার করি না। আমরা অস্বীকার করি সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তিত্বের যে একটা অস্বাভাবিক স্ফীতিমা দেখানো হয় সেই স্ফীতিমাকে, কারণ তার দ্বারা প্রমাণ হয় যে ব্যক্তিত্বের স্ফীতিমাই সত্য আর সমষ্টির সমতলতা সত্য নয়। এই চেষ্টা যেন সমুদ্রের অসীম বিস্তৃত জলরাশিকে অবজ্ঞা করে শুধু সমুদ্রের ঢেউগুলিকেই একমাত্র প্রধান্য দেওয়া। এই চেষ্টার দ্বারা জলরাশির আর ঢেউয়ের উভয়েরই তাৎপর্য্যকে লঘু করা আর তাদের বহিঃপ্রকাশকেও অসম্পূর্ণ করে দেখানো হয়। বুর্জ্জুয়া আর্ট ও সাহিত্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ঢেউয়ের তাড়নায় জলরাশিকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা। আমাদের প্রচেষ্টা ঢেউয়ের সঙ্গে জলরাশির আভ্যন্তরীণ ঐক্যকে দেখানো, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমষ্টি অবিচ্ছদ্যে সম্বন্ধকে আর্ট ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা। এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে গেলে রূপের কথা ভাববার দরকার আছে। চিত্রে এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে গেলে এমন একটা রূপ দিতে হবে যার দ্বারা ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির যোগ সুস্পষ্ট হয়। আ-খ-র' প্রদর্শনীর চিত্রগুলিতে এই যোগকে দেখাবার নাম মাত্র প্রয়াস দেখলুম না। রেড সেনাপতি ভরসিলভের বহু ছবি দেখলুম, ষ্টালিনের ছবি দেখলুম, আরো অন্য অন্য নেতাদের ছবিও রয়েছে, যে সব ছবির সঙ্গে বুর্জ্জুয়া দেশে শিল্পীরা তাঁদের নেতাদের, সেনাপতিদের যে চিত্র এঁকে থাকেন তাঁর সঙ্গে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। কিচনারের ছবি যেমন করে আঁকা হয়ে থাকে ঠিক তেমনি করেই ভরসিলভের ছবি আঁকা, পঁয়কারের যে সব ছবি বুর্জ্জুয়া চিত্রকরেরা এঁকে থাকেন তার সঙ্গে সোভিয়েট চিত্রকরদের আঁকা ষ্টালিনের ছবির কোনই পার্থক্য আমি দেখলুম না। সেই সবই পুরনো মান্ধাতা আমলের বুর্জ্জুয়া প্রণালী এই সোভিয়েট শিল্পীরা অনুকরণ করে চলেছেন। এই শিল্পীরা আবার নিজেদের অন্য শিল্পীদের

থেকে তফাৎ করেন আপনাদের "বিপ্লবী" (?) শিল্পী বলে আখ্যা দিয়ে। ১৯২৮ সালে মস্কোতে 'আ-খ-র' প্রদর্শনী দেখেছিলুম, সে প্রদর্শনী দেখে আমার মনে হয়েছিল এই শিল্পীদের মধ্যে একজনও তেমন প্রতিভাশালী নেই যিনি শিল্পের মধ্যে কম্যুনিস্ট আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। বিপ্লবী শিল্পীদের প্রতিষ্ঠান 'আ-খ-র' থেকে যে সব চিত্র-প্রদর্শিত হয়েছিল তাঁর অধিকাংশই যে বিপ্লবের আদর্শের পক্ষে প্রতিক্রিয়া মূলক সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শিল্প প্রচেষ্টায় আমরা এখনো যে কোনই আকার খুঁজে পাই নি সেটা স্বীকার করা দরকার। সিনেমা আর থিয়েটারে সেই আকার খুঁজে পাওয়া গেছে, বিশেষ করে সিনেমায়। আইসেনষ্টাইন এই পথের অগ্রদূত। তাঁর তৈরী ফিল্ম "পটেমকিন" আর "জেনারাল লাইন" সিনেমা জগতে যুগান্তর এনেছে। তিনি যখন "জেনারাল লাইন" বলে ফিল্ম তৈরী করছিলেন সেই সময় ষ্টুডিওতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কাজ দেখবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। অভিনেতারা সবাই সাধারণ গাঁয়ের লোক। পথে, রেলওয়ে ষ্টেশনে, গ্রামে যখন কোন ভালো টাইপ তাঁর চোখে পড়ে তখনই আইসেনষ্টাইন তাকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন তাঁর ফিল্মের জন্যে। পেশাদার অভিনেতাদের তিনি নেন না যে কেন, সেটা তিনি আমাকে পেশাদার অভিনেতার মত মুখ বিকৃতি করে দেখালেন, যে পেশাদার অভিনেতাকে হাসতে বললে সে কি রকম হাসবে। বুর্জ্জুয়া ফিল্ম, বুর্জ্জুয়া, থিয়েটারে জনসাধারণকে ব্যবহার করা হয় শুধু আভরণ হিসেবে কেন্দ্রে তার কোন স্থান নেই। আমাদের কম্যুনিস্ট থিয়েটারে কমুনিস্ট ফিল্মে জনসাধারণ আর আভরণ রূপে দেখা যায় না। সে এখন কেন্দ্রে, এখন তারই জীবনের বহুরূপ দেখানো হয় থিয়েটার আর ফিল্মের দ্বারা। আইসেনষ্টাইন দেখিয়েছেন যে এই কালেকটিভের রূপ ফিল্মে কি হতে পারে। সোভিয়েট ফিল্ম প্রসঙ্গে আর একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা দরকার। তাঁর নাম ডাভচেঙ্কো। তাঁর ফিল্ম 'আরসিনাল' আর 'জেলালিয়া' (মাটি) সমষ্টির মধ্যে দিয়ে জীবনের করুণ চিত্র কি গভীর ভাবে দেখানো যেতে পারে তার সাক্ষ্য। আইসেনষ্টাইনের বুদ্ধিই হ'ল প্রেরণা, তাঁর কাজে অনুভূতির দিকটা তত প্রবল নয়। ডাভচেঙ্কো ঠিক তার বিপরীত, তাঁর তৈরী ফিল্ম দুটি যেন দুটি, কবিতা, অনুভূতি তাদের প্রাণ। ফিল্মের উপাখ্যান, টেকনিক সমস্ত এঁরা বদল করে দিয়েছেন। থিয়েটারে এই প্রচেষ্টা করছেন মায়ার হোলড। সেই মান্ধাতার আমলের রিয়ালিজমের পন্থা অনুসরণ করে চলেছেন ষ্টানিস্লাভস্কি আর থিয়েটারকে কেবল রাজনৈতিক রূপ দিয়েছে (রেভোল্যুশনারী রূপ নয়) রেভোল্যুশনারী থিয়েটার। মায়ার হোলডের থিয়েটারই একমাত্র সোভিয়েট থিয়েটার, যাহা নাট্য জগতে একটা নতুন রূপ আনতে চেষ্টা করছে। সেই চেষ্টার মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে কিন্তু সেই চেষ্টা মুখ্যত বিপ্লবমূলক। থিয়েটারের প্রসঙ্গে এত কথা বলবার আছে যে সে সম্বন্ধে একটা বই লেখা যেতে পারে। সে বই লোকের পড়তে ভালোও লাগতে পারে কিন্তু এই পরিচ্ছেদের আয়তনকে আর দীর্ঘ করবার ইচ্ছা নেই। ড্রামা, থিয়েটার সংক্রান্ত জটিল সমস্যা আছে সেগুলি ইচ্ছা করেই এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করি নি কেননা সেই সমস্যাগুলি বিশেষজ্ঞদের জন্যে, যাঁরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন তাঁদের পক্ষে এই সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা সুখপ্রদ হবে না। সাহিত্য ও আর্টের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে সব ভিন্নভিন্ন ধারা দেখা দিয়েছে সেইগুলি সত্যিকার কতটা কমিনিস্ট মতের সেটা বিচার করে দেখবার চেষ্টা করেছি, আর সাহিত্য ও আর্ট সম্বন্ধে আমাদের কম্যুনিস্ট ধারণার তাৎপর্যকে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

শিল্প সুন্দর ও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনা

চোখ আমাদের ছুটে চলেছে। ছুটে চলার শেষ নেই তার। হাটে, খেয়াঘাটে, বনে জঙ্গলে, সর্বত্র ছুটছে অথচ কিছুই দেখছে না আমাদের চোখ। হাঁসের পালকের উপর জলের মতো এই বিশ্ব পিছলে যাচ্ছে আমাদের দৃষ্টির উপর দিয়ে।

পথের ধারে ফুটছে ফুল, ধরণী তার রঙের মশাল জ্বেলে দাঁড়িয়ে, চোখ দেখলো অথচ দেখলো না। বৈশাখী দুপুরে নিঝুম একটি গলির পথে দাঁড়িয়ে আছে একটি গাধা, চোখ দেখেও দেখলো না। বৈশাখী দুপুরের সব নিঝুমতা ও রহস্যের রূপ নিয়ে একটি পাখি মেঘলা এক সকালে কেবলই ছুটোছুটি করছে বাসা থেকে আকাশে, আকাশ থেকে বাসায়। মেঘলা দিনের সব চঞ্চলতা, মেঘ মেদুরতা ঐ পাখিটির রূপের মধ্যে, কাক বিজ্ঞের মতো আঁস্তাকুড়ের লোভনীয় বস্তুস্তূপকে বিচার করে দেখছে পণ্ডিতি চালে ঘাড় ঘুরিয়ে—এমনি কত রূপের লীলা প্রতিটি মুহূর্তে ঢেউ তুলে চলেছে আমাদের ঘিরে, অথচ আমাদের চোখ তাদের দেখে অথচ নিতে পারে না, ধরতে পারে না।

আমাদের চোখ জীর্ণ হয়ে গেছে, চোখ সংসারী হয়েছে, লোভী হয়েছে। এই হচ্ছে সাধারণ মানুষের চোখ। চোখ প্রয়োজনের ধুলোর কাজল পরেছে। যা রোজকার জীবনের প্রয়োজন সাধন করে না, চোখ দেখতেও পায় না তাকে। অথচ এই চোখ কি না দেখতে পায়! শেফালি বনের মনের কামনাও দেখতে পায়, বকুল ডালের আগায় জ্যোৎস্না যেখানে ফুলের স্বপন জাগায় সেই স্বপ্নকেও দেখতে পায়। সজনে ফুলের দিকে আমাদের চোখ পড়লেই সজনে ডাঁটার কথা মনে ক'রে রসনা রসসিক্ত হয়ে ওঠে। অথচ যাঁর দেখার সাধনা সফল হয়েছে তিনি দেখেছেন যে 'গাঁয়ের আকাশ সজনে ফুলের হাত-ছানিতে ডাকে আমায়।' শিল্পীর সাধনা হল এই দেখার সাধনা। এই দেখার সাধনা না হলে শিল্পীর রূপসাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। পর্দার পর পর্দা সরাতে হয় চোখের উপর থেকে তবে বস্তু তার প্রাণের সুন্দরকে সমর্পণ করে শিল্পীর কাছে।

অবনীন্দ্রনাথ হচ্ছেন সেই দুর্লভ মানুষদের মধ্যে একজন যাঁরা দেখার সত্যসাধনায় সিদ্ধপুরুষ। সারা জীবন তিনি রসের দেখার সাধনা ক'রে গেছেন। সে সাধনা তাঁর সফল হয়েছে সাহিত্যে ও চিত্রে—ভাষার ছবিতে রেখার ছবিতে। দৃষ্টির সেই জীবনভোর সাধনায় তাঁর জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি তাঁকে উপলব্ধির যে লোকে পৌঁছে দিয়েছিল সেখান থেকে ফিরে এসে সুন্দরের উপলব্ধির কিছু কিছু নিশানা তিনি আমানের জন্যে থুয়ে দিয়ে গেছেন।

শিল্পের 'সুন্দর', শিল্পীর এই যে সুন্দরের অনুভূতি এটি কি বস্তু? সাধারণ লোক প্রাত্যহিক জীবনে সুন্দর কথাটি লাগায় না এমন বস্তু খুঁজে পাওয়া ভার। সাধারণ লোক

যাকে 'সুন্দর' বলে সেটি হচ্ছে তাদের প্রয়োজনের জিনিস কিংবা কামনার জিনিস। চৌকিটি সুন্দর কেন না বসে আরাম হয়, সুন্দর খাটটি কেন না দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বেশ বড় বহরের বাড়ির গিন্নীর বিশাল দেহটি তাতে আরাম পায়। মেয়েটিও সুন্দর কেন না বৌ ক'রে আনলে দশজনের কাছ থেকে তারিফ লাভ আর নিজেরও আত্মতৃপ্তি। তাই যা ব্যবহারে লাগে, ভোগে লাগে তাকেই সাধারণ লোক সুন্দর বলে থাকে।

শিল্পীর 'সুন্দর' কিন্তু এই কামনার, ব্যবহারের ভোগের পথ দিয়ে আসে না। মতলবের হাওয়া বয়েছে তো 'সুন্দর' লুকিয়ে গেছে। চণ্ডীদাসের 'কাম গন্ধ নেই তায়' এর সু-বাতাসে সুন্দরের নাম এসে পৌঁছয় শিল্পীর অন্তরের রসের ঘাটে। কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ করে না সে 'সুন্দর', কোনো কামনা মেটায় না। তার প্রকাশই তার প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শিল্পীর সুন্দরের সাধনার কোনো জৈবিক হেতু নেই। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—পিঁপড়ে ছুটোছুটি করে চিনির সন্ধানে কিন্তু মধু আহরণে মৌমাছির ছুটোছুটি সে একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। পিঁপড়ের চিনি সংগ্রহের সঙ্গে তার পেটের যোগ, চিনি না পেলে সে মরা ইঁদুরে গিয়ে চিমটি বসায় কিন্তু পেট খুব তাড়া দিলেও মাছের আর মাংসের জুস দিয়ে মৌচাক ভর্তি করে না মৌমাছি।' (সুন্দর)।

তাই শিল্পীর 'সুন্দর' আর সাধারণ লোকের 'সুন্দর' একেবারে ভিন্ন বস্তু । তাদের মিল নেই কোথাও।

শিল্পীর 'সুন্দর' তা হলে কি?

প্রতিটি বস্তুর সত্তার অনুভূতিই হল সুন্দরের অনুভূতি। সত্তার যথার্থ অনুভূতি, তার অনবগুণ্ঠিত নগ্ন পরশ হচ্ছে সুন্দরের স্পর্শ শিল্পীর প্রাণে। বস্তুর সত্তার আস্বাদ হল রস। সেই রস আস্বাদ করলেই মনে আনন্দ উথলে ওঠে, সেই আনন্দ থেকে সৃষ্টি হয়। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সত্তার আস্বাদই আনন্দ জাগায়, সত্তার অনুভূতিই সুন্দরের অনুভূতি।

কিন্তু অধ্যাত্মলোকের সাধকেরাও তো 'সুন্দর' এর কথা বলেন। শিল্পীর 'সুন্দর' আর অধ্যাত্মসাধকের 'সুন্দর' কি তবে এক?

না, তারা একেবারেই এক নয়। অধ্যাত্মসাধনার সাধকদের 'সুন্দর' হচ্ছেন সব পরিবর্তনের বহু ঊর্ধ্বে চিরন্তন শাশ্বত লোকের চির-স্থির ধ্রুব বস্তু। রূপের অযুতদল পাপড়ি খুলতে খুলতে সাধকেরা পান সেই অরূপ মধু।

আর শিল্পীর সুন্দর? শিল্পীর 'সুন্দর' হল বিশ্বসত্তার অনন্ত রূপ-মূর্তি, শিল্পীর সাধনা হল অনন্ত রূপের সাধনা, রূপবৈচিত্র্যের সাধনা, রূপলীলার সাধনা। একের অরূপ-সাধনা সেটা নয়, বিশ্বসত্তার অফুরন্ত রূপের সাধনা। অধ্যাত্মলোকের সাধকের মতে রূপগুলো হচ্ছে ফেনা যা সরিয়ে সরিয়ে সাধক পৌঁছল গিয়ে অরূপ একের ঘাটে। আর শিল্পী এই প্রতিটি রূপকে স্বীকার করেন, অভ্যর্থনা করেন তাকে প্রাণের রঙমহলে। রূপকে ঠেলে দিয়ে সরিয়ে দেওয়া শিল্পীর কাজ নয়, তাকে আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করাই হল, শিল্পীর ধর্ম।

সত্তার এই অনন্ত রূপলীলাকেই কবিরা 'মানস-সুন্দরী', 'চিত্রা', 'উর্বশী', 'চিরন্তনী-

নারী' বলে কল্পনা করেছেন। তাই পাশ কাটিয়ে যাওয়া শিল্পীর ধর্ম নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'সমস্ত জগৎটাকে 'আছে' বলে অভ্যর্থনা করবার আমরা না পাই অবকাশ, না পাই শক্তি।' আর শিল্পীর 'সুন্দর' এর মর্ম উদ্‌ঘাটন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আছে বলেই সুন্দর, সুন্দর বলেই আছে তা নয়। আর এই 'আছে'টা এক নয়, বহু , আর স্থিতি নয় গতি।'

আর্টের পরম সুন্দর আর সত্যসন্ধানীর পরম সুন্দর—এ-দুটো আলাদা। একটা হল শাশ্বত সুন্দর অন্তহীন স্থিতির সৌন্দর্য্য—অরূপের সৌন্দর্য্য। আর একটা হল বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্য, লীলার সৌন্দর্য্য, অন্তহীন গতির সৌন্দর্য্য—রূপের সৌন্দর্য্য। তাই অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'পরম সুন্দরের দিকে মানুষের মন ও সঙ্গে সঙ্গে তার আর্টের গতি ঠিক ওই ভাবেই চলেছে—গতি থেকে গতিতে পৌঁছচ্ছে আর্ট, এবং একটা গতি আর একটা গতি সৃষ্টি করছে, ঢেউ উঠল ঠেলে, মনে করলে বুঝি চরম উন্নতিকে পেয়েছি, অমনি আর এক ঢেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে বললে, চলো আরো বাকি আছে।' (সৌন্দর্য্যের সন্ধান)

এই পরম সুন্দরকে ধরা যায় না, ধরতে পারলে আর্টের খেলা থেমে যেতো। কি ক'রে যাবে? এ পরম সুন্দর তো একটা বিন্দু নয়, এটা ঢেউ, ওটা সত্তার প্রবাহ, অনন্ত রূপের লীলা। তাই অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—'পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে আর্ট দিয়ে ধরতে পারলে এ খেলা কোন কালে শেষ হয়ে যেত। যে মাছ ধরে তার ছিপে যদি মৎস-অবতার উঠে আসতো তবে সে মানুষ কোনোদিন আর মাছ ধরাধরি খেলা করত না।' (সৌন্দর্যের সন্ধান)

পরম সুন্দরের শাস্ত্র-মত রচনাও সম্ভব নয়। লোভী মানুষ যে চেষ্টা করে নি তা নয়, চেষ্টা করেছে বারে বারে। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছে। যা সৃষ্টি হয়েছে—সত্তার আভা নেই তাতে, আছে শুধু মাপজোক। বস্তুর খণ্ড খণ্ড সুন্দর অংশ নিয়ে পরম সুন্দরের মূর্তি রচনা করার ইচ্ছে জেগেছিল শিল্পীদের মনে। কিন্তু এই খণ্ডগুলি জুড়ে দিলে যে পরমসুন্দর সৃষ্টি করা যায় না, একদিন সেটা বুঝলো শিল্পীরা। অবনীন্দ্রনাথ বললেন—'গ্রীসে এক কারিগর এইভাবে হেলেনের চিত্র পাঁচজন গ্রীক সুন্দরীর পঞ্চাশ টুকরো থেকে রচনা করে গ্রীসকে চম্‌কে দিয়েছিল।......শেষে এমনও দিন এলো যে ঐ ভাবে তিলোত্তমা গড়ার চেষ্টা ভারি মূর্খতা এ কথাও আর্টিস্টরা বলে বসলো। আমাদের দেশেও ঐ একই ঘটনা—শাস্ত্র-সম্মত মূর্তিকেই পণ্ডিতেরা রম্য বলে মত প্রকাশ করলেন, সে শাস্ত্র আর কিছুই নয় কতকগুলো মাপজোক এবং পদ্ম-আঁখি, খঞ্জন-নয়ন, তিল ফুল, শুকচঞ্চু, কদলীকাণ্ড, কুক্কুটাণ্ড, নিম্বপত্র এই সব মিলিয়ে সৌন্দর্যের এবং আধ্যাত্মিকতার একটা পেটেন্ট খাদ্যসামগ্রী। মনের খোরাক এভাবে প্রস্তুত হয় না। কাজেই আমাদের শাস্ত্র-সম্মত সুতরাং বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক যে artificiality তা ধর্মপ্রচারের কাজে লাগলেও সেইখানেই art শেষ হল, এ কথা খাটলো না।' (সৌন্দর্য্যের সন্ধান)

সৌন্দর্য্যের কি তবে কোনো আদর্শ নেই? সুন্দর অ-সুন্দরের বিচার কি তা হলে মনের উপরে ছেড়ে দেওয়া যাবে? মানুষের ব্যক্তিগত রুচির উপরে সুন্দর অ-সুন্দরের বিচারের শেষ নিষ্পত্তিটা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তা হলে সুন্দরের আদর্শ বলে যে কিছু থাকবে

না—এইটেই হচ্ছে মানুষের মনের আশঙ্কা।

কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে সুন্দরের একটা বাঁধা-ধরা আদর্শের প্রয়োজনটাই বা কি? সত্তাকে বিশ্বসত্তাকে প্রত্যেকে তার নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী, নিজ নিজ রসগ্রহণ-ক্ষমতা অনুযায়ী, অন্তরে গ্রহণ করলো ও প্রকাশ করলো সেই রসকে রূপে। এখানে রূপের অফুরন্ত বৈচিত্র্য থাকবে রসগ্রহণের ক্ষমতা অনুযায়ী অর্থাৎ সত্তার অনুভূতির উপলব্ধির তারতম্য অনুসারে। সৃষ্টির বৈচিত্র্য তো এর থেকেই আসে। যেখানে সুন্দরের বাঁধা-ধরা রূপ সেইখানেই রস মরে গেলো, আনন্দ বিলীন হল, এলো শুষ্কতা, মরলো শিল্প।

তাই অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—'সুন্দরকে বাহ্যিক উপমান ধরে যাচাই করে নেবার জন্যে এ ব্যস্ততার কারণ আমি খুঁজে পাই নে। ধর, সুন্দরের একটা বাঁধাবাঁধি প্রত্যক্ষ আদর্শ রইলো না। প্রত্যেকে আমরা নিজের নিজের মনের কষ্টিপাথরেই বিশ্বটাকে পরীক্ষা করে চললেন—খুব আদিকালে মানুষ আর্টিস্ট যে ভাবে সুন্দরকে দেখে চলেছিল—এতে করে মানুষের সৌন্দর্য্য উপভোগ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির ধারা কি এক দিনের জন্যে বন্ধ হল জগতে? বরং আর্টে ইতিহাসে এইটেই দেখতে পাই যে যেমনি কোনো জাতি বা দল আর্টের দিক দিয়ে কিছুকে আদর্শ করে নিয়ে ধরে বসলো পুরুষপরম্পরায় অমনি সেখানে রসের ব্যাঘাত হতে আরম্ভ হল, আর্টও ক্রমে অধঃ থেকে অধোগতি পেতে থাকলো।' (সৌন্দর্য্যের সন্ধান)

সুন্দরের আদর্শ তাই অস্থায়ী জিনিস।

অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—'আদর্শটা এমনি জিনিস যে তাকে নিয়ে চিরকাল কারবার করা মুশকিল। রুচি বদলায়, আদর্শও বদলায়, যেটা ছিল এক কালের চাল সেটা হয় অন্য কালের বেচাল।' (সৌন্দর্য্যের সন্ধান)

সুন্দরের ও অসুন্দরের অবিচলিত আদর্শ নেই।

'সুন্দরের অসুন্দরের অবিচলিত চলায়মান জীবনে কোথাও নেই।' (সৌন্দর্য্যের সন্ধান)

সুন্দরের একটা স্থাণু অবিচলিত আদর্শের অভাব শিল্পকলার পক্ষে তত ভাবনার নয়। সত্যিকারের ভাবনা হচ্ছে বিপদ হচ্ছে তখনই যখন স্থিতি আদর্শের রাহু আমাদের সুন্দর উপলব্ধিকে সুন্দরকে অনুভব করবার শক্তিকে বিলুপ্ত করে।

একমাত্র যাকে সুন্দরের আদর্শ বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে প্রাণের স্রোত, সত্তার পরিচয়।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমাদের মনে বা বস্তু ও ভাবের অন্তরে যে নিত্য এবং সুন্দর প্রাণের স্রোত গোপনে চলেছে তাকেই সুন্দরের আদর্শ বলে ধরতে পারি, আর কিছুই নয়।'

প্রাণের স্রোতের পরিচয় যে দেয় সেই সুন্দর। যে সেটা দেয় না সে অসুন্দর। এ ছাড়া শিল্পকলায় আর কোনো সুন্দর অসুন্দর নেই।

আর্টের সুন্দরের সাথে সত্যের ও মঙ্গলের কোনো যোগ নেই। রূপের সাধনা এবং অধ্যাত্ম-সাধনা এই দুই হচ্ছে নিষ্কাম সাধনা। কিন্তু রূপকে সামনে রেখে শিল্পীর যে নিষ্কাম সাধনা সেই সাধনা যাঁরা রূপকে অস্বীকার করেন কিংবা রূপকে এড়িয়ে যান সেই অধ্যাত্মসাধকদের সাধনার চেয়েও অনেক বেশি শক্তি এবং বীর্যের অপেক্ষা রাখে।

রূপলোকের যাত্রী অবনীন্দ্রনাথ সেই অমৃত-পথেই তাঁর শিল্পীজীবনে চলেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনা

মূলত তিন ধরনের দৃষ্টি দিয়ে মানুষ দেখছে এই বিশ্বকে, তিন রকমের মন নিয়ে বিচার করছে, উত্তর খুজছে তার অন্তরে যে শত শত প্রশ্ন জেগেছে সেই সব প্রশ্নের।

একটি হচ্ছে যোগীর দৃষ্টি, একটি দার্শনিকের দৃষ্টি আর একটি হচ্ছে শিল্পীর দৃষ্টি। ধ্যানের দ্বারা সেই অনন্ত সূত্র যাতে সমস্ত বস্তু বিধৃত রয়েছে তাকে জানতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় যোগী। অক্ষয়কে জেনে সমস্ত ক্ষয়শীলের ধর্ম জানতে চায় যোগী। যোগীর মতে অক্ষয়কে বাদ দিয়ে ক্ষয়শীলকে, নিত্যকে বাদ দিয়ে অনিত্যকে, অনন্তকে বাদ দিয়ে সীমিতকে জানা সম্ভব নয় যোগী তাই পরম সত্তার উপলব্ধির সাধক! একের সাধক যোগী।

কার্যকারণের কোদাল দিয়ে ঘটনাস্তূপ কুপিয়ে চলে, খুঁড়ে চলে দার্শনিক। ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তির ইট দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির ও মানুষের অন্তরলোকের মহল তৈরি ক'রে চলে সে। একের উপলব্ধি তার কাজ নয়। লীলার আনন্দ ব্যঞ্জনাও তার কাজ নয়। কার্যকারণের সম্বন্ধ দেখিয়ে বিশ্বের অস্তিত্বের হেতু দেখানো তার কাজ।

শিল্পী সে ন্যায়ের ধার ধারে না। বিশ্লেষণের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা প্রতিটি ঘটনাকে ভেঙে দেখাতে চায় না সে। কিংবা যোগীর মতো প্রতিটি ঘটনার মূলে কি নিত্যসত্তা আছে তার উপলব্ধি সে চায় না। সে চায় প্রতিটি অনিত্য অস্তিত্বের লীলাচঞ্চল-সত্তা স্পর্শ করতে। নিত্যসত্তাকে নিয়ে, লীলা-রহিত এককে নিয়ে শিল্প সম্ভব নয়। লীলা আর্টের প্রাণবায়ু। বস্তুর প্রাণ লীলা তরঙ্গিত বলেই তার রূপের শেষ নেই। এই কারণেই শিল্পীর কাছে, রূপকারের কাছে একই বস্তুর এতো অনন্ত রূপ। লীলা আছে বলেই এতো অনন্ত রূপ সম্ভব। যোগীর কাছে বস্তুর প্রকৃত সত্তা এক, দার্শনিকের কাছে বস্তু শুধু কার্যকারণের একটি সূত্র, শিল্পীর কাছে, রূপকারের কাছে বস্তু হচ্ছে লীলাময়, বহুরূপী, প্রাণময় প্রকাশ।

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্পী রূপকার, যোগী নন দার্শনিক নন। একের সাধনা তিনি করেন নি, বিচিত্র রূপলীলার প্রতিটি প্রকাশকে রেখাবন্ধনে চিরন্তন করা ছিল তাঁর শিল্পীমনের ধর্ম, তাঁর সাধনা। ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি দিয়ে বিশ্ব-বিশ্লেষণ তাঁর এলাকা নয়, কার্যকারণের হেতু দেখানো তাঁর কাজ নয়। প্রতিটি লীলাব রসবন রূপরেখায় ফুটিয়ে তোলা তাঁর কাজ। রূপের এতো সীমাহীন বৈচিত্র্য, সে বৈচিত্র্যরসের ক্ষেত্রের আদার ব্যাপারীদের চোখে পড়ে না। রূপের স্থূল প্রকাশ চোখে পড়ে, রূপের যে চিকন বুনুনি সারা জগৎ ব্যেপে ছড়িয়ে আছে, সেটা চোখেই পড়ে না বেশির ভাগ লোকের। প্রতিটি রূপের এই অপরূপ বুনুনি প্রকাশ করাই শিল্পীর কাজ। আমাদের স্থূল দৃষ্টির জড়-আবরণ সরিয়ে দেওয়াই হচ্ছে শিল্পীর ব্রত।

শিল্পীর দেখা আর যোগীর দেখা, শিল্পীর পথ আর যোগীর পথ, এই সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সেটা জানলেই তাঁর মনের কথা জানা যাবে। তিনি বলছেন—'চৌকিতে বসলুম পূবমুখো হয়ে, চোখ বুজে ডাকতে লাগলুম ভগবানকে।....এমন সময়ে মনে হল কানের কাছে কে যেন বলে উঠ্‌লো, 'চোখ বুজে কি দেখছিস, চোখ মেলে দেখ।' চমকে

মুখ তুলে চেয়ে দেখি সামনে আকাশ লাল টক্‌টক করছে, সূর্যোদয় হচ্ছে। সে কি রঙের বাহার, মনে হল যেন সৃষ্টিকর্তার গায়ের জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যদেব উদয় হচ্ছেন। সৃষ্টিকর্তার এই প্রভা চোখ মেলে না দেখে আমি কিনা চোখ বুজে তাঁকে দেখতে চেষ্টা করেছিলুম। সেদিন আমি বুঝলুম আমার রাস্তা এ নয়, চোখ বুজে তাঁকে দেখতে চাওয়া আমার ভুল। শিল্পী আমি, দু চোখ মেলে তাঁকে দেখে যাবো জীবন ভোর।'

'একদিন বারীন ঘোষ এলো আমার কাছে,—বললে, ছবি আঁকা শিখবো আপনার কাছে। বললুম 'তা তো শিখবে, কিছু এঁকেছো কি? দেখাও না।' সে একখানি দুর্গার ছবি দেখালে। বললে—'এইটি এঁকেছি।' দুর্গার ছবি যেমন হয় তেমনি এঁকেছে। বললুম, 'তা দুর্গা যে এঁকেছ, কি করে আঁকলে?' সে বললে—'ধ্যানে বসে একটা রূপ ঠিক করে নিয়েছিলুম। পরে ছবি আঁকলুম।' আমি বললুম, 'তা হবে না বারীন। ধ্যানে দেখলে চলবে না, চোখ খুলে দেখতে শেখো, তবেই ছবি আঁকতে পারবে।' যোগীর ধ্যানে আর শিল্পীর ধ্যানে এইখানেই তফাত।

এই যে চোখ খুলে রূপের লীলা দেখা, এই দেখার পরে ছবিসৃষ্টির পালা যখন শুরু হল তখন সেই ছবিসৃষ্টি কি শুধু বাইরের দেখা থেকেই তার সব রঙ নিলো? ছবিসৃষ্টি কি তা হলে প্রকৃতির রংশালা থেকে নেওয়া আর সেটা হুবহু কাগজে আঁকা? ছবিসৃষ্টি আদবেই তা নয়। মনের রঙ-গোলার বাটিতে বাইরের সব রঙ ধরা হয় না, মন বেছে নেয়। সবাইকে অন্দর মহলে ঢুকতেই দেয় না মন। বাইরে যেটাকে দেখলো সেটার আসল রূপটা ফোটাবার জন্যে অনেক বাহুল্য বর্জন ক'রে, অনেক ভাসা ভাসা রঙ বাদ দিয়ে মন তার সৃষ্টির উপকরণ যোগাড় করে। তাই প্রকৃতির সঙ্গে মনের প্রথম দেখা রূপ ও রস সৃষ্টির পক্ষে শুভদৃষ্টি নয়। এই প্রথমে দেখাটা শিল্পের পাকা দেখা হতে শিল্পীকে কঠিন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

শিল্পীর এই কঠিন সাধনা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'ছবিটি আঁকি, তুলিটি জলে ডোবাই, মনে ডোবাই, তবে লিখি ছবিটি।......আমি যৌবনে দেশী সংগীতের সুর ধরতে চেয়েছিলাম, হাতের আঙুলের ডগায় সুর এসেও ছিল; কিন্তু মনে তো পৌঁছয় নি। ব্যর্থ হয়ে গেল আমার পরিশ্রম, সকল সংগীতচর্চা।—অন্তর বাজে তো যন্তর বাজে। মনের সংস্পর্শ নইলে গাওয়াও বৃথা, বাজানোও বৃথা, ছবি আঁকাও বৃথা,—এ কথা জেনে নিলো মন।' এই বাইরের দেখাটাকে মনের দেখা করে নিতে পারলে ছবি তখন উপকরণের উপর বাইরে থেকে চাপানো জিনিস বলে মনে হয় না, উপকরণের ভেতর থেকে যেন ছবি ফুটে উঠেছে—এই রকম মান হয়। এই সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—'এই রকম মতিবুড়ো একবার বলেছিলেন আমায়, 'ছোটবাবু, একটা কথা বলবো, রাগ করবেন না? বললুম, 'না রাগ কেন করব, বলুন না?' 'দেখুন, ছোটবাবু, আপনার ছাত্র নন্দলাল, সুরেন্দ্র গাঙ্গুলি, ওরা ছবি আঁকে, দেখে মনে হয় বেশ যত্ন করে ভালো ছবিই এঁকেছে। কিন্তু আপনার ছবি দেখে তো মনে হয় না।' 'ছবি বলে মনে হয় তো?' 'তাও নয়।' 'তবে কি মনে হয়?' 'মনে হয়—।' 'বলেই ফেলুন না ভয় কি?' 'আপনার ছবি দেখে মনে হয় আঁকা হয় নি মোটেই।' 'সে কি কথা! আপনার কাছে বসেই আঁকি আমি, আর বলছেন,

আঁকা বলেই মনে হয় না।' 'না, মনে হয় যেন ঐ কাগজের উপরেই ছিল ছবি।' বড় শক্ত কথা বলে ছিলেন তিনি। শক্ত সমালোচক ছিলেন বুড়ো, বড় সার্টিফিকেটই দিয়েছিলেন আমায়। এ কথা ঠিক, এঁকেছি, চেষ্টা করেছি—এ সমস্ত ঢাকা দেওয়াই হচ্ছে ছবির পাকা কথা।'

শিল্পীর এই যে সাধনা, প্রকৃতির দিকে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে দেখে সেই দেখার বস্তুটিকে মনের ধন ক'রে তোলা, তাকে মনের মন্দাকিনীতে স্নান করিয়ে বাইরের অনেক কাদামাটি থেকে মুক্ত ক'রে তার আসল রূপটুকু দেখে নেওয়া, তারপরে উপকরণ মারফত সেই রূপ সকলের সামনে এমন ক'রে ধরে দেওয়া যে, প্রয়াসের এতোটুকু চিহ্নও সেই সৃষ্টির অঙ্গে ক্লেদের মতো জড়িয়ে থাকবে না, উপকরণের ভিতর থেকে এই যেন আত্মপ্রকাশ করছে মনে হবে,—এই সম্বন্ধে চীন দেশের জ্ঞানী সাধক চুয়াংসে কাহিনীর ছলে যে সত্যটি আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের কথার কি আশ্চর্য মিল! চুয়াংসে বলছেন—

'খিং সে কাঠের কারিগর। একটি ঘণ্টা রাখবার জন্যে সে কাঠের পায়া তৈরি করছিল। যখন সেটি তৈরি হল তখন সে দেখলো তার মনে হল যেন অশরীরী আত্মারা তৈরি করেছে। লু রাজ্যের রাজা খিংকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার এই অন্তর্নিহিত রহস্য কি!

খিং বললে—'আপনার এই সেবক একজন সামান্য হাতের কাজের কারিগর মাত্র। কলারহস্য তার কিই বা জানা থাকতে পারে? তবু একটু রহস্য আছে। ঘণ্টাটির জন্যে যখন আমি কাঠের পায়া তৈরি করতে গেলুম তখন আমার জীবনীশক্তিকে যাতে কোনো ক্ষয় বিন্দুমাত্র স্পর্শ না করতে পারে তার জন্য আমি যত্নশীল হই। চারিদিক থেকে নিজেকে ও নিজের মনকে গুটিয়ে এনে আমি শান্ত করি সমাহিত করি।

মন যখন আমার প্রশান্ত হল তখন এই প্রশান্তি লাভের তিন দিন পরেই যা অর্থ পুরস্কার আমি পেতে পারতুম তা ভুললুম। যে যশ আমি কুড়োতে পারতুম তা ভুললুম আমি পাঁচদিন বাদে। সাত দিনের দিন আমি আমার নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও রূপ সব ভুলে গেলুম। যে রাজদরবারের জন্যে আমি ঘণ্টায় পায়া তৈরি করছিলুম তাকেও ভুললুম।এইভাবে আমার কলা বাইরে সব কিছুর প্রভাব ও পীড়ন থেকে নিজেকে মুক্ত করলো। তখন আমি মহারণ্যে গিয়ে গাছগুলির রূপ নিরীক্ষণ করতে লাগলুম। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে অনেক গাছের মধ্যে একটি গাছ নজরে পড়লো। ঠিক যা চাইছিলুম এই গাছটির গঠন ছিল ঠিক তাই। তাই গাছটির দিকে তাকাতেই ঘণ্টার পায়া মনের চোখে ফুটে উঠলো।। তখন আমি কাজ শুরু করলুম। যদি আমি এই গাছটি খুঁজে না পেতুম তা হলে এই পায়া তৈরির কাজ আমি ছেড়ে দিতুম। আমার কলা আর এই গাছের গঠন মিলিত হল। আমরা যা অশরীরী আত্মার কাজ বলে থাকি আসলে তা হচ্ছে এইগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত।'

শিল্পের উপকরণ আর শিল্পীর ধারণা এমন সহজে মিলে গেলো যে উপকরণ আর ধারণা এক বলে প্রতীয়মান হল। এই সহজ ক'রে তোলা হচ্ছে শিল্পের কঠিনতম কাজ। চীন দেশের জ্ঞানী চুয়াংসে আর ভারতের শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ শত শতাব্দীর কালগত ব্যবধান দুজনের মধ্যে, শিল্পের দৃষ্টি ও শিল্পের সত্তা উপলব্ধিতে দুজনে কিন্তু এক।

সমগ্র জীবনটাই আর্টের উপাদান। তবে রুচি ও সংস্কার ভেদে শিল্পী বিষয় বেছে নেয়। জীবনের প্রত্যেক অভিব্যক্তিই আর্টের বিষয় হতে পারে। এ ছাড়া আর্টের ক্ষেত্রে আর এক ধরনের বাছাই আছে। যে বিষয়টিকে শিল্পী আর্টের ধাতু হিসেবে নিলো, সেই বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলতে হলে, অনেক নিষ্প্রয়োজন বাহুল্য যা বিষয়টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে; অনেক বাইরে থেকে ছুটে যাওয়া জিনিস যা বিষয়টির আসল রূপটিকে লুকিয়ে ফেলেছে ক্ষণিকের আবরণে, সে সব সরিয়ে ফেলতে হয় শিল্পীকে। শিল্পীর কারবার আসলকে নিয়ে, বিষয়ের প্রকৃত রূপ নিয়ে। তবেই শিল্পী খণ্ডকালের গণ্ডি থেকে বিষয়টিকে উদ্ধার ক'রে অনন্ত কালের মধ্যে তাকে মুক্তি দিতে পারে। এই বাছাইয়ের দ্বারাই সময়ের সীমার দ্বারা বন্দী বিষয় খণ্ড-সময়কে অতিক্রম করে। শিল্পীর মনের সঙ্গে সাধারণ মনের প্রভেদ এইখানে। শিল্পীর মনের সহজ ধর্মই হচ্ছে বাছাই। শিল্পীর অবচেতন মন সহজেই এই বাছাই করে নেয়। তাই অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'দেখলুম আর আঁকলুম, আমার ধাতে হয় না। অনেক দিন ধরে মনের ভিতরে যা তৈরি হল, তাই ছবিতে বের হল। মন ছিপ ফেলে বসে আছে। চুপচাপ।..... ......চোখ জিনিস দেখছে সে বড় কম নয়। কিন্তু সব কি আর মনে ধরেছে। তা নয়। মনের মতো যা তাই ধরেছে। সেইগুলিই কাজে আসছে আমাদের ছবিতে।'

শিল্পীর এই সাধনা একি সহজ ব্যাপার! প্রাণভরে চোখ মেলে দেখা আর সেই দেখাকে মনের ফুটন্ত রসে ভিজিয়ে রূপ সৃষ্টি করা এ যে অগ্নিজ্বালা তপস্যা। এই সাধনায় সফল, হতে প্রত্যেক শিল্পীকে তিনটি মহলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রথমে যে মহলে শিল্পী পৌঁছয় সেখানে অল্প রঙের খেলা। একটু রঙ ছিটানো এতে ওতে। সেই অল্প রঙের খেলাতেই শিল্পী ওঠে মেতে। তার পরে এই মত্ততা কেটে গেলে যে মহলে শিল্পী পৌঁছয় গিয়ে সেখানে রঙ ও সাজসজ্জা যেমন অঢেল তেমনি তাদের উৎকর্ষতা। তার পরে শিল্পী যখন শিল্পের একেবারে ভিতরের মহলে, তার প্রাণের মহলে গিয়ে পৌঁছয় সেখানে বাহিরের সব রঙ্ শেষ হয়ে গেছে, ভিতরে রঙের আভায় ছবি জ্বল্‌জ্বল্ করছে। এখানে পৌঁছে শিল্পী ধন্য হয়। প্রত্যেক শিল্পীকে তার শিল্প-সাধনার এই তিনটি মহলের মধ্যে দিয়ে শিল্পের পরিণতিতে পৌঁছতে হয়। রসের গাঢ়তা রূপের গাম্ভীর্যে ও বাইরের নিরাভরণতায় আপনাকে প্রকাশ করে। রঙের চটুলতা স্তব্ধ হয়ে যায়। অবনীন্দ্রনাথ একে 'আর্টের তিনটি সোপান' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন—'ছেলে ছোকরারা আঁকে দেখবে—দেয়ালি পট, ঝাড লণ্ঠন, একটু রঙ রেখা, ভুলে গেলো তাতেই। তার পরে এল রসের প্রৌঢ়তা, যেমন মোগল আমলে আর্টের মধ্যে দেখি,—তাদের রঙ সাজসজ্জা, সে কি বাহার। তার পরে সেই বাহার দেখে পৌঁছল গিয়ে রসের আরো উঁচুধাপের আর্ট, তবে এল বাইরের রচ-চঙ ছুট ছবি সমস্ত, যেন মেঘলা দিনের ছায়া, স্নিগ্ধ গম্ভীর। আর্টের এই কয়টি সোপান মাড়াতে হবে, তবে হয়তো আর্টিস্ট বলতে পারবো নিজেকে।'

অন্যের করুণার উপর নির্ভর ক'রে যেমন মুক্তি নেই, নিজেই সাধনার আগুনে সমস্ত বন্ধনের শিকল পুড়িয়ে দিয়ে যেমন মুক্তি, শিল্পী-হওয়া-ছবি-আঁকার মুন্সিয়ানা তেমনি নিজের সাধনার উপর নির্ভর করে। ভক্তিযোগের নিবীর্যতার পথে কৃপায় মুক্তি নেই, মুক্তি জিতে

নিতে হবে নিজেকে, গুরু শুধু পথের ইঙ্গিত দিতে পারে, পথ কিন্তু আমাকেই চলতে হবে। ঠিক তেমনি, গুরু ছবি আঁকার কৌশল বাতলে দিতে পারেন, কিন্তু পৃথিবীর দিকে দেখতে হবে নিজের চোখ দিয়ে, সেই দেখাকে নিজের মনের রঙ্ সায়রে ডুবিয়ে নিতে হবে, নিজের দৃষ্টিশীল মন দিয়ে বাহুল্য বর্জিত করতে হবে, সব শেষে নিজের হাত দিয়ে আঁকতে হবে। কারো করুণার ফলে কিংবা প্রসাদগুণে সৃষ্টি নেই, সৃষ্টি নিজের সাধনা ও তপস্যার ফল। দেখার রঙমহলে মন যা দেখলো, প্রাণের অন্দরমহলের রসসরোবরে ডুবিয়ে তাকেই রসের অভিষেক দিলো, তার পরে বাইরের রূপলোকে তাকে রেখার দ্বারা প্রকাশ করলো। এই সবটাই একান্তভাবে শিল্পীর নিজের প্রয়াস। সৃষ্টি-প্রয়াসে শিল্পীর মনের যে দুঃসাহসিক অভিসার আছে, সেই অভিসার তার হয়ে কেউ করে দিতে পারে না, তার দুঃখ বেদনা, আনন্দ তাকেই নিতে হবে পুরোপুরি।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা শেখা সম্বন্ধে তাই বলেছেন—'মানি যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে একটা নির্ধারিত সময় লাগে— তারপরে, ব্যাস, উড়ে যাও, হাঁসের বাচ্চা হও তো জলে ভাস। ছবি আঁকবে তুমি নিজে, তুমি যে রকম গাছের ডাল দেখছো তাই এঁকেছো। মাষ্টার মশায়ের মতন ডাল আঁকতে যাবে কেন? তরকারিতে নুন বেশি হয়, ফেলে দিয়ে আবার রান্না করো। ছবিতেও ভুল হয়—ফেলে দিয়ে আবার ছবি আঁকো। আমি হলে তো তাই করতুম। ছবিতে আবার ভুল শুধরে জোড়া তালা দেওয়া, ও কি রকম শেখানো?

গাছের ডালটা এমনি হবে, পা-টা এমনি করে আঁকতে হবে এরকম করে শেখাবার আমি মোটেই পক্ষপাতি নই। আমি নন্দলালদের অমনি করেই শিখিয়েছি। আর্টিস্ট চিরদিনই শিখছে, আমার এখনো বছরের পর বছর শেখাই চলেছে।'

শিক্ষকের কাজ হচ্ছে ছাত্রকে সাহস দেওয়া, ছাত্রের দৃষ্টি দিয়ে বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করা। নিজের দেখা ছাত্রের ঘাড়ে চাপিয়ে যে দেয় সে গুরু নয়, কেন না সে ছাত্রের সৃষ্টি-উৎসের মুখে পাথর চাপা দেয়, ছাত্রের কল্পনাকে পেছিয়ে দেয় ধাক্কা মেরে, যে ব্যক্তিগত স্বকীয়ত্বের ভিত্তিতেই আর্ট সৃষ্টি হয় সেই বিশেষ দেখাকে আঘাত করে। যেমন পরের মুখ দিয়ে নিজের পেট ভরানো যায় না, তেমনি অন্যের চোখ দিয়ে সৃষ্টিকে দেখা যায় না।

আর্টের শিক্ষকতা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ চমৎকার কতকগুলি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—'একবার কি হয়েছিল বলি। নন্দলাল একখানা ছবি আঁকলো 'উমার তপস্যা'। বেশ বড় ছবিখানা। পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে উমা শিবের জন্যে তপস্যা করছে, পিছনে মাথার উপর সরু চাঁদের রেখা। ছবিখানিতে রঙ বলতে কিছু নেই, আগাগোড়া ছবিখানায় গৈরিক রঙের অল্প অল্প আভাস। আমি বললুম,'নন্দলাল, ছবিতে একটু রঙ দিলে না? প্রাণটা যেন চড়বড় করে ছবির দিকে তাকালে। আর কিছু না দাও অন্তত উমাকে একটু সাজিয়ে দাও। কপালে চন্দনটন্দন পরাও, অন্তত একটা জবা ফুল।' বাড়ি এলুম রাত্রে আর ঘুম হয় না। মাথায় কেবলই ঘুরতে লাগলো, আমি কেন নন্দলালকে বলতে গেলুম ও-কথা? আমার মতন ক'রে নন্দলাল হয়তো উমাকে দেখে নি। ও হয়তো দেখেছিল

উমার সেই রূপ, পাথরের মতো দৃঢ়, তপস্যা করে রঙ রস সব চলে গেছে। তাই তো উমার তপস্যা দেখে বুক ফেটে যাবারই কথা। তখন আর সে চন্দন পরবে কি? ঘুমোতে পারলুম না, সকাল হতেই ছুটলুম নন্দলালের কাছে। ভয় হচ্ছিল পাছে সে রাত্রেই ছবিখানাতে রঙ লাগিয়ে থাকে আমার কথা শুনে। গিয়ে দেখি নন্দলাল ছবিখানাকে সামনে নিয়ে বসে রঙ দেবার আগে আর একবার ভেবে নিচ্ছে। আমি বললুম,'কর কি নন্দলাল, থামো, থামো, কি ভুলই আমি করতে যাচ্ছিলুম। তোমার উমা ঠিকই আছে। আর হাত লাগিও না।' নন্দলাল বললে, 'আপনি বলে গেলেন উমাকে সাজাতে। সারারাত আমিও সে কথা ভেবেছি, এখনো ভাবছিলাম রঙ দেবো কি না।'

'কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলুম বল দেখি। আর একটু হলে অতো ভালো ছবিখানা নষ্ট করে দিয়েছিলুম আর কি! সেই থেকে খুব সাবধান হয়ে গেছি। আর এটা জেনেছি যে, ছবি যার যার নিজের সৃষ্টি, তাতে কেউ উপদেশ দেবে কি!'

কলাসৃষ্টির বন্ধুর পথে যারা যাত্রা শুরু করবেন, সেই সব যাত্রী যেন শিল্পগুরুর এই কথাগুলি মনে গেঁথে নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। নবীন যাত্রীদের যারা পথের ইঙ্গিত দেবেন, সেই গুরুরা যেন এই খাঁটি গুরুর উপদেশ মনে রেখে নিজেদের অহংকারকে সংযত করেন. তবেই তাঁরা গুরু হবার অধিকার লাভ করবেন।

এই যে রূপসৃষ্টি এর বৈচিত্র্য আসে কোথা থেকে? শিল্পীর মনে সৃষ্টি করবার এতো উৎসাহ, এতো অফুরন্ত উদ্যম আসে? শিল্পীর মনের ভাব যেটিকে সে রূপ দিতে চায়, সেই ভাবের সঙ্গে শিল্পী যেটা রূপে বাঁধলো অর্থাৎ তার সৃষ্টির যে পার্থক্য, তার থেকে আসে এই বৈচিত্র্য। শিল্পীর ইচ্ছে যে একটি ভাবনা, এই ধারণাটিকে সে রেখায় ফুটোবে। ফুটলো না তা, হল অন্য কিছু। শিল্পীর মনের ভাবনার সঙ্গে শিল্পী যেটাকে সৃষ্টি করলো তার তফাত থেকে গেলো। এই যে অমিল, ভাবের সঙ্গে প্রকাশের এই অমিলই নব নব প্রকাশের উৎস, বৈচিত্র্যের উৎস। ভাবের বেগ অবাধ গতি পায় না, বাইরের কত শত বাধা এসে তার গতিকে ঘুরিয়ে দেয়, তাকে সোজা এগিয়ে না যেতে দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে নিয়ে যায়। তাই যে ভাব ফোটাতে চায় শিল্পী তা ফোটে না, অমনি মনে জাগে অপূর্ণ সৃষ্টির ব্যথা, নবসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা।

শিল্পীর ভাবনা বাইরের এই বাধা পায় বলেই বৈচিত্র্য দেখা দেয় সৃষ্টিতে। শিল্পী যে রূপ কল্পনা করেছিল, আঁকার পরে দেখলো সে সৃষ্টির রূপ আলাদা। শিল্পী আবার তখন চেষ্টা করে মনের ভাবকে বাইরে রূপ দিতে।

মানস ও ইচ্ছার মধ্যে এই যে অমিল এ সম্বন্ধে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুকে অবনীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে ভারী সুন্দর ক'রে বুঝিয়েছেন। তিনি লিখছেন—'মূল মানস বা ভাবনা যদি ঠিক থাকে তার মাঝের রাস্তা সোজা না হয়ে যদি নানা আঁকাবাঁকা পথে চলে তাতে বড় একটা আসে যায় না। সব গাছেরই ইচ্ছা সোজা গিয়ে আগায় ফুল ধরায়। কিন্তু ইচ্ছা পূরণের কালে চারিদিকে নানা ধাক্কা সয়ে চলতে হয় বলে সব গাছ তালগাছ হয়ে ফল ধরায় না—কেউ লতিয়ে যায়, কেউ হেলে পড়ে কেউ জড়িয়ে যায়।.......ইচ্ছার বেগ যে অবাধ গতি পায় না তাতে করে সৌন্দর্য্য হানি হয় না বরং বৈচিত্র্য বাড়ে........তাতে

করে একই রস নানা ছন্দে ব্যক্ত হয়ে যায়। মানস এবং ইচ্ছা—এর মধ্যে মানস ফোটার বাধা যদি না থাকতো তো ছবি হয়ে যেতো জাদুবিদ্যের কাজ। ফু: দিলেন আর ছবি হল—ক্যামেরা কতকটা এই ভাবে ছবি লেখে। যেমন ইচ্ছা তেমনটি আঁকা হয় না, বলা হয় না, গাওয়া হয় না। সেই জন্যই বারে বারে নতুন নতুন করে বলার আগে, গাওয়ার ইচ্ছা আসে, আঁকার ইচ্ছা হুবহু পূর্ণ হলে রূপকারের বিপদ—তার নিজের খেলা বন্ধ হয়, লীলা সাঙ্গ হয়।'

ইচ্ছা বাধা পায় বলেই বৈচিত্র্য আসে। ভাবপ্রকাশ ও ইচ্ছা যদি রসসৃষ্টির মধ্যে পূর্ণ হত তা হলে রূপকারের সৃষ্টি লীলা শেষ হত, যেমনি ভাব এল অমনি সে ভাব পরিপূর্ণ প্রকাশ নিজেকে ধরা দিতো। এমনি করে ভাব ধরা দেয় না কখনো।

কিছুটা তার বাঁধা পড়ে প্রকাশে, তাই শিল্পী আবার পাগল হয়ে মরিয়া হয়ে পড়ে অ-ধরা ভাবকে রূপে বাঁধবার জন্যে।

মনের মধ্যে প্রকাশের এই অপূর্ণতা বোধ শিল্পীকে পাগল ক'রে তোলে। এই হল শিল্পীর জীবনের সৃষ্টিবেদনা।

সৃষ্টির এই বেদনার কথা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'কি দুঃখ যে পেয়েছি আমি আমার ছবির জীবনে। যা ভেবেছি, যা চেয়েছি দিতে পেরেছি? যে রঙ, যে রূপরস মনে থাকতো, চোখে আসতো, যখন দেখতুম তার সিকি ভাগও দিতে পারলুম না, তখনকার মনের অবস্থা, মনের বেদনা অবর্ণনীয়। চিরকালটা এই দুঃখের সঙ্গে যুঝে এসেছি।.....প্রাণে কেবলই একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। কিছুতেই মনে হয় না যে, এবারে ঠিক হল যেমনটি চেয়েছিলুম।'

চিরকাল এই বেদনার পথ ধরে চলেছে মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টি, এই অপূর্ণতার বেদনার তাগিদে এসেছে রূপের বৈচিত্র্য। এই বেদনা না থাকলে কলাসৃষ্টির স্রোত স্তব্ধ হয়ে যেতো মানুষের প্রাণে।

এমনি করে তাঁর শিল্পসাধনার কথা আমাদের সামনে ধরে দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'এই হল শিল্পীর জীবনের ধারার একটু ইতিহাস। শুধুই উজান-ভাঁটির খেলা। উজানের সময় সব কিছু সংগ্রহ করে চল্‌তে চল্‌তে ভাঁটার সময়ে ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে দিয়ে যাওয়া। বসন্তে যখন জোয়ার আসে, তখন ফুল ফুটিয়ে ভরে দেয় দিক্-বিদিক্। আবার ভাঁটার সময় তা ঝরিয়ে দিয়ে যায়। আমারও যাবার সময়ে দুধারে যা ছড়িয়ে দিয়ে গেলুম তোমরা তা থেকে দেখতে পাবে, জানতে পাবে, কত ঘাটে ঠেকেছি, কত পথে চলেছি, কি সংগ্রহ করেছি ও সংগ্রহের শেষে নিজে কি বকশিশ পেয়ে গেছি।

এতকাল চলার পরে বকশিশ পেলুম আমি তিন রঙের তিন ফোঁটা মধু।'

বাংলার লোকসংগীত

লোকসংগীত সম্বন্ধে চলতি ধারণা হচ্ছে এই যে লোকসংগীত শুধু আধ্যাত্মিক কিংবা ধর্ম সম্বন্ধীয় ভিত্তিতে রচিত হয়, আটপৌরে জীবনের কথা এতে কিছু নেই—শুধু দেহতত্ত্বই এর অঙ্গ। লোকসংগীতের মূল কথাটা আমরা জানিনা বলেই এমন ভুল ধারণা করে থাকি। লোকসংগীত বুদ্ধিজাত গান নয়, জীবনের সব কিছু আটপৌরে ব্যাপার এতে জড়িয়ে আছে। যা কিছু সাধারণ মানুষের মনকে নাড়া দেয়, জীবনের মুখোমুখি হয়ে সে যা কিছু দেখেছে, অনুভব করেছে, সে-সবকেই মানুষ সুরের বাঁধুনি দিয়ে গানের রূপ দিয়েছে। সুরের দিক থেকে লোকসংগীত রাগ-রাগিণীর বাঁধন-মুক্ত। অনেক দিন থেকে চলে-আসা গান গাইবার বিশেষ ভঙ্গীটি লোকসংগীতের বিশেষত্ব। তাছাড়া এটাও মনে রাখতে হবে যে লোকসংগীত তালপ্রধান নয়, ছন্দপ্রধান। আর সে ছন্দটা কথার ভাবকে অনুকরণ করে বয়ে চলে।

বাংলাদেশে অনেক রকমের, বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীত বর্তমান ; যেমন, ঘাটুগান—রাধাকৃষ্ণের গান, সারি—মাঝির গান, জারি—চাষীর গান, ভাটিয়ালি, ব্রতের গান, বাদ্যানির গান, পার্বনের গান, জোট্‌গান, বান্ধাগান—বিয়ের সময়ে গাওয়া হয়, লালন বা ঘুমপাড়ানি গান , এইরকম বহু ধরণের লোকসংগীত আমরা বাংলার অতি সাধারণ মানুষের মুখে শুনে থাকি।

ইউরোপেও কয়েক রকমের লোকসংগীতের অস্তিত্ব আমরা পাই ; যেমন, রাতের পাহারাদারের গান, সৈনিকের গান, চাষীর গান, কারিগরদের গান।

এদের এই গানগুলি আর বাংলাদেশের গানগুলি পাশাপাশি রেখে বিচার করলে আমরা অতি সহজে বুঝতে পারি যে সর্বদেশের সাধারণ মানুষের অন্তরে একই ধরণের সুর বাজে। দেশ, জাতি ধর্ম, সমাজ সব কিছু এদের আলাদা হলেও সহজ অনুভূতির ক্ষেত্রে সব দেশের সাধারণ মানুষের অন্তরের যন্ত্র একই সুরে বাঁধা।

ইউরোপীয় লোকসঙ্গীতের চরিত্র হলো এই যে এটা নিছক মেলডিমূলক, হার্মনির কোন আভাষ এতে নেই।—সুরের ঐশ্বর্য নেই, সাধাসিধে, শুধু মেলডির ওপর এটা বেঁচে রয়েছে। হার্মনি অনেক পরে সুর-স্রষ্টা হ্যান্ডেল-এর সময় থেকে সুরু হয়েছে। ইউরোপীয় লোকসংগীতে বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয় গানের পদগুলিকে। আর শুধু নাচবার আর গাইবার জন্য ইউরোপীয় লোকসংগীত গাওয়া হয়, যন্ত্রসংগীতের জন্য নয়।

প্রথম শতাব্দীতে আমরা প্লেন সঙ্‌স্‌ এর প্রচলন দেখতে পাই। এর উৎপত্তি

হয় ইহুদী সিনেগগ্ আর গ্রীক-গীর্জে থেকে। খৃষ্টীয় একাদশ শতক থেকে ব্যালাডের প্রচলন সুরু হোলো।

জার্মাণীতে লোকসংগীতের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। বিখ্যাত লোকসংগীত রচয়িতা ডেপেজ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। তবে বর্তমানে খাঁটি লোকসংগীত বলতে যা বোঝায় ইউরোপে তা মেলা ভার হয়ে পড়েছে। আগাগোড়া একই ধাঁচের একটি সম্পূর্ণ লোকসংগীত প্রায় পাওয়াই যায় না। এখান থেকে ওখান থেকে লোকসংগীতের সুরের টুকরোগুলো নিয়ে গুচ্ছ করে করে 'হারমোনাইজেশন্' করা হয়েছে। বর্তমান হার্মনি বাদ দিয়ে লোকসংগীতের আসল মেলডিটুকু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বেটোফেনের সিম্ফনিতে পর্যন্ত নানারকম লোকসংগীতের সুর মিশে গেছে। সর্বদেশেই এখন হয়েছে এই নকলনবিশী যুগের ফরমাসী লোকসংগীত। তার আসল প্রাণশক্তি হারিয়ে গেছে এই নকল যুগের নকল আবহাওয়ায়—এখন নকল লোকসংগীত ড্রইংরুমের অবসর-বিনোদনের খোরাক জোটাচ্ছে। সে-গানে না আছে মাটির সুরভি, না আছে আকাশের ছোঁওয়া, না আছে নদীর বুকের ঢেউ-এর কম্পন। ড্রইংরুমের নকল গলায় নকল সুরের মধ্যে ক্রমশঃ এ নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। আগে বাংলা দেশে শহুরে শিক্ষিতদের মধ্যে কিন্তু লোকসংগীতের প্রতি এতটা অনুরাগ দেখা যায়নি। গেঁয়ো গানের কথা ভদ্র সাহিত্যে গণ্য করার প্রয়োজন কেউ বোধ করেনি। এদিক দিয়ে আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী—তিনিই প্রথম সাহিত্যে লোকসংগীতের সাদর আসন দেন। লোকসংগীতের ঐশ্বর্য ও ভাবের গভীরতা যা তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল তিনি সর্বপ্রথম তা তুলে ধরে দেন আমাদের কাছে। তাঁর রচিত বহু সংগীতে লোকসংগীতের সুর ও ঢঙ বর্তমান। যাহোক সেই থেকে লোকসংগীত আর হরিজন হয়ে রইল না—একেবারে ভদ্র পঙক্তিতে সসম্মানে উঠে এল। আর আজকাল তো এটা ফ্যাসানের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এখন পূর্ববঙ্গে প্রচলিত কয়েকপ্রকার লোকসংগীত নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রথম হচ্ছে বাউলের গান। বাউলগানের ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বাঙলা ভাষার আউল বাউলের গানে...ঝরণার জলে নুড়ির মতো হসন্ত শব্দগুলো পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুনঠুন্ শব্দ করিতেছে। ভদ্র-সাহিত্য-পল্লীর গম্ভীর দীর্ঘিকার স্থির জলে সে হসন্তের ঝঙ্কার নেই। আর সেই জন্যই সাধুভাষায় ছন্দটা যেন মোটা ফাঁকওয়ালা জালের মতো, আর অসাধুটির একেবারে ঠাসা বুনুনি।"

ভাবের দিক থেকে বাউলগান মোটেই ধর্মসংগীত নয়। বাউল চায় মনের মানুষকে, ব্রহ্মাকে নয়। প্রাণ তার কাঁদছে 'মনের মানুষের জন্যে. পরব্রহ্মের জন্যে নয়। বাউল গান আধ্যাত্মিক কিন্তু ধার্মিক নয়—একেবারে ধর্ম-নিরপেক্ষ গান—বরং তাকে মানবধর্মের গানও বলা চলতে পারে। এতে রয়েছে দরদীয়া মনের মানুষের সাধনা। এই সহজ সাধনে, ধর্মের সংস্কারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে হিন্দু মুসলমান সবাই এসে মিলছে। তাই বাউল গেয়েছে—

"তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
তোমার ডাক শুনি সাঁই—চলতে না পাই
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে।"

বাউল গানের এই বিশ্বজনীনতা আর কোন দেশের লোকসংগীতে নেই। সুরের দিক থেকে বাউল রাগরাগিণীর বন্ধনমুক্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বৈঠকী গানের গা ঘেঁষিয়া গিয়াও তাহাকে স্পর্শ করে না।" এখন দেহতত্ত্বের ওপর রচিত বাউল গানের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। গানটি শরৎদাসের রচনা, ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত।

"সে দ্যাশের কথারে মন ভুলে গিয়েছে।
উর্দ্ধপদে হেঁট মুন্ড সে দেশে মন বাস কইর্যাছে
সে দ্যাশের কথা রে...
বিন্দুরূপে মস্তকে ছিলে, ফলভাবে গর্ভবাসে প্রবেশ করিলে
শুক্রে শোনিতে মিশে তাইতে আকার ধরেছ
সে দ্যাশের কথা রে...
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমেতে
পঞ্চমাসে পঞ্চ আত্মা বৈদিক দেহেতে
সপ্তমমাসে গুরুর কাছে মহামন্ত্র লাভ কইরেছ
সে দ্যাশের কথা রে...
ও দীন শরৎ বলে, সাধনার বলে
অন্ধকার কারাগার হতে কেমন করে এলে
তুমি মিছে মায়ায় রয়েছ ভুলে
যাওয়ার উপায় কি করেছ?
সে দ্যাশের কথা রে...

রাজসাহীতে প্রচলিত একটি বাউলগান ঃ

প্রেম করে সুখ হল না প্রেমের প্রেমিক না হলে।
আখ বলে চাবালাম বাঁশ, বাঁশের নাইকো কোন রস
কেবল শুধু গালের সর্ব্বনাশ,
রসগোল্লার স্বাদ কি পাবি চিটাগুড় খেলে।
কিঞ্চিৎ মধু পাবার আশায় হাত বোলালি বল্লাচাকেতে
শুধু বোল্লায় কামড়াইবার আশে।
ও তুই যাইবানা শুধু পাইবা না মধু
মধু বোল্লায় কামড়াবে,
গঙ্গাশানের ফল কি পাবি খালে ডুব দিলে।
যে জন প্রেমের ভাব জানে না, তার সাথে নাইরে লেনা-দেনা
কুমড়েরে কাটে মাটি, ছেলে করে পরিপাটি
কাঁচাসোনা রং ধরে না পুড়লে হবে পাকা সোনা
যে জন প্রেমের ভাব জানে না।

জারি গান ঃ মুসলমানদের কারবালা সংক্রান্ত হাসান-হোসেনের ব্যাপার নিয়ে এই গান সৃষ্টি হয়। জারি গানের সুর টানা আর সেই টানা সুরেতে ব্যথা-বেদনার ছায়া।

দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা নিয়ে হিন্দুরাও জারি ঢঙে বহু গান তৈরী করেছে, তবে সেখানে বেদনার ছায়া নেই। স্থায়ীয় ঘটনা নিয়ে, সাময়িক ঘটনা নিয়ে সেই গানগুলি বাঁধা। হিন্দুদের তৈরী জারির সুরের কোন বিশেষ কাঠামো নেই, মুসলমানদের তৈরী জারির কাঠামো আছে। মুসলমানদের জারি গানে মূল গায়েন গান আর একদল ধূয়ো ধরে। জারি গান গায় যারা তাদের 'বয়াতি' বলে।

বগুড়ায় প্রচলিত একটি জারি গান ঃ

আমার গান শুনে প্রাণ বাঁচেনা ভাই
ও মোর ছাবেরুদ্দিন বলিছে তাই
কোথায় যায়ে গানের জোগাড় পাই।
আমার মনে বড় বাঞ্ছা ছিলো গায়ান গায়ে সাদ মিটাই
দুই হাতে দুই খঞ্জুরী বাজাই।
ওস্তাদ আমার আক্‌বার্ আলী ভাই
তিনি তো ভাঙ্গে বলে নাই—আ, আ-হা-হা
একটা জাগার পুরুষ জলে নামিল
সে যে ডুব দিয়ে কন্যা হোল
সদাগর এসে তাকে ধরে নিল।
ওরে বারো বছরের মধ্যে নারীর, তিনটে সন্তান তার হোল
ফিরে নারী সেই ঘাটে এলো
সেই ঘাটে না এসে নারীরে আবার পুরুষ হইল।
সে সে পুরুষ হয়ে দ্যাশে চলে যায়,
তাহার মনে বলে হায় রে হায়
কি না করতে আর বা কী না হয়।
ওরে আমি পুরুষ হয়ে নামলাম জলে
কন্যা হয়ে উঠলাম নায়,
বারো বছর করলাম বাণিজ্য সদাই,
সেও তো বয়াতি সৎসমন্দ নয় বয়াতি বলো চাঁদ সভায়॥

এখন রাজসাহীর একটি **সারী গানের** দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক ; মজিদ মিঞা তার দিদিকে বলছে—তার বৌ বাগের বাড়ী যেতে চায়, বৌ ভাত রাঁধতে জানে না, কেবল পড়ে ঘুমোয় ইত্যাদি।

বউদি আমরার নাইওর যাইতো চায়—
রঙ্গিলা দিদি গো—বউদু আমরার নাই ওর যাইতো চায়
(দিদি গো) ভাত রাঁধতে জানে না বৌ ভাত যে পাকায়
আফুটা ভাত খাইয়া গুষ্টির প্যাট বুড়বুড়ায়।
(দিদি গো) আমার বৌয়ের নায় ভালো না, বৌ কি শরমায়
আলগা মানুষ দ্যাখলে বৌয়ে উঁকি মার‍্যা চায়।

(দিদি গো) আর একটা দোষ আছে বৌয়ের, বউ ক্যাবল ঘুমায়,
ঘুম দিয়া বৌ স্বপ্নের পরে নাওরের গীত গায়।
(দিদি গো) এ বৌ দিয়া কাজ চলবে না, কয় মজিদ মিএগায়,
নাক চুল কাট্যা কইর‍্যা দেই বিদায়।

এবার হচ্ছে **ভাটিয়ালি গানের** কথা ঃ ভাটিয়াল মুলুকের গান বলে নাম হোলো ভাটিয়ালি। গানের কথাগুলি বেশীর ভাগ উদাস-করা। বিরহ, ব্যথা, দুঃখ নিয়েই গানগুলি তৈরী। গানের সুর হোলো খুব টানা, বাঁধা তাল নেই, ভাবের ছন্দ নিয়ে গানের বুনুনি। যেখানে কথা আছে সেখানেও কথা সেরে ফেলে সুরের টানই বেশী। ভাটিয়ালির সুরে ঝিঁঝিট রাগের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

সুজন নাইয়্যারে.....
ক্যাম্‌নে যাবি তুই ভবের নদী বাইয়া।
(আরে) এত সাধের তরীরে বাইয়া
(ও তুই) নষ্ট করলি তুই বাইচ খেলাইয়া,
(ও তোর) কাম নদীর ঐ নোনা জলে
(নায়ের) তক্তা যাবে খইয়া।
(আরে) অনুরাগের গুণ টানিয়া
বাইনটি দেয় লাগাইয়া,
(ও তুই) ভক্তিভাবের গাব্‌ লাগাওরে
(নাওয়ে) জল উঠবে না বাইয়া।

এই তো গেল পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত গান, এখন উত্তরবঙ্গে প্রচলিত, ভাওয়াইয়া, গাড়োয়াল, চটকা, মইশাল প্রভৃতি গান নিয়ে আলোচনা করা যাক্‌।

ভাওয়াইয়া ঃ ভাবের থেকে ভাওয়াইয়া কথাটি এসেছে। মেচ, কোচ, পলিয়া এই উপজাতিদের জংলা সুর আর পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি এই দুই সুরের দুধারা মিশে ভাওয়াইয়া হয়েছে বলে মনে হয়। ভাওয়াইয়ার সুর টানা সুর, তবে গাওয়ার পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে গলাটাকে ভেঙে নিয়ে একটানা সুরের মাঝে যেন একটু একটু থমকা দেওয়া হয়। ভাওয়াইয়া গানের বেশীর ভাগ হচ্ছে আধ্যাত্মিক ও দেহতত্ত্বের গান। প্রধানতঃ কুচবিহার অঞ্চলের কোচ্‌ পোলিয়া উপজাতিদের মধ্যে এ গানের চলন। জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও রঙপুর অঞ্চলের ভাওয়াইয়া গান কিছু কিছু শোনা যায়।

কুচবিহারের **ভাওয়াইয়া** গান ঃ

ওরে জীবন, ছাড়িয়ে না যাস মোরে।
ওরে জীবন ছাড়িয়া গেলে আদর করবে কে মনটারে।
ও জীবন রে....
ভাই বল ভাতিজা বল রে সম্পত্তির ভাগী
আগে করবে ধনের আশা পিছে করবে গতি
ও জীবন রে...

ও জীবন রে কাঁচা বাঁশে খাট পালঙ্করে
শুকনা পাটার দড়ি
দুজনাতে কান্ধে করে নিয়ে শ্মশান ঘাটে বাড়ি
চিত্রগুপ্তর খাতা নিয়া রে, ওহো জীবন বেড়ায় বাড়ি বাড়ি।
পরমায়ু শ্যাষ হইতে হস্তে দিবে দড়ি
ওরে জীবন দুইজনাতে যুক্তি করে
(ওহো জীবন) আসলাম ভবের হাটে।
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলি নিধুয়া পাথারে।
ওরে জীবনরে ছোট হইতে পুষলাম তোরে দই ও দুগ্ধ দিয়া
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলি বুকেতে শ্যাল দিয়া।

ও জীবন, তুই আমাকে ছেড়ে যাসনে, তুই গেলে কে আমাকে আদর করবে? ও জীবনরে, ভাই ভাতিজা সবাই সম্পত্তির ভাগী, আগে ধনের আশা করবে, তার পরে যা করবার তা করবে। চিত্রগুপ্ত তার খাতা নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরছে, পরমায়ু ফুরোলে হাতে দড়ি দিয়ে সে টেনে নিয়ে যাবে। ওরে জীবন, তোতে আমাতে পরামর্শ করে তবে তো এইভবের হাটে এসেছিলুম, তুই জীবন আমাকে ছেড়ে চলে গেলি অকূল পাথারে। ও জীবন, কতো ছোট থেকে তোকে পুষলুম দই দুধ খাইয়ে, আর তুই আমার বুকে শেল হেনে ছেড়ে চলে গেলি।

রঙপুর অঞ্চলে গীত ভাওয়াইয়া—বারাইস্যা (তাল—কাহার্‌বা)

আরে ও ভাবের দোতারা
নবীন বয়সে মোরে করলি বাউদিয়া।
যখন দোতরা নিলাম হাতে,
নিষদ করে মোর পাড়ার লোকে,
নিষদ করে মোর দয়াল বাপভাই।
(দোতরা) তোর জন্য মোর গিরাম বাদী
থানায় দেয় এজাহারী
দারোগাবাবু হাতে দেয় দড়ি।
তুই দোতরা রাখিস মান
রূপা দিয়ে মুই বান্দবো রে কান
নয়া গাছের মাণিকরে কলা—

ও আমার দোতারা, আমার এই অল্পবয়সেই তুই আমাকে পাগল করলি। যখন তোকে হাতে তুলে নিলাম, পাড়ার লোক কতো মানা করলো, বাপভাই সবাই নিষেধ করলো। দোতারা, তোর জন্যে গ্রামের লোক আমার বিপক্ষে গেলো, দারোগাবাবুকে জানিয়ে আমার হাতে দড়ি পর্যন্ত দিলো। ও আমার দোতারা, তুই আমার মান রাখিস, তোর কান আমি বাঁধিয়ে দেবো রূপো দিয়ে।

গাড়োয়াল ঃ গরু চরাতে চরাতে রাখালের গান। এগুলোও ভাওয়াইয়া জাতের টানা

সুরের গান। কুচবিহারের গাড়োয়াল গানের নমুনা ঃ

(উকি) কাজল ভোমরা গরুর রাখোয়াল রে
মুই নারী কোলে বাছা ছাওয়া।
যে মোরে করিতো রে পার দান করিতাম গলার হার,
পার হইয়া জেবন করতাম দানো।
ও পারে বন্ধুর বাড়ী ই পারে মুই নারী
মধ্যে আছে চিরল নদীর ধারা।
বালুতে রান্ধিনু বালুতে বাঢ়িনু
জলেতে ভাসাইয়া দিলাম হাঁড়ি
বিয়ার সোয়ামি মইলে পরে হবো আঁড়ি।
প্রাণ-বন্ধুয়া মইলে রে পরে খাবো মাছ আর ভাত রে
না জানি সাঁতারো, না জানি পাহারো
না জানি ভুরা বাহিবারে অকুল দরিয়ায় কেমনে হবো পার
মুই নারী কোলে বাছা ছাওয়া।।

জয়জয়ন্তীর আভাস এতে আছে। তাল কাহার্‌বা, কাওয়ালী। গানটিতে পরকীয়া রসেরও নমুনা পাওয়া গেল।

ভ্রমরের মতো কাজল গরুর রাখাল, আমি নারী, কোলে আমার ছোট বাচ্ছা ; আমাকে যে পার করে দেবে, তাকে গলার হার দিতুম, পার হয়ে দিতুম আমার যৌবন। ওপারে আমার বন্ধুর বাড়ী, এপারে আমি নারী. মধ্যে বইছে নদীর ক্ষিপ্র জলধারা। আমি নদীর তীরে, রাঁধলুম, তারেই বেড়ে খেলুম, তারপরে হাঁড়ি ভাসিয়ে দিলুম নদীর জলে। বিয়ে করা স্বামী মরলে পরে খাব মাছ আর ভাত, যখন প্রাণের বন্ধু মরবে তখন বিধবা হবো। (কি রকম সাহস গ্রাম্যনারীর, কি বেপরোয়া কবুলতি প্রেমের!) সাঁতার জানিনা, সময়ের দিশাও হারিয়েছি, কলার ভেলাও বাইতে জানিনা। এই অকূল দরিয়া কেমন করে পার হবো. আমি যে নারী, কোলে যে আমার শিশু।

জলপাইগুড়ির একটি **মইশাল গান**—মোষ চরাতে রাখাল ছেলের গান।

মইশাল মইশাল কর বন্ধুরে
(ওরে) শুকনা নদীর কূলে হে
মুখখানি শুকায়ে গেছে চৈত মাইস্যা ঝামেলা।
প্রাণ কান্দে মইশাল বন্ধুরে।
আমার বাড়ীতে যাইও বন্ধুরে এই না বরাবর,
খাজুর গাইছা বাড়ী আমার পূব দুয়ার‍্যা ঘর।
প্রাণ কান্দে মইশাল বন্ধুরে।
আমার বাড়ীতে যাইও বন্ধুরে বসবার দিব মোড়া
জলপান করিতে দিব ও শাল ধানের চিড়া।
প্রাণ কান্দে মইশাল বন্ধুরে।

শালধানের চিড়া দিবরে বিন্দুধানের খৈও
(আজি) মোটা মোটা সফ্‌রী কলা গামছা পাতা দৈ ওরে
প্রাণ কান্দে মইশাল বন্ধুরে।

মইশাল বন্ধুর প্রতি মেয়ের উক্তি ঃ শুক্‌নো নদীর কূলে মুখখানি শুকিয়ে গেছে চৈত্রমাসের গরমে। ও মইশাল বন্ধু, তোমার জন্য প্রাণ আমার কাঁদছে। বন্ধু, তুমি এই সোজা পথ ধরে আমার বাড়ী যেও, বাড়ীতে আমার খেজুর গাছ আছে আর ঘর আমার পূবদুয়ারী। বন্ধু, যেও আমার বাড়ী, বসবার জন্য মোড়া দেবো, আর শাল ধানের চিড়ে দেবো জলপান করতে। শুধু যে শালিধানের চিড়ে দেবো তা নয়, বিন্দু ধানের খই দেবো, তার সঙ্গে দেবো মোটা মোটা সফরী কলা আর ঘন দৈ। মইশাল বন্ধু আমার প্রাণ কাঁদছে তোমার জন্য।

চট্‌কা গান ঃ 'চুটকি' কথার থেকে চটকা কথাটি এসেছে বলে মনে হয়। সব ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে এই গানগুলি তৈরী। সাধারণতঃ দেহতত্ত্ব ইত্যাদি চট্‌কা গানে নেই। সুর ও ছন্দের দিক থেকে চট্‌কা গানের সুর নাচুনে, তার গতি দ্রুত। জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রঙপুর আর বিশেষ করে কুচবিহারে এই গান শোনা যায়।

কুচবিহারের চট্‌কা গানের নমুনা তুলে দিই (তাল—গড়খেমটা) ঃ

(আজি) প্রেম জানে না রসিক কালাচাঁদ
আমার ঘুরি-ই পরে মনে
কতো দিনে বন্ধুর সনে হবি দরশন বন্ধুরে।
একলা ঘরে শুই-ই থাকি পালঙ্কেরই পরে
মন মোর **উড়াং বাইরাং** করে **(ছট্‌ফট্‌ করে)**
পালং হইতে মরার পালং
ক্যারৎ কি কুরুৎ কি কারাম কারাম করে রে
হায় হায় পরাণের বন্ধু রে।
আজ তোমার বাড়ী আমার বাড়ী
যাতি আসতে এতো দেরী
যাবো কি রবো আজ শুধাই করো মানা
হাটিয়ে যাতে নদীর জল
খাক্‌লু কি খুকলুং কি খলাল্‌ খলাল্‌ করে রে
হায় হায় পরাণের বন্ধু রে।
(ও বন্ধুরে) আমি তোমার আশায়
বোসয়্যা থাকি বটবৃক্ষের তলে
মন মোর উড়াং বাইরাং করে,
ফাল্গুন মাসে ম্যাঘের দিনে
টবুর কি টুবুর কি ঝপ্‌ঝপায়া পড়ে
হায় হায় পরাণের বন্ধু রে।।

ঘুরি-ই পরে মনে—এই অংশটিতে মূলতঃ ঝিঁঝিট, সুরট বা মল্লারের একটু আভাষ আছে। 'কতোদিনে বন্ধুর সনে হোবি দরশন বন্ধুরে'—গৌড়সারাং, ছায়ানট, বিলাওল-এর অবরোহী আভাষ আছে।

রসিক কালাচাঁদ প্রেম জানে না, তবু ঘুরে ফিরে বরাবর তাকে মনে পড়ছে। কতো দিনে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে, হায়রে বন্ধু। আমি একলা ঘরে পালংকের উপর শুয়ে থাকি, মন আমার ছট্‌ফটিয়ে মরে। পালঙ্ক আমার শব্দ করছে মড়ার খাটিয়ার মত, হায়রে বন্ধু আমার। তোমার বাড়ী থেকে আমার বাড়ী এতো দূরের পথ। আজ যাবো, না যাবো না, তোমাকে শুধাই। তুমি মানা করছ। নদীর ধার দিয়ে যাবার সময় নদীর ঢেউ গর্জন করে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। হায়রে বন্ধু আমার। ও বন্ধু, তোমার আশায় আমি বসে থাকি বট গাছের তলায়, ছট্‌ফটিয়ে মরে আমার মন। ফাল্গুন মাসে মেঘলা দিনে যখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ে কিম্বা খুব জোরে পশলা হয় তখন ফাল্গুনের সেই মেঘলা বেলায় তোমাকে মনে পড়ে। হায়রে বন্ধু আমার।

রঙপুরের চট্‌কা গান ঃ

> বাড়ী ছাড়িয়ে কোথাও যাও,
> দোহাই আল্লাটা মোর মাথা খাও,
> কালা মোরগটা অসুন বৈসাছে।
> কন্যা যখন তোর বাড়ীতে যাই
> কতো মানুষ মুই দেখতে পাই
> দৌড়া পলাই মুই পাটা বাড়ী মধ্যে (ও ও মোরি হায়রে)
> কন্যা আশা দিলি ফরসাইয়া দিলি
> কলার মোথাত্ মোর বসায়া থুলি
> সারা রাত মোর মশারে কামড়াইছে। (ও ও মোরি হায়রে হায়)
> আগুন নিগুনটা না বুঝিয়া
> ভাতের উতালটা দিলু ঢালিয়া
> সোনার গায়ে মোর ফোসা পইর‍্যাছে (ও ও মোরি হায়রে হায়)
> বিশ্বাস যদি না হয় তোর
> জামা তুলিয়া দেখেক্ মোর
> দ্যাড়টাকা স্যার ফেনাল্ ত্যাল দিসে। (ও ও মোরি হায়রে হায়)

প্রেমিক বলছে প্রিয়াকে ঃ বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাচ্ছো? আল্লার দোহাই, আমার মাথা খাও, যেও না। দেখছো না কালো মুরগীটা ডিমে তা দিতে বসেছে। ও কন্যে, যখন তোমার বাড়ী যাই কত লোক দেখি আমি দৌড়ে পালাই আমি বাড়ীর অন্য মহলে। হায়রে হায়। আমাকে কতো আশা দিলে, দিয়ে সব আশা ভেঙ্গে দিলে। তোমাকে দেখার জন্য সারারাত কলাগাছ চড়ে কাটালুম। সারা রাত আমাকে মশা কামড়েছে। হায়রে হায়। একেবারে না ভেবে চিন্তে তুমি ভাতের ফেন ঢেলে দিলে, তাতে আমার সোনার গায়ে ফোস্কা পড়েছে। হায়রে হায়। যদি বিশ্বাস না হয় তোমার, তাহলে জামাটা তুলে দেখো,

দেড়টাকা সের ফেনাইল মেখেছি গায়ে। হায়রে হায়।

দিনাজপুরের চট্‌কা গান ঃ

ডাল পাক করবে কাঁচা মরিচ দিয়া
গুরুর কাছে নেওগা মন্তর নিরালে বসিয়া
ডাল পাক কর রে।
ছোট বৌ চড়ায় ডাল মাঝলা বৌ ঝাড়ে
(হারে) বড় বৌ আসিয়া কাঠি দিয়া নাড়ে।
ডাল পাক কর রে।
(আমার) শ্বশুর করে ঘুসুর মুসুর
ভাসুর করে গোসা
(আজি) নিদয়া এলো স্বামী এসে ধরল চুলের খোসা,
ডাল পাক কর রে।
(আমার) শাশুড়ী আছে, ননদ আছে
আছে ভাগনা বৌ,
এমন করে মার মারিলো আইগ্যালো না কেউ,
ডাল পাক কর রে।—

বৌ-এর উক্তি ঃ কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ডাল রাঁধো আর নিরালায় বসে গুরুর কাছে মন্তর নাও। ছোট বৌ ডাল চড়ায়, মেজ বৌ ডাল ঝেড়েছে আর বড় বৌ এসে কাঠি দিয়ে ডাল নেড়ে দেখে। আমার শ্বশুর আমার নামে লাগলো, ভাসুর রাগ করলো আর আমার নিষ্ঠুর স্বামী এসে চুলের গোছা ধরে আমাকে মারলো। আমার শাশুড়ী আছে ননদ আছে, ভাগনে বৌও আছে কিন্তু এমন করে যখন মারলো আমায়, কেউ এগিয়ে এলো না আমাকে বাঁচাতে! কাঁচালঙ্কা দিয়ে ডাল রাঁধো।

এমনি করে লোকজীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রকে প্লাবিত করে বাংলার লোকসংগীতের বহুমুখী ধারা বয়ে গেছে যুগযুগান্তর ধরে। জীবনের এমন কোন প্রকাশ নেই যাকে গানের সুরের ফ্রেমে বেঁধে ধরেন নি বাংলার লোকসংগীত-রচয়িতারা। প্রতিদিনের আটপৌরে জীবন, সামাজিক জীবন, ধর্মের জীবন, ধর্ম-নিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক জীবন, সব কিছুর ছবি ধরা পড়েছে লোক-সংগীতে। সাধারণ মানুষের জীবনের সামাজিক ইতিহাস অনাগত কালের জন্যে ধরা রয়ে গেছে লোকসংগীতের অনেক গানে। এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, ভাবের সূক্ষ্মতায় ও পেলবতায়, এবং অনুভূতির গভীরতায় বাংলার লোকসংগীত রসোপলব্ধির যে অমরাবতীতে আমাদের নিয়ে যায় পৃথিবীর আর কোনো দেশের লোক-সঙ্গীত তার প্রত্যন্ত সীমার কাছাকাছিও আমাদের পৌছে দেয় না। তাই শুধু বাংলার মানুষের সামাজিক ইতিহাসের উপাদানের খনি হিসাবেই বাংলার লোকসংগীত মূল্যবান নয়, এই গানগুলি বাংলার রস-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর-দলন

স্রষ্টার চেয়ে টীকাকারদের সংখ্যা যে বেশী হবে এটা স্বাভাবিক। কেন না সৃষ্টি করতে লাগে কল্পনা, ধারণা জ্ঞান ও প্রেরণা, আর টীকা করতে জ্ঞানের দরকার থাকলেও, বেশীর ভাগ টীকায় যা পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে টীকাকারদের নিজের মত ও নিজের খেয়াল। এগুলিকে টীকাকার স্রষ্টার মত বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তাই রুজির ক্ষেত্রে টীকাদারের ঠিকদারির ফাঁদ থেকেই বাঁচাই যেমন খেটে খাওয়া লোকের কাম্য, সৃষ্টির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে টীকাকারদের ঠিকদারির ঘূর্ণি থেকে বাঁচাই হচ্ছে রস-দরিয়ার ডুবুরিদের লক্ষ্য। এ হুঁশিয়ারিটা বিশেষ করে এ যুগে খুবই দরকার, কেন না শুধু যে খাদ্য অখাদ্যের ব্যবসায়ীরাই বাজার ছেয়ে আছে তা নয়, জ্ঞান পণ্যের ও রসপণ্যের বণিকদের কোলাহলেও বাজার সরগরম। কিছু বেচতে গেলেই, খরিদ্দারদের সামর্থ্যের দিকে নজর দিতে হয়। রুচির বেশীর ভাগটাই হচ্ছে সামর্থ্য। বেশীর ভাগ লোক সামর্থ্যের অভাবে বেশী দাম দিয়ে জিনিষ কিনতে পারে না। তাই ব্যাপারীকে পাঁচমিশালি মাঝারি জিনিষই বেশী করে আনতে হয় বাজারে। রসের ক্ষেত্রেও খুব উঁচু দরের রস-সৃষ্টির জন্যে যে মূল্য দিতে হয় সে মূল্য বেশীর ভাগ লোকের অন্তরের মঞ্জুষায় সঞ্চিত নেই। তাই রসপণ্যের যারা ব্যাপারী তারা যে খরিদ্দার বুঝে সেরা জিনিষটাতে ভেজাল মিশিয়ে মাঝারি করে বাজারে চালাতে চেষ্টা করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক হলেও এটা যে দুঃখের সেটা স্বীকার করতেই হবে। কেন না অন্নে ভেজাল যেমন সাংঘাতিক আঘাত হানে, মনের অন্নে কুশ্রীর ভেজাল, নীচু সুরের মিশ্রণ তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম আঘাত হানে না।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেড়ে চলে যাবার অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর গানগুলির যে সর্ব্বনাশ হয়েছে তা দেখলে বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়। অথচ তাঁর অজস্র সৃষ্টির মধ্যে গানগুলিকেই তাঁর সেরা সৃষ্টি বলে মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সেই সেরা সৃষ্টিতে ভেজাল মিশানোর যে আসুরিক প্রয়াস চারদিকে দেখা যাচ্ছে তাতে ভয় যে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এত অল্পদিনের মধ্যেই যখন তাঁর গানের এই মর্মান্তিক অবস্থা, আরও কিছু বছর বাদে খাদের প্রাচুর্য্যে ও পীড়নে তাঁর গানের সোনা হয়ত একেবারে ঢাকা পড়ে যাবে।

এই নিদারুণ অবস্থা সৃষ্টির জন্যে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ কম দায়ী নন। বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের যে সব স্বরলিপি প্রকাশিত হয় তাতে একটি গানের যে

স্বরলিপি বের হয়েছে এক সময়ে, পরবর্ত্তীকালে সেই একই গানের অন্য সুরের স্বরলিপির বইয়ের নূতন সংস্করণে ছাপা হয়ে বের হচ্ছে। বিশ্বভারতীর সংগীত বিভাগের কর্তৃপক্ষের অমার্জনীয় অপরাধের ফলে এটা ঘটেছে।

এঁদের প্রত্যেকেই নিজেকে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির একমাত্র অধিকারী প্রমাণ করবার জন্য ও নিজের প্রাধান্য জাহির করবার জন্য ব্যস্ত। এঁদের নিজেদের মধ্যের লড়াইটা নিছক হাস্যরসেরই উপাদান যোগাতো যদি তাঁদের আত্মপ্রাধান্যের কলহ রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে এমন বিকৃত না করতো। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে তাঁদের সঙ্গীত বিভাগের মাতব্বরদের এই সর্ব্বনাশী খেলা যে কি করে বরদাস্ত করেন তা আমাদের ধারনার বাইরে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে এঁরা দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপিগুলি আর মানতে রাজী নন। এঁদের দম্ভ ও দুঃসাহসিকতা কিছুকাল থেকে শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া অনেক গানের সুর এঁরা বিকৃত করেছেন, দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপির বদল করে। এতো অগুনতি গান এঁদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে যে তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবুও যে তালিকা দিচ্ছি তার থেকেই সবাই বুঝতে পারবেন কি বেপরোয়া ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ধর্ষণ করা হচ্ছে— আর সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর ছায়া-আশ্রিত লোকদের দ্বারা।

১। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' এই গানটির স্বরলিপি ১৩৪২ সালে দিনেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন 'স্বরবিতানের' প্রথম খণ্ডে। ১৩৫৪ সালে স্বরবিতানের যে সংস্করণ বের হয় তাতে সুরটিকে পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। ১৩৫৬ সালের সংস্করণেও এই বদলানো সুরটি বজায় রাখা হয়েছে। অশালীনতার পরাকাষ্ঠা এই যে, দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপির বই হিসেবে 'স্বরবিতান' এখনও প্রকাশ করা হচ্ছে।

২। 'সখি আঁধারে একেলা ঘরে' এই গানটির দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপি ১৩৪৩ সালে 'স্বরবিতান' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৫ সালের দিনেন্দ্রনাথ কৃত সংস্করণেও এই গানের সুরটি অবিকৃত থাকে। ১৩৫৯ সালের সংস্করণে দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপিটি অদলবদল করে দেওয়া হয়। অবশ্য এই ক্ষেত্রেও দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপি বলে সেটা চালানো হচ্ছে।

৩। 'বন্ধু রহো রহো সাথে' গানটির দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপি 'স্বরবিতান' দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৯ সালের সংস্করণে এই গানের সুরটিকে বদল করে ছাপানো হয়।

৪। 'কোথায় যে উধাও হোলো' গানটির দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপি ১৩৪৩ সালে 'স্বরবিতান' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৫ সালের সংস্করণে সুরটি ওলট-পালট করে স্বরলিপি বের হয়। ১৩৫৯ সালের সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের ওপর অসীম করুণা দেখিয়ে ও দিনেন্দ্রনাথের ওপর কৃপা করে আবার ১৩৪৩ সালের সুরে ফিরে গেছেন এই মাতব্বরেরা।

৫। 'আমারে ডাক দিল কে' এই গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ১৩২৯ সালে 'নব গীতিকা' প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করেন, ১৩৩৭ সালের সংস্করণেও সুরটি বিশ্বভারতীর সংগীত বিভাগের অধীশ্বরদের কৃপা দৃষ্টি লাভ করে নি। 'নবগীতিকা'র ১৩৫৭ সালের

সংস্করণে সুরটির পরিবর্ত্তন করা হয়েছে।

৬। 'আমায় ভুলতে দিতে' গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ১৩২৪ সালে 'গীতলেখা' প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৩৪২ সালের সংস্করণেও সুরটি অবিকৃত ছিল। ১৩৬২ সালের সংস্করণে সুরটি বদলানো হয়েছে।

৭। 'অন্ধজনে দেহ আলো' এই গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ 'বৈতালিক' স্বরলিপি গ্রন্থে প্রকাশ করেন। ১৩৫৫ সালের দ্বিতীয় সংস্করণেও সুরাট অবিকৃত ছিল, ১৩৬২ সালের সংস্করণে দিনেন্দ্রনাথ কৃত গানটি স্বরলিপির এমন পরিবর্তন করা হয়েছে যে তাঁর স্বরলিপি বাতিল করা হয়েছে ললেই সত্য বলা হবে।

৮। 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' গানটির স্বরলিপি সংগীতবিদ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। এটি ১৩১৬ সালে 'প্রায়শ্চিত্ত'-এর স্বরলিপিতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে এই গানের সুরটি বহু পরিবর্ত্তন করা হয়েছে, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এই গানটির স্বরলিপির পরিবর্ত্তন দিনেন্দ্রনাথ ও অন্যের দ্বারা কৃত। দিনেন্দ্রনাথ আজ নেই, তাই তাঁর সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার যথার্থ্য বিচার করবার উপায় নেই, কিন্তু যে 'অন্য'টির কথা বলা হহয়েছে, সেই 'অন্য'টি কে তাঁর কি অধিকার আছে সুর বদল করবার সেটা জানতে ইচ্ছে করে, রবীন্দ্রনাথের ও দিনেন্দ্রনাথের জীবিতকালে কনক দাস এই গানটির যে রেকর্ড করেছেন সেটি প্রামান্য ধরা যেতে পারে। নূতন স্বরলিপির সংগে তার কোন মিল নেই।

৯। 'ওহে জীবন বল্লভ' ও 'প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী' এই দুটি গানের স্বরলিপি কাঙ্গালীচরণ সেন কৃত 'ব্রহ্ম সংগীত' স্বরলিপি'তে (১৩১১, ১৩১৮ সালে) প্রকাশিত হয়। ১৩৪৬ সালে 'স্বরবিতান' চতুর্থ খণ্ডে এই দুটি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করা হয়। কাঙ্গালীচরণ সেনের স্বরলিপির সুর তখনও বজায় থাকে। ১৩৫৮ সালে স্বরবিতান-এর সংস্করণে এই দুটি গানেরই সুর বিকৃত করা হয়েছে।

১০। 'আজি বহিতেছে বসন্ত' মোরে বারে বারে ফিরালে' 'অন্তরে জাগিছে অন্তর্যামি'— এই গানগুলির স্বরলিপি কাঙ্গালীচরণ সেন প্রকাশ করেন 'ব্রহ্ম সংগীত স্বরলিপিতে'। স্বরবিতান-এর ১৩৫৮ ও ১৩৫৯ সালের সংস্করণে এই গানগুলির সুর বদল করা হয়েছে।

১১। 'স্বরবিতান' প্রথম খণ্ডে চারটি সংস্করণের মধ্যে প্রথম সংস্করণে 'সে আমার গোপন কথা' গানটির অন্তরাতে 'প্রাণ আমার বাঁশী শোনে' ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে 'প্রাণ যে আমার বাঁশী শোনে' করা হয়। আবার চতুর্থ সংস্করণে (১৩৬১) 'যে' কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। গীত বিতানে তৃতীয় সংস্করণেও 'যে' কথাটি ব্যবহার করা হয়েষছ।

আর কত উদাহরণ দেবো? এরকম শত শত উদাহরণ দেওয়া যায়। বিশ্বভারতীর সংগীত বিভগের কর্ত্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরগুলির বিশেষত্ব, তাদের অপূর্ব্বত্ব, তাদের অনন্য সাধারণ মৌলিকত্ব ঘুচিয়ে দেবার জন্য মরিয়া হয়ে লেগে পড়েছেন। গ্রামোফোন কোম্পানী ও তাঁদের সুরদলনী লীলার অসুরক্ত সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের যে

গান রেকর্ড করবার অধিকার গ্রামোফোন কোম্পানী কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় করেন, সে অধিকার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্বৈরাচারে পরিণত হয়েছে। বিকৃত সুর ও বিকৃত উচ্চারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের বহু রেকর্ডে বিভীষিকা জাগিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে অর্থ রোজগারের উপায় স্বরূপ ব্যবহার না করে যদি তাঁর এই মহতী সৃষ্টির সত্য রূপটিকে অবিকৃত ও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় সকলের কাছে ধরে দেওয়া তাঁদের পরম কর্ত্তব্য বলে মনে করতেন, তাহলে গ্রামোফোন কোম্পানী অকিঞ্চিৎকর অর্থ দিয়ে যে অনর্থ সৃষ্টি করে চলেছে তা কবে বন্ধ হয়ে যেত!

রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর বিকৃতির জন্যে আমাদের রেডিও কর্তৃপক্ষও কম দায়ী নন। রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের গান যাঁরা গান তাঁদের বেশীর ভাগই তাঁদের মর্জি মত রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর একটু আধটু বদল করে গান। যেখানে তান আদবেই ছিল না সেখানে তান দিয়ে গান। এটা যে কত বড় অশ্লীলীনতা তা বলে শেষ করা যায় না। স্রষ্টার সৃষ্টির ওপর হাত চালাবার ও নিজের খেয়াল মত রঙ (কাদা!) লেপবার অধিকার কারো নেই। রবীন্দ্রনাথের গান তান দিয়ে ফেনিয়ে তোলার যে আসুরিকী লীলা সুরু হয়েছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে যা লিখেছিলেন দিলীপ রায়কে সেটিকে মানার দিক থেকে বেপরোয়া আধুনিকদের বাধা থাকলেও, জানার দিক থেকে আশা করি বাধা হবে না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'তুমি কি বলতে চাও যে আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনি ভাবে গাইবে? আমি তো নিজের রচনাকে সে রকমভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করতে অনুমতি দেই নি। .... যে রূপ সৃষ্টিতে বাইরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, আর যার পথ নেই তার অন্য নিয়ম। ..... হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকার তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন। ..... কিন্তু আমার গানেও আমি সে রকম ফাঁক রাখি নি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।'

এই হলো রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে তান দিয়ে ফেনিয়ে তোলবার যে হুড়োহুড়ি চলেছে তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের মত।

শুধু এই নয় আরও এক ধরণের ব্যভিচার শুরু হয়ে গেছে রাগ-রাগিনীর এলাকাভুক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গানগুলিকে নিয়ে। এ পর্যায়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথ রচিত বহু ব্রহ্ম সঙ্গীত। যেহেতু এই গানগুলি রাগ-রাগিনীর সুরলোকের বাসিন্দে কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞ তাই ধরে নিয়েছেন যে রাগের শাস্ত্রসম্মত পুরো বিস্তার করবার অধিকার তাঁদের আছে এই গানগুলিতে, বাহার রাগে বাঁধা রবীন্দ্রনাথ, 'আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে' গানটি উদাহরণ স্বরপ দেখা যাক। এই গানটি মূলতঃ বাহার রাগে হলেও রবীন্দ্রনাথ জায়গায় জায়গায় এমন দু-একটি স্বর যোজনা করেছেন যেগুলি রাগের দিক থেকে বিচার করে দেখলে শুদ্ধ বাহার রাগে লাগে না। তার কারণ হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ কখনো রাগ-রূপ সৃষ্টি করার কাজে লাগেন নি। তিনি সারা জীবন

একটি সাধনাই করে গেছেন, সেটি হচ্ছে গান সৃষ্টির সাধনা। গানের কাব্যাংশের বচনীয় ভাবটিকে অনির্ব্বচনীয় সুরের সঙ্গে মিলিয়ে একটি গান সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এক কথায় কথা ও সুরের অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়ে গান সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর সারাজীবনের সাধনা। এখন যদি কোন ওস্তাদ 'আজি বহিছে বসন্ত' গানটি মূলতঃ বাহার রাগে রচিত বলে গানটিতে বাহার রাগে শুদ্ধরূপ ফুটিয়ে তোলার কাজে কোমর বেঁধে লেগে যান তাহলে তাঁর দুঃসাহসের প্রচুর তারিফ করেও তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলিকে কখনো রাগরাগিনীর রূপ ফোটাবার আধার হিসেবে ব্যবহার করেন নি। সুরকে তিনি ব্যবহার করেছেন গানের কথার ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। তাঁর গান একলা সুরের অদ্বৈত প্রকাশের ক্ষেত্রে নয়। কথা ও সুরের দ্বৈত প্রকাশের লীলাভূমি তাঁর গান। তাই মূলতঃ বাহার রাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও ভাব প্রকাশের তাগিদে তিনি বাহারের বাঁধা-ধরা স্বর-নক্সার মধ্যে অন্য স্বর অসঙ্কোচে মিশিয়েছেন। সেইখানেই তাঁর সৃষ্টির বিশেষত্ব, তাঁর স্বকীয়ত্বের প্রকাশ, তাঁর গান সৃষ্টির অসাধারণত্ব। যে সঙ্গীতজ্ঞরা রবীন্দ্রনাথ রচিত গানগুলিকে তাঁদের বিশেষত্ব থেকে বঞ্চিত করবেন রাগরাগিনীর শুদ্ধরূপ ফুটিয়ে তোলার বাসনায়, তাঁরা রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিশেষত্বটুকুকে লোপ করে এক অনন্য সাধারণ গান-স্রষ্টার রচিত অসাধারণ সুরগুলিকে সাধারণ করে তুলবেন। এক কথায় এই সঙ্গীতজ্ঞেরা রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে শুদ্ধ রাগ-রাগিনীর ভাটপাড়ার বাসিন্দে করে তাদের জাতে তুলবেন বটে কিন্তু তাদের প্রাণে মারবেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের উদ্দেশ্য ও তাঁর সুর রচনার উদ্দেশ্য তো বারবার আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন— 'সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ কানে মিষ্টি শুনায়— তথাপি অনাবশ্যক ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবল মাত্র সুর সমষ্টি, ভাব না থাকলে জীবনহীন দেহমাত্র। সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন নাই।'

তিনি বলেছেন 'গায়কেরা সঙ্গীতকে যে আসন দেন আমি সঙ্গীতকে তদপেক্ষা উঁচু আসন দিই। তাঁরা সঙ্গীতকে চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাতে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলি সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁরা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।'

আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন 'যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুণ আমি পঞ্চমকে বহাল রাখিল কেন?'

আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনভোর সুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই পঞ্চমকেই বহাল রেখেছেন, রাগরাগিনীর কাঠামোর শুদ্ধতার বিচার নিয়ে তিনি আদবেই ব্যস্ত হয়নি, যেটি বলতে চেয়েছেন সেটি ঠিকভাবে বলা হোলো কিনা, তার ভাবটিকে যতদূর সম্ভব প্রকাশ করা গেল কি গেল না একমাত্র এইটেই ছিল তাঁর দেখবার বিষয় ও ভাববার বিষয়, আজ

তাই রাগ সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত তাঁর গানগুলিকে নিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট অভিমত বিশুদ্ধ প্রণালীতে বিকৃত করবার অভিযান চলেছে, আর বিশ্বভারতী এই সব গানগুলির বিকৃতকৃত সুরের স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন, আবার এটাও লিখে দিচ্ছেন যে আগেকার সুরটাও চলবে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুর আবার ওস্তাদের দ্বারা অধুনা বিকৃতকৃত সুরেও চলবে তখন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এই কথাটাই বলতে হবে যে, বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসঙ্গীতের কল্যাণ তো করছেনই না, বরঞ্চ তার অপূরণীয় ক্ষতি করছেন। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব তো শুধু বিশ্বভারতীর নয়, সে দায়িত্ব দেশবাসীর।

সে দায়িত্ব আমাদের পালন করতেই হবে। সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে গেলে সঙ্গীত ও সঙ্গীতের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ধারণাগুলি আমাদের জানা একান্ত দরকার। এখন তাই সঙ্গীত সম্বন্ধীয় তাঁর বিশেষ ধারণাগুলি ধরে দেবার চেষ্টা করবো।

তাঁর নিজের তৈরি গানের প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলছেন সেগুলি জানা থাকলে তাঁর গানগুলিকে থেঁতলাবার যে প্রক্রিয়া অধুনা একদল লোক চালিয়ে চলেছেন, হয়তো সেটা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বন্ধ হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি যে গান তৈরী করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সুরমুক্ত পুরুষভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে। কথাকে শরিফ বলে মানতে সে নারাজ। বাংলার সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়, সে যুগল মিলনের পক্ষপাতী।"

দিলীপ রায়কে তিনি লিখেছেন, "তুমি এটা কেন মানবে না যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিকাশ যে ভাবে হয়েছে, আমাদের বাংলা সঙ্গীতের ধারা সে ভাবে বিকাশ লাভ করেনি। এ দুটোর মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ আছে। বাংলার সঙ্গীতের বিশেষত্ব যে কি তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্ত্তনে পাওয়া যায়। কীর্ত্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে তো অবিমিশ্রিত সঙ্গীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্য-রসের আনন্দ এক হয়ে একাত্ম হয়ে মিলিত।"

এবারে তাঁর গানগুলি নিয়ে যথেচ্ছাচার করবার যে খুসমেজাজী স্বাধীনতা অনেকে নিয়ে থাকেন সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— আমার গানের বিকৃতি প্রতিদিন আমি এত শুনেছি যে আমারও ভয় হয়েছে যে আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়ত সম্ভব হবে না। ..... ললিত কলার সৃষ্টির স্বকীয় বিশেষত্বের উপরেই তার রস নির্ভর করে। গানের খেলাতে তাকে রসিক হোক, অরসিক হোক সকলেই আপন ইচ্ছামত উলটপালট করতে সহজে পারে বলে তার উপরে বেশী দরদ থাকা চাই। সে সম্বন্ধে ধর্মবুদ্ধি একেবারে খুইয়ে বসা উচিত নয়।

আশা করা যাক যে, তাঁর বেদনা-সিঞ্চিত এই কথাগুলি জানার পরে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি নিয়ে স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বিকৃত করবার অপকর্ম থেকে আমরা নিবৃত্ত হবো।

সঙ্গীতের একটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে তাল। কিন্তু এই তাল নিয়ে তাল ঠোকাঠুকি, গানের প্রাণকে তালের পদাঘাতে হত্যা করবার যে বীভৎস কাণ্ড ওস্তাদী গানের আসরে প্রায়ই চোখে পড়ে, সে যে সূক্ষ্মতম রসবোধের অধিকারী রবীন্দ্রনাথকে মর্মান্তিক পীড়া দেবে এটা সহজেই ধারণা করা যায়। তাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন— 'তাল জিনিযটা সঙ্গীতের হিসাব বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশী। সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াকড়িটা যখন বড় হয় তখড় দরকারটাই মাটি হতে থাকে। .... সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে সবচেয়ে দাঙ্গা এই তাল নিয়ে। গান বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই নিয়ে বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করেই বেড়ে ওঠে। স্বয়ং সঙ্গীত যখন পরবশ, তখন তাল বলে আমাকে দেখো, সুর বলে আমাকে।'

নিছক কৌশল জানা ওস্তদাদের হাতে পড়ে গান যে সুর ও তালের কসরৎ দেখানোর সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন— লাঠিয়ালের হাতে রাজদণ্ড দিলেও সে তা নিয়ে লাঠিয়ালি করতে চায়, কেন না রাজত্ব করা তার প্রকৃতিগত নয়। তাই ওস্তাদের হাতে সঙ্গীত সুর-তালের কৌশল হয়ে ওঠে। এই কৌশলই কলার শত্রু। কেন না কলার বিকাশ সামঞ্জস্যে, কৌশলের বিকাশ দ্বন্দ্বে।"

তিনি বলেছেন— "রসবোধের নাড়ী যখন ক্ষীণ হয়ে আসে, কৌশল তখন কলাকে ছাড়িয়ে যায়। ..... এদেশে গানের যখন ভরা যৌবন ছিল, তখন এমন সব ওস্তাদ নিশ্চয়ই সর্ব্বদা মিলত, গান গাওয়া যাঁদের স্বভাব, গানের পালোয়ানি করা ব্যবসা নয়। বুলবুলি তখনই গানের খ্যাতি পেত লড়াইয়ের নয়।"

সব সৃষ্টির মত গানও সংস্কারের শিকল পরে অচল হয়ে থাকতে পারে না। সংস্কারবদ্ধ সৃজনী শক্তিহীন ওস্তাদেরা তাঁদের অভ্যস্ত সংস্কারের বাইরের সব কিছুকে সন্দেহের চোখে, ভয়ের চোখে, এমন কি বিদ্বেষের চোখের দেখেন। তবুও নূতন সৃষ্টি হবে, মানুষ সংস্কারের পাষাণ সরিয়ে সৃষ্টির ঝরণাকে বারে বারে মুক্তি দেবে। গানের বেলাও সেই একই কথা। সংস্কারের এই অত্যাচার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "সরস্বতীকে শিকল পরালে চলবে না, সে শিকল তাঁরই বীণার তারে তৈরী হলেও নয়। ..... দস্তুর বুড়োটা নবীন প্রাণের খেয়াল সইতে পারে না। শাসনকে সে বড়ো বলে জানে, প্রাণকে নয়।"

কিছু লোকের ধারণা যে আমাদের ভারতীয় সঙ্গীত উৎকর্ষের এমন চূড়ায় পৌঁছে গেছে যার পর আর কোন শিখর তার চড়বার কিম্বা দখল করবার নেই। সৃষ্টিশক্তিতে দেউলে এই ভীরুদের রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিই। তিনি বলেছেন— "মহাদেব, নারদ এবং ভরত মুনিতে মিলে পরামর্শ করে যদি আমাদের সঙ্গীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়ে থাকেন যে আমরা তাকে কেবলমাত্র মানতেই পারি। সৃষ্টি করতে না পারি তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হয়েছে বলতে হবে।"

তাঁর এই সত্যবাণীও স্মরণ রাখার দরকার যে মানুষ কেবল স্থাবর ভাবে ভোগ করে না, সচল ভাবে সৃষ্টি করে।"

অতুলপ্রসাদের জীবন ও সৃষ্টি

ঊনবিংশ শতাব্দী। বাংলার জীবন-নদীতে তখন ভরা কোটাল। জাতির প্রাণের শুষ্কতা ও তার অন্তরের বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে রামমোহনের অগ্নীময়ী তপস্যার স্রোত। ফসলের যুগ তখন শুরু হয়ে গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জীবনে যে সৃষ্টির ফসল তখন ফলেছে তার তুলনা পৃথিবীর যে কোনো দেশে দুর্লভ। ধর্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, দেশব্রতী, রাজনীতিবিদ্, মহান বিপ্লব নায়ক, সাহিত্যিক, কবি, বিজ্ঞানবিদ—বাংলার জীবন-পথে তখন অসামান্য যাত্রীরা এসেছেন একের পর এক। কোথাও লেশ মাত্র দৈন্য নেই, বাঙালীর আত্মিক জগৎ তখন আলোয় আলোকময়।

গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেন পূর্ববঙ্গে অধুনা বাংলা দেশে তাঁর মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর তারিখে জন্মলাভ করেন। মাতামহ কালীনারায়ণ ছিলেন পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের নেতা, গীতিকার ও ভক্তসাধক। মাতুল কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, কে জি গুপ্ত নামে বাংলাদেশে সুবিদিত ছিলেন।

অতুলপ্রসাদের পিতা ডাক্তার রামপ্রসাদ সেন বাংলা, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে পারদর্শী হয়ে প্রথম জীবনে গ্রামের বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কাজ করেন। সেই কাজ তাঁর মন মতো না হওয়ায় প্রায় সম্বলহীন অবস্থায় কলকাতায় আসেন। কেমন করে জানি না তিনি কলকাতায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নজরে পড়েন। এই যুবকের বুদ্ধি, বিনয় ও চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে মহর্ষিদেব রামপ্রসাদকে মেডিকেল্ কলেজে ভর্তি করে দেন। ডাক্তারি পাশ করে রামপ্রসাদ ঢাকায় চিকিৎসক হিসেবে কাজ শুরু করেন। রামপ্রসাদ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। তিনি সুগায়ক ও কবি ছিলেন।

মাতৃকুল ও পিতৃকুল—এই দুই কূলের সাধনার ধারা যে অতুলপ্রসাদের জীবনের সঙ্গমে মিলিত হবে এটা তো স্বাভাবিক। অল্প বয়েস থেকেই অতুলপ্রসাদের চরিত্রে প্রকৃত ধার্মিকতা, কবিত্বশক্তি ও সঙ্গীত-অনুরাগ দেখা যায়। ঢাকার বিদ্যালয় থেকে এনট্রেন্স পাশ করে অতুলপ্রসাদ কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলেত যান ও ব্যারিষ্টার হয়ে ১৮৯৫ সালে দেশে ফিরে আসেন।

এই সময়ে তাঁর জীবনে একটি ঘটনা ঘটে গেলো যা তাঁর জীবনের একটি পরম সম্পদ বলে অতুলপ্রসাস চিরদিন মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলাদেবী অতুলপ্রসাদ কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। সেই সময়কার একটি ঘটনার উল্লেখ করে অতুলপ্রসাদ একটি চিঠিতে লেখেন—"আমার মনে আছে কোনো এক চায়ের নিমন্ত্রণে

কবি উপস্থিত ছিলেন, আমিও নিমন্ত্রিত সেখানে। তাঁর গান হয়। মনে আছে বড়ো ভালো লাগিয়াছিল তাঁর গান। সেই সময়ে আমার এক দুষ্ট বন্ধু তাঁকে বলিয়াছিলেন—দেখুন, অতুল গান করে এবং নিজেও কিছু কিছু গান রচনা করে—আমার তো তখন লজ্জায় সংকোচে পৃথিবী দ্বিধা হও ভাব। আমি প্রতিবাদ করিলাম, কবি শুনিলেন না। বলিলেন—সে তো ভালো কথা, আপনি নিজের রচিত একটি গান করুন। তখন ছিলাম 'আপনি' এবং 'অতুলবাবু', এখন সৌভাগ্যক্রমে হইয়াছি 'তুমি' এবং 'অতুল'।"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই প্রথম আলাপের যুগে অতুলপ্রসাদ একটি অনুষ্ঠানে গাইবার জন্যে একটি গান প্রার্থনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ তখন পারিবারিক দুশ্চিন্তায় জড়িয়ে থাকায় গানটি লিখে তাতে সুর দিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই গানটি অতুলপ্রসাদকে পাঠিয়ে লিখ্‌ছেন—"ইতিমধ্যে পরশু একটা নতুন গান রচনা করিয়া রাখিয়াছি—যদি পছন্দ করেন কীর্তনের সুরে বসাইয়া কাহাকেও দিয়া গাওয়াইয়া লইতে পারেন। সেই গানটি এই সঙ্গে পাঠাই।"

রবীন্দ্রনাথের সেই গানটিতে অতুলপ্রসাদ সুর দেন। পরে যখন অন্তরঙ্গতার যুগ শুরু হয়ে গেলো, গভীর শ্রদ্ধা ও পরম প্রীতির সম্পর্ক যখন স্থাপিত হল রবীন্দ্রনাথের ও অতুলপ্রসাদের মধ্যে, সেই পর্বের তিনটি চিঠির অমৃত-রস সকলের সঙ্গে উপভোগ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। অতুলপ্রসাদ লিখ্‌ছেন রবীন্দ্রনাথকে—"বাসনা ছিল যে কাহাকেও না জানাইয়া হঠাৎ আপনার জন্মদিনের মহোৎসবে উপস্থিত হইয়া আপনার চরণে মাথা ছোঁওয়াইব। কিন্তু কর্মের শৃঙ্খলে এমন আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে যাইতে পারিলাম না। আমি আপনাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছি। বঙ্গ-সাহিত্য-তীর্থের সর্বপ্রধান পুরোহিত, ধর্মে সিদ্ধ ও অগ্রণী, সংগীত-কুঞ্জের মনিব, বাংলার দুলাল এবং আমার পরম ভক্তিভাজনের চরণে আজ প্রণত হইতেছি।"

রবীন্দ্রনাথও যে কি গভীর প্রীতির বন্ধনে অতুলপ্রসাদকে বেঁধেছিলেন তা তাঁর ১৩৩৬ সালের ২৯শে আশ্বিন তারিখে লেখা থেকে সুস্পষ্ট। লিখ্‌ছেন—"আজকাল হাঙ্গারষ্ট্রাইক চল্‌ছে কিন্তু মৌনব্রত এখনো রাষ্ট্রনৈতিকেরা স্বীকার করেন নি—ব্যারিষ্টারদের তো কথাই নেই। তাই তোমার স্তব্ধতা দেখে মনে হচ্ছে যে ছুটিতে আছ বলেই এই বাকসংযম—অন্তত এখন তোমার বাক্যের সঙ্গে যথেষ্ট অর্থের সংযোগ নেই। মনে সংকল্প ছিল বিজয়া দশমীতে তোমাকে কবির আশীর্বাদ পাঠাবো—ঠিকানার অপেক্ষায় ছিলুম। তারিখ একাদশীতে এসে ঠেক্‌লো আর দেরি করবো না। বিশেষ কিছু নয় আমার গুটিকতক স্বরচিত বই—সম্পাদকের সমালোচনার জন্য নয়, সমজদারের সম্ভোগের জন্যে। শেষ বেলাকার ফসল সুতরাং আশা করি পাক ধরেছে, কিন্তু স্বাদ হয়েছে কি রকম তার বিচার তোমাদের পরে রইলো। অভিমত দাবি ক'রে বিপদে ফেলতে চাইনে—আমাদের শাস্ত্র মতে আহার কালে কথা কইতে নেই—কাব্য আস্বাদন কালেও সেই নিয়ম প্রচলিত থাকলে অশান্তির কারণ ঘটে না।"

১৯৩২ সালের ২৮শে মার্চ তারিখের লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদকে লিখলেন—"কল্যাণীয়েষু, উত্তরায় রবীন্দ্রনাথ নামক এক ব্যক্তির সম্বন্ধে যে কয়টি কথা লিখেছ তা পড়ে উক্ত নামধারী খুশী হয়েছেন। হবার কারণ এই যে অনেক কথা মনে পড়ে গেলো। খামখেয়ালী পর্বের একটা কথা বোধ হয় অযথা হয়েছে—সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালকে আমাদের মজলিশে পাবার সৌভাগ্য হয় নি। তুমি যে ব্যাপারের বর্ণনা

অতুলপ্রসাদের অনেক গানেই পরিলক্ষিত হয়।

অতুলপ্রসাদের প্রথম যুগের গানগুলিতে বাঙ্‌লার টপ খেয়ালের, রবীন্দ্র-সংগীতের ও বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালি প্রভৃতি বাংলার লোকসংগীতের সুরগুলির প্রভাব যথেষ্ট। টপ্‌খেয়ালের 'সোহাগে মৃণালভুজে' এই গানটির সুরে ও ঢঙে 'কেন যে গাহিতে বলে' গানটি বাঁধেন। ষোলোটি গান বাঁধেন বাউলের সুরে, যেমন, 'মন রে আমার', 'তোমায় ঠাকুর বল্‌বো নিঠুর', 'ভালোবাসা কত পাবি আর', 'হে অজানা আমি তোমায়'

করেছ সেটা প্রাক্-খামখেয়ালী যুগের। .....রামগড়ের সেই নির্জন আনন্দের স্মৃতি তোমার এই রচনার যোগে অন্তরে উদ্বোধিত হল। পলাতকা দিনগুলোকে ফিরে পেতে ইচ্ছে করে—সেদিনকার অমৃতের ভাণ্ডটা সুদ্ধ নিয়ে তারা দৌড় দিয়েছে। আমি পড়ে গেছি ভিড়ের মধ্যে—শান্তির স্নিগ্ধ রসের পাত্রটা উজাড় করে দিয়ে তার মধ্যে খ্যাতির ঝাঁঝালো মদ ভরে দিয়েছে।"

কলকাতায় থাকাকালীন জোড়াসাঁকোর মহর্ষি-ভবনে অতুলপ্রসাদের আনাগোনা ছিল অবিরাম। রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত 'খামখেয়ালী সভা' ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্গীত-সমাজ'-এর সঙ্গে অতুলপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পরে লক্ষ্ণৌকে তাঁর কর্মক্ষেত্র বাছাই করে নিয়ে অতুলপ্রসাদ কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন। চল্লিশ বছরেরও অধিককাল তিনি লক্ষ্ণৌয়ে কাটিয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌর উন্নতির প্রতিটি কার্যের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের প্রসারের জন্যে তিনি বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন লক্ষ্ণৌ শহরে। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন উদারনীতিক দলের সমর্থক ও মহামতি গোখেল্-প্রতিষ্ঠিত 'সারভন্ট্ অফ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র সভ্য। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যসাধনের ও উর্দু ভাষা প্রচারের তিনি ছিলেন পরমসমর্থক। গান্ধীজির হরিজন আন্দোলনের তিনি ছিলেন অনুরাগী কর্মী। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের জন্যে তাঁর ছিল অক্লান্ত চেষ্টা। অতুলপ্রসাদ ছিলেন উত্তর ভারতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় জন-নায়ক।

অতুলপ্রসাদ গীতিকার ছিলেন যে, সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি রচনা করেছিলেন দুশো ছ'টি গান। খুব অল্প বয়েস থেকেই অতুলপ্রসাদ গান লিখতে শুরু করেন।

তেরো বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম গানটি রচনা করেন। গানটি হচ্ছে 'তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে উঠিল কুসুম ফুটিয়া।' এই গানটিতে রবীন্দ্রনাথের 'যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে' গানটির সুরের ও ঢঙের প্রভাব সুস্পষ্ট। তেমনি অতুলপ্রসাদের 'তব চরণতলে' গানটি রবীন্দ্রনাথের 'নিশিদিন মোর পরাণে' গানের সুরে, 'তোর কাছে আসবো মাগো' গানটি রবীন্দ্রনাথের 'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে' গানের সুরে, এবং ওনার জীবনের শেষের দিকের গানও যেমন 'তুমি গাও তুমি গাও' রবীন্দ্রনাথের 'মহারাজ একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে'র সুরে ও 'আমার এ আঁধারে' গানটি রবীন্দ্রনাথের 'ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি' গানটির সুরে একেবারে বসানো। এমনি অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। তাঁর গানে রবীন্দ্রনাথের সুরে আধাআধি নেওয়াও আছে যেমন 'চিত্ত দুয়ার খুলিবি কবে মা', রবীন্দ্রনাথের 'চোখের জলের লাগলো জোয়ার' এই গানের সুরের প্রভাব রয়েছে। 'এসো গো একা' অতুলপ্রসাদের এই গানটির সঞ্চারীর দুটি লাইন একেবারে রবীন্দ্রসংগীতের সুরের ঢঙে। এই রকম আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সুরের প্রভাব

প্রভৃতি গান। কীর্তনের ঢঙে রচনা করেন চোদ্দটি গান, যেমন, আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়', 'যদি দুখের লাগিয়া গড়েছ আমায়', 'ওগো সাথি মম সাথি,' 'পরাণে তোমায় ডাকি নি' প্রভৃতি গান আর বাউল-কীর্তন মিশিয়ে লেখেন তিনটি গান—'মেঘেরা দল বেঁধে', 'আর কতকাল থাক্‌বো বসে' গানগুলি। এই ভাবে কীর্তনের ঢঙে ও লোকসংগীতের ঢঙে অতুলপ্রসাদ পঁয়ত্রিশটি গান রচনা করেন।

প্রথম যুগের গানে রবীন্দ্র সংগীতের প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। 'আমারে এই আঁধারে' গানটিতে রবীন্দ্রনাথের 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি' গানটির সুর ও ঢঙ পরিস্ফুট। 'তোর কাছে আসবো মাগো'। গানটি রবীন্দ্রনাথের 'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুণগুনিয়ে' গানের সুর ও ঢঙ সহজেই কানে ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের জলে লাগলো জোয়ার' গানটির সুরে ও ঢঙে 'তোর কাছে আসবো মাগো' গানটি রচিত ও রবীন্দ্রনাথের 'নিশিদিন মোর পরাণে' গানটি অতুলপ্রসাদকে নিঃসন্দেহে প্রেরণা যুগিয়েছিল 'তব চরণ তলে' গানটি রচনা করতে। অতুলপ্রসাদের গান-রচনার এই প্রথম যুগের গানের সংখ্যা হবে প্রায় একশো।

অতুলপ্রসাদের গান-রচনার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৯২২ সাল থেকে। তখন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার রায়—এই দুজনের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। এই সময় থেকেই অতুলপ্রসাদ রসসিঞ্চিত ভাষায় ও শুদ্ধ ঠুংরি চালে গান রচনা করতে শুরু করেন। আগেও বাংলা ভাষায় ঠুংরি গান ছিল কিন্তু সেগুলি ভদ্র ও রসিক সমাজে গাওয়ার অযোগ্য ছিল—তাদের ভাষা যেমন ছিল অমার্জিত, গাইবার ঢঙও তেম্‌নি ছিল রসহীন ও স্থূল। অতুলপ্রসাদকেই তাই ঠুংরি চালের বাংলা গানের প্রকৃত স্রষ্টা বলা যেতে পারে। 'আমার বাগানে এতো ফুল', 'শ্রাবণ ঝুলাতে', 'বাদল ঝুম্ ঝুম্ বোলে', 'কে আবার বাজায় বাঁশী', 'চাঁদনী রাতে'—এই ধরনের ঠুংরি চালের প্রায় পঞ্চাশটি গান সৃষ্টি করেন অতুলপ্রসাদ।

তাঁর জীবনের শেষ পর্বে দেখি তিনি তাঁর প্রাণের সহজ ও নিরাভরণ সুরের উৎসের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। সুরগুলি অলঙ্কারবিহীন ও ঋজু, সুরের গভীরতা ও পেলবতা বৃদ্ধি পেয়েছে, গানের কথাও অনুভূতির রসে সিক্ত। এই পর্বের গানগুলি হ'ল—'কে তুমি ঘুম ভাঙ্গালে', 'তুমি গাও তুমি গাও', 'যারা তোরে বাসলো ভালো' প্রভৃতি গান। তাঁর রচিত শেষ গানটি হ'ল পিলু রাগে বাঁধা—'ক্রন্দসী পথচারিণী'। 'তুমি গাও তুমি গাও' এই বেহাগ রাগে বাঁধা গানটিতে রবীন্দ্রনাথের 'মহারাজ একী সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে' গানটির সুর ও ঢঙ পরিস্ফুট তা পূর্বেই বলেছি।

অতুলপ্রসাদের গীতকার-জীবনের প্রথম যুগের ও শেষ যুগের গানগুলির মধ্যে একটি গভীর ঐক্য আছে—সেটি হচ্ছে অতুলপ্রসাদের অন্তর-লোকে রবীন্দ্রনাথের অসীম প্রভাব। সৃজনীশক্তির উন্মেষের প্রথম কাল থেকেই অতুলপ্রসাদের সত্তা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির রসে নিমজ্জিত ছিল, রবীন্দ্র-মানসের অপূর্ব পরিমিতি-বোধের শুচিতার আলোকে সমুজ্জ্বল ছিল।

গান-সৃষ্টির দ্বিতীয় যুগে অতুলপ্রসাদ যখন ঠুংরি চালের গানে মেতে উঠেছেন তখনো কেউ যদি তাঁর গান তানের আতিশয্যে পীড়িত করতো, তিনি যে তখন অসোয়াস্তি বোধ করতেন ও এই আতিশয্য একেবারেই পছন্দ করতেন না—সেটি যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যলাভ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাদের মুখ থেকেই শুনেছি।

রবীন্দ্রনাথের মতো অতুলপ্রসাদও তাঁর গানে কাব্যাংশের ভাবের প্রতি দৃষ্টি রেখে সুর

বসিয়েছেন। সুর ও গানের কথার ভাবের মধ্যে তিনি কখনো বিচ্ছেদ ঘটান নি। গানের ভাবটিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে যদি তালের বাঁধন শিথিল হয় তাতেও তাঁর আপত্তি ছিল না।

তা ছাড়া এটাও মনে রাখা ভালো যে হিন্দী গানের সুরে বসানো তাঁর গানগুলিতে তিনি কখনো হিন্দী গানের সুরের পুরোপুরি নকল করেন নি। সে সব গানে তাঁর স্বকীয়তার পরিচয় যথেষ্ট আছে। এক কথায় রবীন্দ্রনাথের মতো অতুলপ্রসাদও সুরের জগতে আহরণকারী ছিলেন, অপহরণকারী কখনো ছিলেন না।

অতুলপ্রসাদের বেশির ভাগ গানের কাঠামোয় দেখা যায় যে স্থায়ীর পরে বাকি কটিই হচ্ছে অন্তরা। খুব অল্প গানে সঞ্চারী আছে। শেষ যুগের গানে কিন্তু সঞ্চারী দেখা দিয়েছে, যেমন , 'তুমি গাও তুমি গাও,' 'মন-পথে এলো বন-হরিণী' প্রভৃতি গানে।

তাঁর গানগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে খাম্বাজ ছিল তাঁর সব চেয়ে প্রিয় রাগ। শুদ্ধ খাম্বাজে ও মিশ্র খাম্বাজে তিনি বত্রিশটি গান রচনা করেন। তারপরে এলো সকালে ভৈরোঁ ভৈরবী—এই সুরে তিনি পঁচিশটি গান বাঁধেন। রাত্রির রাগিণী বেহাগও ছিল তাঁর প্রিয়, শুদ্ধ বেহাগে ও মিশ্র বেহাগে তিনি উনিশটি গান লেখেন। মিশ্র সুরে, যেমন মিশ্র কাফি, মিশ্র সিন্ধু, মিশ্র পিলু, মিশ্র দেশ, মিশ্র বেহাগ, মিশ্র কালাংড়া ও মিশ্র আশাবরী—এই কটি সুরে তিনি সাঁয়ত্রিশটি গান রচনা করেন।

তা ছাড়া কানাড়া, মল্লার, ভীমপলশ্রী, বাগেশ্রী, জয়জয়ন্তী, সাহানা, টোড়ি, ললিত, বসন্ত-বাহার, ইমনকল্যাণ, শ্রী, কর্ণাট শ্রী প্রভৃতি রাগে গান বেঁধেছিলেন তিনি।

তালের মধ্যে ঝাঁপতাল ছিল তাঁর প্রিয় তাল। লক্ষ্মৌর সাদ্‌রা হচ্ছে এক ধরনের গান যা ঝাঁপতালে গাওয়া হয়। এই সাদ্‌রা গান অতুলপ্রসাদের খুব প্রিয় ছিল। তাঁর নিজের রেকর্ড-করা গান—'জানি জানি তোমারে গো নন্দরাণী'—এই সাদ্‌রা ঢঙে রচিত।

'ভবানী দয়ারী....' এই ভাতখণ্ডের একটি খেয়ালের থেকে সুর নেওয়া অতুলপ্রসাদের খেয়ালটুকুও ভৈরবী সুরে সাদ্‌রার ঢঙে রচিত। 'ডাকে কোয়েলা বারে বারে' এটা গৌর মল্লাড়ে, এটাও হিন্দুস্থানী খেয়ালের থেকে নেওয়া।

লোকসংগীত ও কীর্তন অতুলপ্রসাদের কম মনোহরণ করে নি। বাঙলার নিজস্ব লোকসংগীতের সুরে ও কীর্তনে তিনি পঁয়ত্রিশটি গান বাঁধেন।

অতুল প্রসাদ-রচিত স্বদেশী সংগীতের মধ্যে 'উঠো গো ভারতলক্ষ্মী', 'বলো বলো বলো সবে', 'হও ধরমেতে ধীর' ও 'মোদের গরব মোদের আশা'—এই গানগুলি সর্বজনবিদিত।

এই প্রতিভাবান গীতিকার ১৯৩৪ সালের ছাব্বিশে আগস্ট তারিখে লক্ষ্মৌ সহরে অনন্তলোকে প্রয়াণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণ পাত্র এনেছিলে মর্ত্যে ধরণীতে।
ছিল তব অবিরত হৃদয়ের সদাব্রত
বঞ্চিত করো নি কভু কারে,
তোমার উদার মুক্ত দ্বারে।
মৈত্রী তব সমুজ্জ্বল ছিল গানে গানে,
অমরাবতীর সেই সুধা-ঝরা দানে।।

বৌদ্ধ সাধনা

যে সত্য উপলব্ধি করে বুদ্ধদেব নির্মাণ লাভ করলেন ও পয়তাল্লিশ বৎসর ধরে তিনি যে সত্য প্রচার করেছিলেন সেই আর্যসত্যের মূল কথা হচ্ছে এই যে দুঃখ হচ্ছে সব উৎপত্তি-গত জীবনের ধর্ম, এই দুঃখের মূল হচ্ছে তন্‌হা অর্থাৎ তৃষ্ণা—তন্‌হায় জায়াতী সোকো, তন্‌হায় জায়াতী ভয়ং, তন্‌হায় বিপ্পমুক্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং?—ধম্মপদ; দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব ও এই দুঃখ দূর করবার মাত্র একটি উপায় বা পথ আছে— সেটি হচ্ছে অষ্টাঙ্গ মার্গ অর্থাৎ অষ্ট-অঙ্গযুক্ত একটি পথ।

বৌদ্ধধর্মের মতে এই দুঃখ হচ্ছে মানুষের নিজের কর্মের ফলস্বরূপ। এই দুঃখ মানুষ অতিক্রম করতে পারে ও করবে শুধু নিজের প্রচেষ্টায়—আত্মোপলব্ধির দ্বারা। ভগবানের মধ্যস্থতায় দুঃখ দূর হবে না। ভগবানের মধ্যস্থতা বৌদ্ধধর্ম মানে না। ভগবৎকৃপার স্থান নেই বৌদ্ধসাধনায়। তাই মানুষ তার নিজের প্রচেষ্টাতেই নিজেকে ও সামাজিক আবেষ্টনীকে বদল করতে পারে ও অতিক্রম করতে পারে। মানুষ তার সামাজিক আবেষ্টনী তৈরী করেছে, নিজেকে তৈরী করেছে। এটা ক্রমাভিব্যক্তির পথ ধরেই ঘটবে। যাঁরা বুদ্ধ তাঁরা যুগে যুগে এই পথই দেখিয়ে গেছেন।

বৌদ্ধধর্ম মতে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে নয়, ইন্দ্রিয়গুলিকে উচ্চ আদর্শের দিকে, আর্য সত্যের দিকে পরিচালিত করেই মানুষ মুক্তি পাবে। ইন্দ্রিয়ভাবনা সূত্রে দেখি, বুদ্ধদেব গুরু পারাশার্থ-এর শিষ্যকে প্রশ্ন করে যখন জানলেন যে, তাঁর গুরু তাঁকে এমন করে ইন্দ্রিয়নিরোধ করতে বলেছেন যাতে ইন্দ্রিয়গুলি সব স্ব স্ব কার্য দর্শন, শ্রবন ইত্যাদি থেকে বিরত হয়, তখন বুদ্ধদেব এই শিক্ষাকে অর্থহীন শিক্ষা বল্লেন। তিনি বল্লেন এই শিক্ষা যদি মানুষকে মুক্তি দিত তাহলে অন্ধ, বধির প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দোষাক্রান্ত লোকেরাই তো শ্রেষ্ঠ সাধক। বুদ্ধদেবের মতে ইন্দ্রিয়গুলিকে তুচ্ছ পার্থিব বস্তুতে আবদ্ধ না রেখে প্রথমে ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান বা 'সংজ্ঞা' লাভের চেষ্টা করতে হবে। এই সংজ্ঞার সাহায্যে 'বিজ্ঞান' অর্থাৎ বিচারবুদ্ধিজাত জ্ঞান লাভ করতে হবে। তারপরে এই বিচারবুদ্ধিজাত জ্ঞানের সহায়তায়, 'প্রজ্ঞা' অর্থাৎ অনুভূতিজাত জ্ঞান লাভ করতে হবে। সবশেষে এই প্রজ্ঞার সাহায্যে 'বোধি' অর্থাৎ সাক্ষাৎ-উপলব্ধিজাত জ্ঞান লাভ হবে। এই হচ্ছে প্রকৃত দর্শন, সর্বোত্তম জ্ঞান। বৌদ্ধধর্ম আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা শাস্ত্র মতের জ্ঞানের চেয়ে এই বোধিকে অনেক উচ্চ স্থান দেয়। এই জ্ঞানের ফলেই মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পায় ও পরিপূর্ণ চৈতন্য লাভ করে।

বৌদ্ধধর্ম মতে সত্য উপলব্ধি সত্যের উপর বিশ্বাস বা ভক্তি থেকে অনেক বেশী

প্রয়োজনীয় মানুষের জন্যে। এই সত্য উপলব্ধি করতে গেলে আটটি বস্তুর প্রয়োজন— (১) উচিত জ্ঞান (২) উচিত উদ্দেশ্য (৩) উচিত বাক্য (৪) উচিত কর্ম (৫) উচিত জীবিকা অর্জনের উপায় (৬) উচিত চেষ্টা (৭) উচিত সজাগতা ও (৮) উচিত একাগ্রতা।

উচিত জ্ঞান

এই উচিত জ্ঞান কাকে বলে? সব ভৌতিক দ্রব্য, ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উপাদান এসব অনিত্য এই চেতনাই হচ্ছে উচিত জ্ঞান। ঘটনা, দ্রব্য ও ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি বস্তুত যা অর্থাৎ অনিত্য, এই চেতনা লাভ হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করবার জন্যে সাধককে হিংসালেশশূন্য জীবন যাপন করতে হবে ও ধ্যান (ভাবনা) করতে হবে; তবে অজ্ঞতার হাত থেকে ও অবিদ্যার শৃঙ্খল থেকে তার মুক্তি হবে। এই জ্ঞান-লাভের পথে সাধক যতো এগোবে ততোই তার মন থেকে লোকিয় ভাব অর্থাৎ এই লোক-সংক্রান্ত ভাবগুলি—ঝরা পাতার মতো খসে পড়বে। সাধকের চেতনা এক উচ্চতর চিৎভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

উচিত উদ্দেশ্য

যে জ্ঞান বা সত্য উপলব্ধি করা হয়েছে সেই জ্ঞান বা সত্যকে জীবনের সর্ব কার্যে প্রতিফলিত করাই হচ্ছে মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা উচিত উদ্দেশ্য। জ্ঞানলাভ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য নয়। যে জ্ঞান জীবনের প্রতিটি কাজে আপনাকে স্বপ্রকাশ না করে সে জ্ঞান নিষ্ফল থেকে যায়। যে মানুষ জ্ঞান লাভ করে তাতেই পরিতৃপ্ত থাকে, তার বাক্যে, আচরণে ও কর্মে সেই জ্ঞানের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না, সে মানুষ জীবনে জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে নি; তার জ্ঞান বন্ধ্যা।

দুই জাতের কিম্বা দুই স্তরের উদ্দেশ্য আছে, একটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য, আর একটি হচ্ছে চরম উদ্দেশ্য। এই সংসারের সীমার মধ্যে জ্ঞানের বা সত্যের প্রকাশ হচ্ছে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যের লক্ষ্য। চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে বোধি লাভ করে সব আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া বা নির্বাণলাভ করা।

উচিত বাক্য

সত্য ও করুণা-সিক্ত বাক্যই উচিত বাক্য। যে বাক্য জ্ঞানের উৎস থেকে নিঃসারিত হয়নি, শুধু অজ্ঞানতা ও সংস্কারের অন্ধ অভ্যেস থেকে জন্ম লাভ করেছে, সেই বাক্য নিরর্থক। যে বাক্য মানুষের প্রতি প্রেমের রসে সরস নয়, উজ্জ্বল নয়, সে বাক্য মৃত বাক্য। জ্ঞান ছাড়া করুণা সম্ভব নয়। জন্মমৃত্যুর চক্রে জীব বাঁধা রয়েছে এই জ্ঞান থেকেই করুণার উদ্ভব।

উচিত কর্ম

শান্তিময়, সৎ ও পরহিতকারী কর্মই উচিত কর্ম। যে কর্ম সংঘাত সৃষ্টি করে কিম্বা সংঘাতের সম্ভবনা ঘটায়, সে কর্ম অনুচিত কর্ম, অমঙ্গলের হেতু। সৎ কর্ম হচ্ছে সেই কর্ম যা জ্ঞান-প্রসূত, যা নিছক জড়-অভ্যাসজাত নয়। জ্ঞানে অনুসন্ধিৎসা আছে, বিচার

আছে। সৎ কর্ম বিচারমূলক লৌকিক জ্ঞানের ফলস্বরূপ। যে কর্ম মানুষের কল্যাণ করে না সে কর্ম একেবারে নিষ্ফল। পরহিতকারী কর্মের প্রেরণা দেয় জ্ঞান ও করুণা। জ্ঞান ও করুণা মানুষকে আত্মভিমানের খন্ডতা-দোষ দূর করেও মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যের অনুভূতি দেয়। সেই অনুভূতি মানবহিতকারী কর্মের প্রেরণা যোগায়।

জীবিকা অর্জনের উচিত উপায়

যে উপায়ে জীবিকা অর্জন করলে কারো ক্ষতি করা হয় না কিম্বা জীবিকা অর্জন কারো দুঃখের কারণ হয় না, জীবিকা-অর্জনের সেই উপায়ই হচ্ছে উচিত উপায়। বৌদ্ধধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম সোজাসুজি ভাবে জীবিকা অর্জনের ব্যাপারটিকে ধর্ম-সাধনায় অঙ্গীভূত করে নি। এটি বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব ও মাহাত্ম্য। জীবিকা অর্জন যেন কোনো উপায়ে করা যেতে পারে, তার সঙ্গে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কোনো যোগ নেই—এই হোলো শিক্ষিত (!) সমাজের ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণা! এই সর্বনেশে প্রবঞ্চনাকে আঘাত হেনেছে বৌদ্ধ মতবাদ। মানুষের জীবনের কোনো অংশকেই ধর্ম-সাধনা থেকে বাদ দেবার উপায় নেই। তার আহার-বিহার-চিন্তা-অনুভূতি সব এক সূত্রে বাঁধা। একটি জায়গায় কলুষ স্পর্শ করলে সব কলুষিত হবে। সকালে চোরাকারবার করে সন্ধ্যে বেলা ধার্মিক সাজা যেতে পারে, সাজছেও লোকে এই সমাজে, কিন্তু ধার্মিক হওয়ার কোনো উপায় নেই।

উচিত চেষ্টা

চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করবার, সংযত করবার চেষ্টাই হচ্ছে উচিত চেষ্টা। কামনার হাওয়ায় চিন্তা সতত আন্দোলিত, জ্ঞানের অনড়ভূমিতে চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। কামনার আলেয়ার পেছনে কর্মনিয়তি প্রধাবিত, মানব-কল্যাণের চেতনার আলোকে কর্ম উদ্ভাসিত হতে পারছে না। কামনার এই অসংযত ও ব্যর্থ ছোটাছুটি ও হয়রাণির হাত থেকে চিন্তা ও কর্মকে বাঁচানোর চেষ্টাই হচ্ছে উচিত চেষ্টা। যা অপরের পক্ষে ক্ষতিকর তা থেকে বিরত থাকবার প্রয়াস, যা সকলের হিতকারী তা সাধন করবার প্রচেষ্টা, কামনা ও অজ্ঞানতা অতিক্রম করবার নিরন্তন সংগ্রাম, নির্বাণের পথে অগ্রসর হবার জন্যে অবিরাম সাধনা—এই হচ্ছে উচিত চেষ্টা।

উচিত সজাগতা

ব্যক্তিগত জীবনের ও সমষ্টিগত সামাজিক জীবনের বিভিন্ন চিন্তাধারার ও কর্মের কারণ ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে সজাগতাই হচ্ছে উচিত সজাগতা।

জীবনের পথ দিয়ে মানুষ চলে যায়, চলে যায় যেন তন্দ্রার ঘোরে। তন্দ্রার ঘোরে চলতে চলতেই তার জীবনের অবসান ঘটে মৃত্যুর জাগরণহীন নিদ্রায়। অভ্যাস ও সামাজিক সংস্কার এরা দুটি হোলো ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি, আমাদের চেতনাকে এরা সব সময়েই জড়তার ও অজ্ঞানতার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করে। তার ফলে অন্তরের মধ্যে প্রজ্ঞার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় না, মানব-প্রেম জাগে না, কর্ম জ্ঞানের সংস্পর্শ লাভ না করে মানুষের কল্যাণ-সাধনের শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়। তাই সজাগতার এতো প্রয়োজন। শরীর ও মন সম্বন্ধে সজাগতা, অতীতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিচারশীল সজাগতা, বর্তমানের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতনতা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মানসিক সজাগতা। এই সজাগতা

থাকলেই মানুষ জ্ঞান লাভ এবং চিন্তায় ও কর্মে মহীয়ান হয়।

উচিত একাগ্রতা

সব চিন্তা বাদ দিয়ে বিশেষ একটি চিন্তার উপর মনকে কেন্দ্রস্থ করা ও প্রতিষ্ঠিত করাই হোলো উচিত একাগ্রতা। মন যেন হরিণ সে কেবলই ছুটে বেড়ায় অন্তর ও বাহিরের বনবনান্তরে। কোথাও তার স্থিতি নেই, তাই অস্থিরমন কোনো বস্তুর সত্তার স্পর্শ পায় না। কেবল জীবনের উপরে উপরেই মনের যাওয়া-আসা, তাই কোনো বস্তুর সত্তার আস্বাদন করা তার ভাগ্যে ঘটে না। অথচ মন সত্তার আস্বাদ পেতে পারে ও মনের প্রকৃত কার্যই হোলো বস্তুর সত্তার প্রকৃত আস্বাদন। মন যখন এই উচিত একাগ্রতার সাধনায় সিদ্ধ হয়ে সমাধি প্রাপ্ত হয় তখন প্রজ্ঞা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় ও মনের অর্ন্তদৃষ্টির বন্ধ দরজা খুলে যায়। এস একাগ্রতা (অথবা সমাধি) দুই রকমের—প্রাথমিক একাগ্রতা (উপচার সমাধি) ও পূর্ণ একাগ্রতা (আপনা সমাধি)। উচিত একাগ্রতা লাভের পরে আত্মপ্রত্যয়মূলক চিন্তা (Intuitive thinking) সুরু হয়। মহাযানীদের মধ্যে যাঁরা 'জেন' সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁরা 'সতরি' অর্থাৎ এক ঝলক সত্য-লাভে বিশ্বাস করেন। আত্মশুদ্ধি অবশ্যি অনেক কাল ধরে চলেছে তার আগে।

এই প্রাথমিক একাগ্রতা সাধনার জন্যে কতকগুলি বস্তুর সাহায্য নেবার নির্দেশ আছে। এই বস্তুগুলিকে 'কসিন' বলা হয়। কসিন দশ প্রকার-মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি, জল, লাল রঙ, নীল রং, শাদা রং, হলদে রং, আলো ও বিস্তৃতি।

ছুটন্ত মনকে সব কিছুর থেকে গুটিয়ে এনে একটি বিশেষ কিছুর মধ্যে সমাহিত করবার জন্যে এই কসিনগুলির সৃষ্টি। কসিনগুলি যে কোনে একটিকে নিয়ে মন যদি আপনাকে স্থিরতা ও সংযম শিক্ষা দেয় তাহোলে কাজ এগোলো। এটা কিন্তু নিছক প্রাথমিক একাগ্রতার জন্যে প্রয়োজন। তারপরে কসিনগুলির আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। মন আপনার সুপ্ত শক্তিকে উদ্ধার করে নিয়েছে জড়তার আবরণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে। চৈতন্য-উদ্ভাসিত মনের আর বাইরের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন থাকে না।

ধ্যানকে বৌদ্ধশাস্ত্রে 'ভাবনা' বলা হয়। বুদ্ধদেব বলেছেন যে "ধ্যান ছাড়া জ্ঞান নেই, জ্ঞান ছাড়াও ধ্যান নেই। যার ধ্যান আছে ও জ্ঞান আছে, সে-ই এই ভৌতিক জগতে বস্তুর (reality) কাছাকাছি পৌঁচেছে।"

'ভাবনা'-র (ধ্যানের) জন্যে মনকে কঠোর শিক্ষা দেওয়া দরকার। মন চারিদিকে দৌড়তে চায় আগুনের শিখার মতো, চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে চায় পারার মতো। তাকে স্থির করতে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। ধ্যান ছাড়া মন আত্ম-সমাহিত হয় না আর যে মন সমাহিত নয় জ্ঞান তার কাছে ধরা দেয় না। তাই ভারতীয় সাধনায় ভাবনা (ধ্যান) এতো গুরুত্ব লাভ করেছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মতে ভাবনা দু' রকমের—এক সমথ ভাবনা (দুই) বিপস্সনা ভাবনা।

সমথ ভাবনায় সিদ্ধিলাভ করলে সাধক মনের একমুখিনত্ব লাভ করেন। মন তখন নানা ধারায় বিভক্ত হয়ে নানা বিষয়ের দিকে প্রধাবিত হয় না। মন তখন একাভিমুখিন হয়ে স্থিরতা ও অচঞ্চলতা লাভ করে। তখন চারিদিকের ভৌতিক দ্রব্য তার মনকে স্পর্শ

করতে পারে না। ভৌতিক দ্রব্য সংস্পর্শ জাত উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেয়ে মন প্রশান্তি লাভ করে। সমাধি ভাবনায় মনকে একবার এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে মনকে স্থির করবার জন্যে বহির্জগতের কোনো দ্রব্যের অর্থাৎ কসিনের সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয় না। ভাবনা অর্থাৎ ধ্যান তখন সম্পূর্ণ অন্তর্মুখিনতা প্রাপ্ত হয়। এই ধ্যানের পথে মন শুচিতা লাভ করে ও ইন্দ্রিয়-পরবশতা সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে। তখন মন চারটি বিশেষ ecstatic অবস্থা প্রাপ্ত হয় বৌদ্ধশাস্ত্রে এই অবস্থাগুলিকে 'ঝানং' বলা হয়। সমাধি ভাবনার চারটি ঝানং-এর সর্বোত্তম ঝানং লাভ করলে শবীর ও মনের শান্তি ও অলৌকিক আনন্দ লাভ করা যায়। এই অবস্থায় পৌঁছলে সাধক পাঁচটি বুদ্ধিজাত উপলব্ধি লাভ করেন। এই বুদ্ধিজাত-উপলব্ধিকে অভিঞ্‌ঞা (অভিজ্ঞা) বলা হয়। অভিঞ্‌ঞা হচ্ছে বিভূতি। এই পাঁচটি অভিঞ্‌ঞা হচ্ছে —(এক) অপ্রাকৃতিক আশ্চর্য ক্ষমতালাভ (দুই) দিব্য দৃষ্টি (তিন) দিব্য শ্রবণ (চার) পূর্বজন্ম-স্মরণ (পাঁচ) অন্যের চিন্তা ও মানসিক ক্রিয়া বোঝবার ক্ষমতা।

এগুলি কিন্তু 'ভাবনা'-র (ধ্যানের) লক্ষ্য নয়। এই 'অভিজ্ঞা'-লাভ সাধনার নিম্নস্তরের বস্তু। যিনি এস সব বিভূতি লাভের মোহে আবদ্ধ হলেন তাঁর ধ্যান ব্যর্থ হয়ে গেলো। কেন না বিভূতি লাভের জন্যে ধ্যান নয়, ধ্যান হচ্ছে নির্বাণ প্রাপ্তির জন্যে। তাই যে সাধক এই 'অভিজ্ঞা'-প্রাপ্তির পরেও এগোতে চান তাঁকে 'কসিন'-এর সাহায্যে রূপ-ভাবনা থেকে অরূপ-ভাবনায় (অরূপ-ধ্যান) যেতে হবে। এই উপায়ে সাধক অরূপলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু যেমন 'অভিজ্ঞা'-প্রাপ্তি সাধকের চরম লক্ষ্য নয়, তেমনি অরূপলোক প্রাপ্তিও সাধকের চরম উদ্দেশ্য নয়। 'সমাধি ভাবনা'-র চতুর্থ 'ঝানং'-এ পৌঁছে সাধক বিপস্‌সনা ভাবনা'-র দিকে তাঁর মনকে চালিত করবেন।

'বিপস্‌সনা'-র অর্থ হচ্ছে বিদর্শণ, বিশেষ রূপে দর্শণ করা অর্থাৎ উপর থেকে শুধু ভাসা ভাসা ভাবে না দেখে তলিয়ে দেখা। সে সাধনায় এই বিশেষ রূপ দর্শণ করাবর শক্তিলাভ করা যায় সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে যে অসংখ্য বস্তু নামরূপ নিয়ে বিশ্বজুড়ে রয়েছে তাদের সেই খণ্ড অস্তিত্বের চেতনা একেবারে লোপ পায়। তখন এক নিত্য পরিবর্তনশীল অনন্ত অস্তিত্ব-প্রবাহের চেতনায় মন উদ্ভাসিত হয়।

বিপস্‌সনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে সাধক বস্তুর আত্মপ্রত্যয়জাত (intuitive) জ্ঞান লাভ করেন। বিপস্‌সনা ভাবনা সিদ্ধ সাধক কার্য-কারণের শৃঙ্খলে বাঁধা আমাদের এই হেতু-ভূত অস্তিত্বের তিনটি লক্ষণ উপলব্ধি করবেন—(১) অনিত্যতা (২) দুঃখময়তা ও (৩) সব ভৌতিক পদার্থের বস্তুহীনতা।

এই যে সমাধি ভাবনা ও বিপস্সনা ভাবনা, রূপ-ভাবনা ও অরূপ ভাবনা এই 'ভাবনা'-র (ধ্যানের) বিষয় হচ্ছে চল্লিশটি—দশটি 'কসিন', দশটি অশুভ, একটি আহারের দোষ (আহারে পতিকুলঞ্‌ঞ্যা), একটি ভূত-বিশ্লেষণ (চতুধাতুববখা), দশটি স্বরণ (অনুস্সতি), চারটি ব্রহ্ম বিহার ও চারটি অরূপ-ঝান।

দশটি 'কসিন'-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। দশটি অশুভ জিনিস, আহারের দোষ অর্থাৎ খাদ্যবস্তুর প্রতি লোভ এগুলি বর্জন করবার জন্যে মনকে এদের সম্বন্ধে জাগ্রত করতে হবে, হুঁশিয়ার করতে হবে। তার পরে ভূত-বিশ্লেষণ। প্রতিটি দ্রব্যের ধাতুগত বিশ্লেষণ করতে হবে তাতে তাদের অনিত্যতা বোধ সম্বন্ধে মন নিঃসংশয় হবে। তার পরে দশটি

'অনুস্সতি' (স্মরণ) ধ্যানের বিষয় হবে। সেই দশটি 'অনুস্সতি' হচ্ছে—বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, শীল, দান, দেব, শান্তি (উপসম)মৃত্যু, দেহের প্রতি মনযোগ (কায়গতা সতি), ও নিশ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি দৃষ্টি (অনাপান সতি)। এর পরে চারটি ব্রহ্মবিহার হবে ধ্যানের বিষয়। এই চারটি বিষয় হচ্ছে—(এক) মেত্তা (দুই) করুণা (তিন) মুদিতা (চার) উপেক্ষা। মেত্তা হচ্ছে প্রেম, তবে অন্ধ প্রেম নয়, নিরাসক্ত প্রেম। অন্ধ প্রেম থেকে কাম ও তৃষ্ণার উদ্ভব হয়। এই অন্ধ প্রেম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে,—এই অন্ধ প্রেমের ছায়া হচ্ছে বিদ্বেষ। করুণা সম্বন্ধে আগেই বলেছি যে এই করুণা জ্ঞান-জাতা। জীব জীবন-মৃত্যুর শৃঙ্খলে-বাঁধা, সংসার চক্রে পিষ্ট—এই জ্ঞান যথার্থ ভাবে লাভ হলে জীবের প্রতি যে জ্ঞান উদ্ভূত অনুভূতি তারই নাম করুণা। মুদিতা হচ্ছে অচঞ্চল স্থির আনন্দ। এ আনন্দ বোধি লাভের ফল। মন অসংশয় ভাবে 'বস্তু'-র (reailty) জ্ঞান লাভ করে সব ছোটাছুটি, ঘোরাঘুরি শেষ করেছে। বোধি-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত মন পূর্ণ চৈতন্যময় হয়ে আনন্দ ভোগ করছে। উপেক্ষা হচ্ছে মনের সেই প্রশান্ত সাম্য অবস্থা যখন সুখদুঃখ সব সমান বলে মনে হয়। যখন জীব-অস্তিত্বের পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয় তখন অস্তিত্বের ক্ষণিকত্ব উপলব্ধি করে সুখ দুঃখ সব সমান বলে প্রতীয়মান হয় মনের কাছে।

চারটি অরূপ-ঝান হচ্ছে—(এক) অসীম বিস্তারের ক্ষেত্র (আকাশনন্তায়তন) (দুই) চেতনার অনন্তবোধক্ষেত্র বিজ্ঞানানন্তা (তিন) নির্ববস্তুতার ক্ষেত্র (অকিঙ্কনা) ও (চার) অনুভূতি নয় অ-অনুভূতিও নয় সেই ক্ষেত্র (নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞা) প্রথম ঝান-এ ধ্যানের বিষয় বিশ্লেষণ করে চিন্তা করা হয়। বাসনা ও কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে বিচার ও বিশ্লেষণ ব্যবহার করে, নিরাসক্তির আনন্দ অনুভব করে সাধক প্রথম লোকত্তর আনন্দলোক প্রাপ্ত হন।

প্রথম ঝান-এ থাকে—(এক) বিশ্লেষণ (বিতক্ক), (দুই) চিন্তা (বিকার), (তিন) আনন্দ (পিতি) (চার) সুখ (সুখ), (পাঁচ) চিত্ত-একাগ্রতা (চিত্ত-একাগ্নতা সমাধি)।

দ্বিতীয় ঝান-এ থাকে আনন্দ, সুখ ও চিত্ত-একাগ্রতা। বিশ্লেষণ ও চিন্তার পৈঁঠা থেকে মন উঁচু পৈঁঠায় পৌঁছয়। এই ঝান-এর ফলে মনে সুগভীর চিন্তা ও আনন্দ উপলব্ধি স্থায়িত্বলাভ করে। তৃতীয় ঝান-এ থাকে সুখ ও চিন্তা-একাগ্রতা। আনন্দ বাদ হয়ে যায় এই ঝান-এ কেন না আনন্দ ও স্থূল। তাই আনন্দকে অতিক্রম করে স্থূল থেকে সুক্ষ্ম অবস্থায় মন চলে যায়। এই অবস্থায় মন অত্যন্ত একাগ্র ও চৈতন্যময় হয়। চতুর্থ ঝান-এ শুধু থাকে নির্বিকার ভাব। সুখে দুঃখে সমভাব। এই সমভাব প্রাপ্ত হলেই সাধক রূপ, বেদনা (sensation) বুদ্ধিগ্রাহ্যতা (সজ্ঞা) সু এবং কু কর্মের জনক মনের অবস্থাগুলি ও ক্রিয়াগুলি (সংখারা) ও চেতনা (বিজ্ঞান)—এই পাঁচটির প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করে। এই পাঁচটি হচ্ছে ব্যক্তির স্কন্ধ অর্থাৎ অস্তিত্বের গুণ। এই পাঁচটি নিয়েই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব।

এই ঝান সিদ্ধ হোলে লোকত্তর জ্ঞান (অভিঞঞঞা) ও লোকত্তর ক্ষমতা (ইদ্ধি) লাভ হয়। বৌদ্ধ সাধনার উদ্দেশ্য কিন্তু অভিঞঞঞা-ও নয় ইদ্ধি-ও নয়—উদ্দেশ্য নির্বাণ।

ভাবনা-র (ধ্যানের) এই চল্লিশটি বিষয়ের মধ্যে ব্যক্তি বিষয় নির্বাচন করে কি করে? বৌদ্ধশাস্ত্র মতে ব্যক্তির চরিত্রের উপর বিষয় নির্বাচন নির্ভর করে। ব্যক্তির চেতনার যে অবস্থা সেই অবস্থা অনুযায়ী ব্যক্তি ধ্যানের বিষয় বেছে নেয়। চেতনার এই রকম

অবস্থা আছে। অভিধম্ম পিটক গ্রন্থে এই বিভিন্ন চেতনার বিশদ আলোচনা আছে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে চেতনাকে শুধু চেতনা ও অবচেতনা এই দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। বৌদ্ধ বিজ্ঞানের মতে এই বিভাগের সংখ্যা কুড়ি।

যে সব চিন্তা মানুষের অন্তরের রোগস্বরূপ, সেই সব চিন্তার বিশ্লেষণ করে বৌদ্ধধর্ম দেখিয়েছে যে সেগুলি অজ্ঞানতার ফল। বৌদ্ধশাস্ত্র মতে মনের এই চিন্তাগুলির আট লক্ষ চুরাশি হাজার মিশ্রণ সম্ভব। এই চিন্তার উৎপত্তি কোথা থেকে এবং এই চিন্তা কতো রূপ নিতে পারে তাই দেখিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, অজ্ঞনতা-প্রসূত এই চিন্তাগুলিকে কি করে রোধ করা যায় তার উপায় বাত্‌লিয়েছে বৌদ্ধশাস্ত্র।

আমরা দেখেছি যে ধ্যানের বিষয় নির্বাচন ব্যক্তির চরিত্রের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ব্যক্তির এই চরিত্র কিসের উপর নির্ভর করে? বৌদ্ধ বিজ্ঞানের মতে ব্যক্তির চরিত্র নির্ভর করে—(এক) তার দেহের প্রকৃতির উপর (দুই) তার বংশগত চরিত্রের উপর (তিন) তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর—আবেষ্টনীর উপর (চার) তার নিজের কর্ম ও কর্ম ফলের উপর।

আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় ব্যক্তির চরিত্রের উপাদান ও হেতু বিশ্লেষণে বৌদ্ধশাস্ত্রের তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দেখে। আধুনিক মনবিজ্ঞান কিম্বা সমাজবিজ্ঞান এর চেয়েও বেশী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয় নি মানুষের চরিত্রের হেতু বিশ্লেষণে। প্রতিটি ব্যক্তির দেহের একটি বিশেষ প্রকৃতি আছে কেন না প্রতিটি দেহই একটি বিশেষ মিশ্রণের ফল। অতএব একজন ব্যক্তির দেহের এই বিশেষ প্রকৃতি তার চরিত্রের বিশেষ প্রকৃতির জন্যে আংশিক ভাবে দায়ী। ব্যক্তি তো শুধু কার্যকারণরহিত ভুঁইফোড় জীব নয়। অস্তিত্ব হচ্ছে ধারা, জীব-অস্তিত্বও ধারা। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান। জীব-অস্তিত্বে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্বন্ধ হচ্ছে বংশগত সম্বন্ধ। পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে ব্যক্তি যেমন দেহের উপাদান পায় যা তার দেহের চরিত্র নির্ণয় করে, তেমনি মানসিক উপাদানও পায় যা তার মনের বিশেষ গঠনের হেতু। আধুনিক কালে বায়লজি ও জেনেটিকস্‌ যা বলছে কৌলিক স্বভাব (heredity) সম্বন্ধে, দুহাজার বছর আগে বৌদ্ধ বিজ্ঞান সে কথা পরিষ্কারভাবে বলে গেছে। তারপরে এলো আবেষ্টনীর (environment) প্রভাব ব্যক্তির চরিত্র গঠনে। দেহের ও মনের বংশগত উপাদানগুলির উপর ব্যক্তির হাত নেই কিন্তু আবেষ্টনীর উপর মানুষের হাত আছে। আবেষ্টনী সামাজিক অবস্থার ফল। সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন করলে আবেষ্টনী বদল করা যায়। ব্যক্তির চরিত্রের উপর আবেষ্টনীর এই প্রভাব আজকাল সর্বজনস্বীকৃত। তবে কোনো কোনো লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনে আবেষ্টনীর যতোটা প্রাধান্য দেয় সে প্রাধান্য উদ্দেশ্যমূলক ও পক্ষপাতিত্বদোষদুষ্ট। বৌদ্ধমত বিজ্ঞানসম্মত মত, তাই তাতে সত্যের অনুসন্ধান ও সত্যনির্ণয় ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। চতুর্থ ও শেষ প্রভাব ব্যক্তির চরিত্রের উপর হোলে তার কৃত কর্মের। যে কর্ম আমরা করি সে যেমন আমাদের দেহের চরিত্র, বংশগত চরিত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলির দ্বারা নির্ণীত তেমনি যে কর্ম আমরা করি সেই কর্ম আমাদের দেহের চরিত্র, বংশগত চরিত্র ও আবেষ্টনী—তিনটিকে প্রভাবান্বিত করে, পরিবর্তিত করে। বৌদ্ধমত ব্যক্তির জীবনের উপর কর্মফলের প্রভাব স্বীকার করে কিন্তু নিছক কর্মফলের

হেতু ব্যক্তির চরিত্র একটি বিশেষ রূপ পায় এটি স্বীকার করে না। বহু কারণের সমন্বয়ে মানবচরিত্র গঠিত,—একটি দেহ-জাত কারণ, একটি বংশজাত কারণ, একটি সামাজিক কারণ ও একটি কর্ম-প্রসূত কারণ।

ব্যক্তির চরিত্রের উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে বৌদ্ধ শাস্ত্র ক্ষান্ত দেয় নি, চরিত্র হিসেবে ব্যক্তিকে ছয় শ্রেণীতে ভাগও করেছে—(এক) কামুক (দুই) ক্রোধপরায়ণ (তিন) অ-জ্ঞানী (চার) অবিশ্বাসী (পাঁচ) অল্পে-বিশ্বাসী (ছয়) জ্ঞানী।

যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তিনি সংযমী, বিগত-ক্রোধ ও সত্যনিষ্ঠ। জ্ঞানের ভিতরই সংযম, ক্রোধশূন্যতা ও নিষ্ঠা আছে বলেই পৃথক করে সংযমী, বিগতক্রোধ ও নিষ্ঠাবানের কথা বলার প্রয়োজন হয় নি।

এই ভাবে বিপস্সনা ভাবনা-র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সাধক জ্ঞানের সাইত্রিশ নীতির চর্চা করবেন। এই সাইত্রিশটি নীতিকে 'বোধিপক্খিয় ধম্ম' অর্থাৎ বোধি-অনুকূল ধর্ম বলা হয়। এই নীতিতে সিদ্ধি লাভ করলে সাধকের মন সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত হয়, সাধক নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

এই নির্বাণ লাভ করতে গেলে যে দশটি শৃঙ্খলে (সঞঞাজন-এ) প্রাণী শৃঙ্খলিত সেই শৃঙ্খলগুলি ছিন্ন করতে হবে। সেই দশটি হচ্ছে—(এক) আত্ম-মায়া (দুই) অবিশ্বাস (তিন) রীতি ও পদ্ধতিতে আসক্তি (চার) কাম (পাঁচ) দ্বেষ (ছয়) রূপ-জগৎ সম্বন্ধীয় বাসনা (সাত) অরূপজগৎসম্বন্ধীয় বাসনা (আট) অহংকার (নয়) উত্তেজনা ও (দশ) অবিদ্যা, অজ্ঞানতা।

যে সাধক আত্ম-মায়া, অবিশ্বাস ও রীতি পদ্ধতিতে আসক্তি মুক্ত হয়েছেন তিনি নির্বাণের দ্বিতীয় পৈঁঠায় পৌঁচেছেন। তাঁকে 'সোতাপন্ন' বলা হয়, সোতাপন্ন-র মানে যিনি নির্বাণের স্রোতে নেমেছেন।

যে সাধক তার অন্তরের কাম ও দ্বেষ নির্বীষ করেছেন দুর্বল করেছেন তাঁকে 'সকদাগামিন' বলা হয়। তিনি নির্বাণের দ্বিতীয় পৈঁঠায় পৌঁচেছেন। সেই সাধক মাত্র আর একবার এই পৃথিবীতে আসবেন।

যে সাধক আত্মমায়া, অবিশ্বাস, রীতি-পদ্ধতি, কাম ও দ্বেষ সম্পূর্ণ জয় করেছেন তিনি 'অনাগামিন', তিনি কাম লোক থেকে মুক্ত হয়েছেন। তিনি আর এই লোকে ফিরবেন না। শুদ্ধ-রূপ লোকে তাঁর বাস হবে। এটি নির্বাণের তৃতীয় পৈঁঠা।

যিনি এই দশটি শৃঙ্খল ছিন্ন করেছেন তিনি অরহৎ, তিনি বুদ্ধ, তিনি নির্বাণ লাভ করেছেন। এইটি হচ্ছে নির্বাণলাভের শেষ পৈঁঠা।

এই নির্বাণ পথ-যাত্রী সাধককে শাস্ত্রের উপর কিম্বা গুরুর উপরে নির্ভর করলে চলবে না। এ পথে সাধককে নিজের পথের আলো হতে হবে নিজেকেই। কেন না তথাগতেরা হচ্ছেন

"তুমেহ্হি কিচ্চমাতপ্পং অক্খাতারো তথাগতা
পটিপন্না পমোক্খন্তি ঝায়িনো মারবন্ধনা।" —ধম্মপ্পদ